

সির্রুল খিলাফাহ

(খিলাফতের তত্ত্বকথা)

হ্যরত মির্বা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিষ্ঠিত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)

ভাষান্তর
মাওলানা ফিরোজ আলম

বাংলা অনুবাদের ভূমিকা

‘সিরুল খিলাফত’ (খিলাফতের তত্ত্বকথা) পুস্তিকাটি ১৮৯৪ সালের জুলাই মাসে লেখা। এটি মূলতঃ আরবী পুস্তিকা, তবে শেবের দিকে একটি উর্দ্ধ অংশ রয়েছে। প্রাঞ্জলি উচ্চান্তের আরবী ভাষায় এই পুস্তিকাটি গদ্য ও পদ্য উভয় ধরণের সাহিত্য সম্মানে সমন্ব্য। আল্লাহ তাঁলা হ্যরত আকদাস মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-কে মুসলমানদের জন্য, ‘ন্যায় বিচারক’ ও ‘মীমাংসাকারী’ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাই তিনি সেই দায়িত্ব পালনের জন্য নিজে সুন্নী আলেমদের পক্ষ থেকে কুফরী ফতোয়ার শিকার হওয়া সম্মের শিয়া মতবাদের ভূল-অস্তি অত্যন্ত জোরালোভাবে এই পুস্তিকায় তুলে ধরেছেন। যে কোন ধৈর্যশীল পাঠক এই পুস্তিকা পাঠ করলে হ্যরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর গভীর রসূল-প্রেম ও খোলাফায়ে রাশেদীন-এর প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা অন্যায়ে উপলব্ধি করতে পারবেন। ১৮৯১ সনে শেখ মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেবের উদ্যোগে ৭২ ফির্কার আলেম-উলামা হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীদেরকে কাফের ও জাহানারী ফতোয়া দান করে। এরপর থেকে হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) বিস্তারিতভাবে কুরআন, সুন্নাহ ও সহীহ হাদীস থেকে তাঁর ধর্ম-বিশ্বাসের সপক্ষে অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ বিস্তারিতভাবে একাধারে করেক বছর পর্যন্ত উপস্থাপন করেন। কিন্তু তা সম্মের শেষ ঘূর্ণের আলেমরা হঠকারিতা বশতঃ নিজেদের ফতোয়ায় অন্ত থাকে। এই পুস্তিকার শেষাংশেও হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তাঁর ধর্ম-বিশ্বাসকে যুক্তির আলোকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন এবং আলেমদেরকে নিজের অন্যায় হঠকারিতা বর্জন করতে আহ্বান জানিয়েছেন। একই সাথে শেখ মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেবকে নিজের পাত্তিয় প্রমাণ করার জন্য পুনরায় আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, এর আগে প্রকাশিত দুর্ঘট আরবী পুস্তকের বিষয়ে হাজার হাজার টাকার পুরক্ষার ঘোষণা থাকা সম্মে তিনি এগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন পুস্তক রচনা করতে পারেন নি। এবার শেষ সুযোগ হিসেবে এই পুস্তিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুস্তক লেখার জন্য ২৭ টাকা পুরক্ষার ঘোষণা করা হচ্ছে।

বলা বাহ্য্য, মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব এবারও নীরবই থেকেছেন। কেবল সত্যকে অস্বীকার করাই এই শ্রেণীর লোকদের যাবতীয় কর্মকাড়ের মূল উদ্দেশ্য। পুস্তিকাতে বর্ণিত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে হলে আগাগোড়া পুস্তিকাটি পড়া বাঞ্ছনীয়।

মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব অনেক পরিশ্রম করে এই মূল্যবান আরবী পুস্তিকার বাংলা অনুবাদ সম্পাদন করেছেন। আল্লাহ তাঁলা তাঁকে এর সর্বোত্তম প্রতিদান দিমা আমীন॥

মোবাশশেরউর রহমান

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

তারিখ : ঢাকা, ২৭ মে, ২০০৮

অনুবাদকের কথা

যুগ ইমাম হ্যরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহ্মদী (আঃ) রচিত ‘সির্বল খিলাফাহ’ পুস্তিকাটি মূলত: মুসলমান আলেমদের জন্য লেখা। একদিকে তিনি শিয়া আলেমদেরকে সম্বোধন করেছেন অপরদিকে তিনি সুন্নী আলেমদের ভুল-ভাস্তি সংশোধন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাই স্বভাবতই এই পুস্তিকার ভাষা ও শব্দচরণ অতি উচ্চাঙ্গের। আমি আমার সাধ্যমত আরবী প্রবাদ ও বাগধারাগুলোর প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি কিন্তু এখনও উৎকর্ষ সাধনের অনেক সুযোগ রয়েছে। একই সাথে পদ্যাংশের কেবল শার্দিক অনুবাদ এবার প্রকাশ করা হচ্ছে। আগামী সংক্রমণে ইনশাল্লাহ্ পদ্যগুলোর কাব্যিক অনুবাদ প্রকাশ করার ইচ্ছা রাখি।

এ পুস্তকের অনুবাদের কাজে যাদের ভূমিকা অনুষ্ঠীকৰ্য তারা হলেন- সর্বজনোব ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক, আহমদ তারেক মুবাশ্বের, মনসুর আহমদ, সুলতান আহমদ, মোতাসেম বিল্লাহ, মোহাম্মদ সোলায়মান সুয়েন এবং আলহাজ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান। যাদের অবদান ছাড়া বর্তমান অনুবাদ হয়তো প্রকাশ করা সম্ভব হতো না তাঁরা হলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মরহুম সাঈদ আহমদ আনসারী সাহেব, জনাব আব্দুল মোমেন তাহের সাহেব (ইনচার্জ আরবী ডেক্ষ, লস্তন) এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব (মিশনারী ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ)। এ ছাড়া যারাই এ অনুবাদের সাথে কোন না কোন ভাবে জড়িত আল্লাহ তাঁলা তাঁদের সকলকে পুরস্কৃত করুন। আমীন॥

এই পুস্তিকা বাংলাভাষী মানুষদের জন্য হিদায়াত ও সঠিক পথ প্রাপ্তির কারণ হোক
এই দোয়াই করি।

ওয়াস্মালাম

খাকসার

মাওলানা ফিরোজ আলম

ইনচার্জ কেন্দ্রীয় বাংলা ডেক্ষ, লস্তন॥

পুথিরী তাকে প্রহণ করে নি। কিন্তু শোলা তাকে প্রহণ করবেন।
এবং অভিষ্ঠ জোরালো আক্রমণদির মাধ্যমে তার সততা প্রকাশ করবেন।

এটি এমন এক পৃষ্ঠক যা শিয়া ও সুন্নীদের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা করে এবং খিলাফত সম্পর্কে সত্ত্বের দিকে পথ প্রদর্শন করে। এটি বিরুদ্ধবাদীদের অজুহাতকে খণ্ডন করে আর মিথ্যারোপকারীদের মিথ্যাকে প্রকাশ করে। এর সাথে নির্বোধের মত আচরণ কেবল সে-ই করে যে সত্যনিষ্ঠাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নির্লজ্জতাকে অবলম্বন করে এবং মিথ্যাবাদীদের অনুসরণ করে।

এটি এক সম্মানিত পুস্তক যা শক্রপক্ষকে নির্বাক করে দেয়।
এ সুযোগ দান করার জন্য আমরা আমাদের মুষ্টার প্রশংসা গাই॥

যুক্তি-প্রমাণের প্রতীক হিসেবে আমি এর নাম রেখেছি

ସିର୍ବରୂଳ ଖିଲାଫାହୁ

কেননা এটি এ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট পথপ্রদর্শক।

সিরুক্কল খিলাফাহ পৃষ্ঠিকা তার জন্য যে জ্ঞানের সম্মানী

মুদ্রণে: রিয়াজুল হিন্দ ছাপাখানা, অমৃতসর; মহৱরম, ১৩১২ হিজরী

এ পুষ্টিকা শেখ
মোহাম্মদ
হোসেন
বাটালভী ও
অন্যান্য
কুফরীবাজ
আলেমদের
অপবাদ খনন
এবং তাদেরকে
নির্বাক করার
আর তাদের
পাসিত্যের
প্রকৃত ঘৰপ
উদ্ঘাটনের
জন্য ২৭ টাকা
পুরস্কারের
প্রতিশ্রুতিসহ
প্রকাশিত হয়।
এর
প্রতিদ্বন্দ্বিতায়
তাকে পুস্তক
লেখার জন্য
২৭ দিন সময়
দেয়া হয়। এই
পুস্তক প্রকাশিত
হবার দিন
থেকে উক্ত ২৭
দিন গণ্য হবে।

ছিদ্রাষ্টেষণকারীদের জন্য দিক-নির্দেশনা

এবং প্রকৃত ভুল চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী মানদণ্ড

অধিকাংশ ভুলপরায়ণ সমালোচক বিশেষ করে শেখ মুহাম্মদ হোসেন সাহেব বাটালভী আমাদের আরবী পুস্তকগুলোকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেন, বিদ্বেষের অঙ্গকারে নিমজ্জিত থাকার কারণে লিপিকারের (ফারসি কাতেব শব্দের অর্থ করা হয়েছে লিপিকার বাংলায় এর আরেকটি অর্থ হলে নথি লিখার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি) প্রমাদকেও ‘ভুল’ হিসাবে আখ্যায়িত করেন। আমাদের কোন শব্দ ব্যকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু তখনই ভাস্তি বলে গণ্য হবে যদি এর বিপরীতে সেই কথা আমাদের অন্যান্য পুস্তকের কোথায়ও শুন্ধভাবে লেখা না থাকে। কোন স্থানে ঘটনাক্রমে যদি ভুল হয়ে যায় অথচ সেই একই শব্দ বা বচন অন্য দশ, বিশ বা পঞ্চাশ জায়গায় যদি নির্ভুলভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে তাহলে ন্যায়পরায়ণতা ও দ্বিমানের দাবী হলো ‘ভুল’ না বলে এটিকে লিপিকারের (অর্থাৎ কাতেবের) প্রমাদ বলে গণ্য করা। অপরদিকে যে দ্রুতগতিতে এগুলো লেখা হয়েছে যদি তা দৃষ্টিতে রাখা হয় তাহলে তারা যে অনেক বড় অন্যায় করেছে আর এ লেখাগুলো যে অলৌকিক -একথা তাদের মানতেই হবে। কুরআন শরীরী ছাড়া মানুষের কোন লেখা প্রমাদ ও ভাস্তিমুক্ত হতে পারে না। বাটালভী সাহেব নিজেও মানেন, মানুষ ইমরাউল কায়স এবং হারীরীর মত লেখকেরও ভুল ধরেছে। প্রশ্ন হলো, ঘটনাক্রমে কোন ব্যক্তি একটি ভুল ধরতে পারলেও সে কি হারীরী বা ইমরাউল কায়সের সমকক্ষ হতে পারে? মোটেও না। সূক্ষ্ম, তাদ্বিক কথা বলা বড়ই কঠিন কিন্তু ছিদ্রাষ্টেষণ একজন সামান্য যোগ্যতার মানুষ বা একজন অর্থবাদ করতে পারে। আমাদের পক্ষ থেকে ‘হামামাতুল বুশরা’ ও ‘নূরুল হক’-এর মোকাবেলায় বই লেখার জন্য ১৮৯৪ সনের জুন মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছিল কিন্তু তা-ও গত হয়ে গেছে। কোন মৌলভী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বই লেখার উদ্দেশ্যে পুরক্ষারের টাকা প্রদান করার আবেদন পত্র পঠায় নি। এখন সে সময়ও হাতছাড়া হয়ে গেছে। অবশ্য তারা অযোগ্য ও দৰ্যাপরায়ণ লোকদের স্থায়ী রীতি অনুসারে ছিদ্রাষ্টেষণের অনেক হীন চেষ্টা করেছে। কয়েকজন আত্মপ্রাপ্তদে অভ্যন্ত ব্যক্তি লিপিকারের কিছু প্রমাদ বা অনিচ্ছাকৃত ভাস্তি দেখিয়ে পুরক্ষারের প্রত্যাশী হয়েছে। তারা চোখ খুলে এটি দেখল না যে প্রতিটি ভুল ধরার পুরক্ষারের জন্য শর্ত ছিল, এমন ব্যক্তিকে প্রথমে পাল্টা একটি পুস্তক লিখতে হবে নতুবা দৰ্যাপরায়ণ ও অঙ্গ সমালোচক প্রথিবীতে হাজার হাজার বরং লাখ লাখ পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে কয়েকজনকে আর কাকে কাকে পুরক্ষার দেয়া যেতে পারে? প্রথমে তাদের এই ‘সিরুল খিলাফাহ’ পুস্তিকার মোকাবেলায় পুস্তক লেখা উচিত আর যদি তাদের পুস্তিকা ভাস্তিমুক্ত প্রমাণিত হয় আর বাণিজ্যিক মাপকাঠিতে আমাদের পুস্তিকার সমমানের প্রমাণিত হয় তাহলে আমাদের কাছ থেকে তিনি পুরক্ষারের টাকা ছাড়া প্রতিটি ভুলের জন্যও দুই টাকা করে নিতে পারেন যার আমরা কথা দিয়েছি। নতুবা অহেতুক সমালোচনা শালীগতা-বিবর্জিত একটি কাজ হবে। ওয়াস্সালামো আলা মানিত্ তাবাআল হ্দা।

খাকসার

গোলাম আহমদ

সির্ব্রত্ন খিলাফাহ

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হে ঈমান, বুদ্ধি-বিবেচনা ও চিন্তা-চেতনার উৎস! আমরা তোমার দ্বারে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার পৃত উপটোকন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। তোমার সন্নিধানে আমরা তোমার মহিমা, পবিত্রতা ও গুণ কীর্তনের গীতাঞ্জলি নিয়ে এসেছি। আমরা অধীর আগ্রহে তোমার সন্তুষ্টির অশ্বেষী এবং সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় তোমার দিকেই ধাবমান। আমরা তোমার পানেই ছুটছি আর এক্ষেত্রে আমাদের কোন ক্লান্তি নেই। আমরা তোমার প্রতি ঈমান রাখি আর এ বিষয়ে আমাদের মনে কোন সংশয়ও নেই। সমস্ত উপায়-উপকরণ বাদ দিয়ে আমরা তোমার সমীপে বেদনাতুর হন্দয়ে তাদের বিষয়ে আকৃতি জানাতে এসেছি যারা মরীচিকা নিয়ে সন্তুষ্ট অথচ বরনার সুপেয় পানি ও সঠিক পথ অবলম্বনের ক্ষেত্রে উদাসীন। এরা এমন অহংকারী যারা থু থু চেটে খায় কিন্তু ঐশ্বী মা'রেফাতপূর্ণ পানপাত্র ও সুরাহীকে প্রত্যাখ্যান করে। একই সাথে সত্যবাদীদের প্রতি এরা শক্রতা পোষণ করে আর সন্দেহের মোহে নিশ্চিত সত্যকে পরিত্যাগ করে। এদের যাবতীয় সন্দেহ হয় বর্ণনীয় মেঘের মত অথবা পানিশূন্য বাদলসদৃশ। এরা আধ্যাত্মিক বৃৎপত্তিসম্পন্ন লোকদের সান্নিধ্যে চরম উদাসীনতাসহ উপস্থিত হয় আর সত্যকে ঝীড়াকৌতুকের দৃষ্টিতে দেখে। সন্দেহ-প্রবণতা অঙ্ককারাচ্ছন্ন রাতের এক আকস্মিক বিপদের মত এদের ওপর ছেয়ে গেছে, যার ফলে এদের বিবেক-বুদ্ধি ঘোড়ার ব্যথাতুর খুরের ন্যায় কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলেছে আর এরা মুখ থুবড়ে পড়েছে। অঙ্গ বিদ্বেষ এদেরকে সত্য অস্বীকারে বাধ্য করেছে আর সদুপদেশদাতাদেরকে এরা আক্ষেপ ও পরিতাপের দৃষ্টিতে দেখছে। পলায়নরত ব্যক্তির ন্যায় এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছে, ঘৃণা ও বিদ্বেষে ডুবে গেছে এবং সর্বপ্রকার অঙ্গীকার ভঙ্গ ও সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছে আর শুভাকাঙ্ক্ষীদের গালমন্দ করা আরম্ভ করেছে। এদের মাথায় স্তুলবুদ্ধি বৈ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, যার সাথে পরশ্চীকাতরতার মাত্রাও যোগ হয়েছে। তাই এরা শক্রতা ও বিদ্বেষবশত নির্যাতন ও নিষ্পেষণের যাঁতাকল ঘূরাতে আরম্ভ করেছে। এদের দুর্ভাগ্য এদেরকে লাঞ্ছনার দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছে, ফলে এরা সত্য ও ঈমানের স্বাদ থেকে বাধিত এবং এরা হতভয় ও দিশেহারা অবস্থায় সত্য ও নিষ্ঠার আবাসভূমি ত্যাগ করেছে। এদের স্বভাব-বিকৃতির কারণে নৈরাজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে আর মানুষ এদের কারণে প্রত্যারিত হয়েছে। অতএব হে আমার প্রতিপালক-প্রভু! তুমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের প্রতি দয়া কর, এদের অবস্থা সংশোধন কর এবং এদেরকে পবিত্র কর আর এদের ব্যাকুলতা দূর কর। তোমার নবী, তোমার বস্তু মুহাম্মদ, খাতামান নবীঈন, সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল (সাঃ)-এর প্রতি, তাঁর পবিত্র এবং পবিত্রকারী বংশধরদের প্রতি, উম্মত ও ধর্মের ভিত্তি-সদৃশ তাঁর সাহাবিদের প্রতি এবং তোমার সব নেক বান্দাদের প্রতি তুমি শান্তি ও কল্যাণ বর্ষণ কর, আমীন।

হে আমার বিচক্ষণ ভাই! জেনে রেখো, পচা লাশে যেমন অসংখ্য পোকার জন্ম হয় তেমনিভাবে এ যুগে বিশ্বজগতের উন্নত হচ্ছে আর শুকনো কাঠে আগুন যেভাবে দাউ দাউ করে জলে ওঠে, কুপ্রবৃত্তির আগুন আজ সেভাবে জলছে। আমি পবিত্র ইসলাম ধর্মকে এ যুগের ঘূর্ণিঝড় ও কালের ভয়াবহ বায়ুপ্রবাহে হৃষিকের সমুদ্ধীন দেখতে পাচ্ছি। যুগ পাস্টে গেছে এবং বিশ্বজগতে চরম রূপ ধারণ করেছে। সত্যানুসারীদের প্রতি আক্রেশ মিথ্যারোপকারীদেরকে অঙ্গ করে দিয়েছে। পুণ্যবানদের প্রতি ক্ষেত্রের কারণে পাপাচারীরা রেগে অগ্নিশৰ্মা হয়ে গেছে। নিছক শক্রতাবশত এরা সত্যকে এবং সত্যানুসারীদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে। পক্ষান্তরে, সত্যানুসারীরা বিশ্বসংগ্রামকদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার ও মানুষকে তাদের নোংরামীর কবল থেকে মুক্ত করার বৈশিষ্ট্য রাখেন। অত্যাচারীর কথা ও কাজকে তাঁরা নীরবে সহ্য করেন না বরং তাঁরা এর তাৎক্ষণিক উন্নত দেন আর সন্দেহপোষণকারী ব্যক্তির রোগ নির্ধারণ করতে এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীর বিভ্রান্তির জাল ছিল করতে তারা এগিয়ে আসেন। তদনুযায়ী, সত্যানুরাগ যাদেরকে শক্রের আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছে এবং সত্যের সমর্থন যাদেরকে কুফরী ফতোয়া প্রদানকারীদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে- এক পর্যায়ে আমিও তাঁদের শ্রেণীভুক্ত হয়ে গেছি।

বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ হলো, মহান আল্লাহু আমাকে যখন প্রত্যাদিষ্ট করলেন এবং শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ও উম্মতের প্রতিশ্রূত মসীহ হবার সুসংবাদ দিলেন, আমি বিষয়টি মুসলমানদেরকে অবহিত করলাম। এতে এরা অভের ন্যায় স্কুল হলো, কুধারণার বশবর্তী হয়ে তড়িঘড়ি করে আমাকে মিথ্যাবাদী ও প্রতারক আখ্যা দিল। আমি যখনই পবিত্র বাণীর কোন আধ্যাত্মিক ফলাফল এদের সামনে উপস্থাপন করেছি এরা একান্ত অনীহার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। এরা আমাকে একান্ত কঠোর বাক্যবাণে জর্জরিত করেছে এবং তীর্থক সমালোচনার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছে। আমি আন্তরিকভাবে এদের কল্যাণ কামনা করেছি এবং তবলীগের ক্ষেত্রে কোন ঝটি করি নি। কখনও প্রকাশ্যে আর কখনও একান্ত গোপনেও এদেরকে বুঝিয়েছি, কিন্তু আমার আন্তরিক হিতোপদেশের বর্ণনানুর মেঘমালা এদের ক্ষেত্রে কেবল বৃষ্টিহীন বাদলই প্রতীয়মান হয়েছে। হয় আমার সর্বোত্তম হিতোপদেশ নীচলোকদের দুর্ভাগ্যের মাঝে আরও বাড়িয়ে দেয়ায় এরা শক্রতা ও অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেছে নতুন আল্লাহু এদের হস্তয়ে মোহর মেরে দেয়ায় এরা হীন আচরণ ও ব্যাধির ক্ষেত্রে আরও ঘৃণ্য পর্যায়ে উপরীত হয়েছে। এরা নিজ হঠকারিতায় অন্ড। এরা আমাকে অভিসম্পাত করেছে, মিথ্যাবাদী ও কাফের আখ্যা দিয়েছে এবং নিজেরাই মনগড়া অনেক মিথ্যা রাতিয়েছে। আল্লাহু যা চেয়েছেন তা-ই করেছেন। আমি নিশ্চিত, যারা আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয় তারাই মিথ্যক। সেই মহান সন্তা যিনি আমাকে সংযোগ করেছেন এবং আমায় পথ দেখিয়েছেন আর নিজ জ্ঞেহ-ছায়ায় আমার নিরাপত্তা বিধান করেছেন, যিনি স্বীয় গভীর অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাকে লালন-পালন করেছেন এবং আমাকে সুরক্ষিত লোকদের

গভিভূক্ত করেছেন, একমাত্র তিনি ছাড়া সবাই আমাকে বিতাড়িত ও গালমন্দ করেছে। এমতাবস্থায় আমি যখন সুন্নাদের নিষ্কিঞ্চ বিরোধিতার তীর থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলাম আর তাদের নানাবিধি ভৌর্যক সমালোচনা ও গালমন্দের সম্মুখীন হচ্ছিলাম ঠিক তখনই কয়েকজন নেতৃস্থানীয় শিয়া এবং এ ফিরকার কয়েকজন আলেমের পত্র আমার হস্তগত হয় যারা আমাকে খিলাফত প্রসঙ্গে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম-এর আলামত বা লক্ষণ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তাঁরা সত্য ও হিদায়াতের সন্ধানী। বরং তাঁদের কয়েকজন আমার সম্বন্ধে বন্ধুসূলভ সুধারণা রাখেন। তাঁরা আমাকে তাঁদের শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মনে করেন এবং গভীর ভক্তি ও আন্তরিকতার সাথে আমায় স্মরণ করেন। তাঁরা আমাকে একান্ত আগ্রহভরে আন্তরিকতাপূর্ণ কয়েকটি চিঠি লিখেন। তাঁরা বলেছেন, আপনি এমন একটি স্পষ্ট পুত্রক রচনা করুন যা আমাদের সন্দেহ নিরসণ করবে, পিপাসা নিরাগণ করবে আর আমাদের কাছে জোরালো যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করবে। এরপর আমার কাছে তাঁরা একাধারে এমনসব চিঠি পাঠাতে থাকেন যেগুলোতে আমি তাঁদের আন্তরিক উক্ষতার ছোঁয়া পেয়েছি। তখন আমার প্রথমবার চিঠি পাবার কথা মনে পড়লো। সে সময় আমি এক দ্বিধা-বন্দের মধ্যে ছিলাম, এগুবো না পিছুবো ঠিক করতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত আমার স্বাচ্ছন্দ্যদাতা প্রতিপালক-প্রভু আমায় শক্তি প্রদান করলেন এবং আমার হৃদয়ে তিনি যা চাইলেন গেঁথে দিলেন। আমি তখন সত্যের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়ার লক্ষ্যে উদ্যত হলাম। একমাত্র মহান আল্লাহু ছাড়া আমি কাউকে ভয় করি না। খোদার প্রতি নির্ভরশীলদের জন্য তিনিই যথেষ্ট।

স্মরণ রেখো, সুন্নীরা সূচনাতেই আমার আধ্যাত্মিক পদবর্যাদার বিষয়ে শক্ততামূলক আচরণ করেছে আর শিয়ারাও আমার উন্নতির যুগে আমাকে আক্রমণাত্মক কথার মাধ্যমে ক্ষতবিক্ষিত করেছে। আমি প্রথমোক্ত শ্রেণীর পক্ষ থেকে অনেক গর্হিত কথা শুনেছি আর শেষোক্ত শ্রেণীর পক্ষ থেকে আরও গর্হিত কথা আমাকে শুনতে হবে। কিন্তু আমার প্রভুর সাহায্য না আসা পর্যন্ত আমি দৈর্ঘ্য ধারণ করবো। আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমার সাথে থাকেন। আমার প্রতি তাঁর মেহপূর্ণ দৃষ্টি রয়েছে, তিনি আমার প্রতি দয়া করেন এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

আমি বেশীর ভাগ শিয়া শ্রেণীভূক্ত লোকদের দেখেছি, তারা আক্রমণাত্মক কথা বলতে ভয় করে না, পরকালের শাস্তি ও পুরুষারদাতা খোদার তাকওয়া তারা অবলম্বন করে না, সত্য ও তত্ত্বজ্ঞানের সম্পদ আহরণ করে না, আধ্যাত্মিক রহস্যের স্বাদ গ্রহণ করে না, পুণ্যবানদের মত ভাবতে চেষ্টা করে না এবং হেদায়াতের পথও অবলম্বন করে না। অতএব তাদেরকে বুঝানো আমি নিজের জন্য একটি আবশ্যিকীয় দায়িত্ব ও অবশ্যই পরিশোধযোগ্য ঝণ ভান করলাম। আল্লাহু তাদের সংশোধন করবেন এবং অবস্থা বদলে দিবেন আর আমি তাদের বিতর্কিত বিষয়গুলো ও স্পষ্ট করবো আর খিলাফতের রহস্য সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবো -এ আশা নিয়ে আমি খুব দ্রুত এ পুত্রক রচনা করেছি। অবশ্য আমার এ লেখা বৃক্ষ বয়সে প্রাণ সংসানতুল্য। উদাসীন নর-নারীদের

প্রতি একান্ত করুণা করে আমি এটি লিখেছি। ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত (অর্থাৎ কর্মের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভর করে)। আমি আশা করি, এ প্রবন্ধ ঈমানী চেতনাসম্পর্ক অনেক ব্যক্তিকে রক্ষা করবে। যেহেতু সত্য কথা তিক্ততামুক্ত হয় না তাই সুন্নীদের পক্ষ থেকে যেভাবে আমি অভিসম্পাত কৃড়িয়েছি শিয়া আলেমদের পক্ষ থেকেও আমাকে একইভাবে অনেক অভিসম্পাত কুড়াতে হবে। অতএব হে আমার প্রভু! তুমি ছাড়া অন্য কারো প্রতি আমার ভরসা নেই, তুমি ছাড়া অন্য করো কাছে অভিযোগ করি না, তোমার সত্তা ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই আর তোমার নির্দর্শন ছাড়া আমার কোন পুঁজি নেই। সুতরাং তুমি যদি আমাকে মানুষের সংশোধনের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করে থাক তাহলে তোমার সাহায্যসহ এগিয়ে এসো আর আমাকে সেভাবে সাহায্য কর যেভাবে তুমি সত্যবাদীদের সহায্য করে থাকো। তুমি যদি এ অধমকে ভালবেসে থাকো আর মনোনীত করে থাকো তাহলে আমাকে অভিশপ্ত ও পরিত্যক্তদের ন্যায় লাঞ্ছিত করো না।

তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ কর তাহলে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে কে আমাকে রক্ষা করতে পারে? তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকর্তা। অতএব তুমি আমার কষ্ট দূরীভূত কর, আর শত্রুকে হাসি-ঠাট্টার সুযোগ দিও না এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।

এ পুস্তিকায় একটি মুখবন্ধ এবং দু'টি অধ্যায় আছে যাতে চক্ষুশ্বান ও খোদাড়ীর জাতির জন্য পথের দিশা বিদ্যমান। আমি খোদার কাছে মিনতি করি যেন তিনি একে কল্যাণমত্তিত করেন আর দয়ার নির্দর্শনস্বরূপ প্রভাব বিস্তারের বৈশিষ্ট্যে এটিকে সুরভিত করেন। তিনি যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আগামদের আর কোন জ্ঞান নেই আর তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

মুখবন্ধ

হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! খোদা আপনাদের প্রতি করুণা করুন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, আমি এমন এক ব্যক্তি যাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান দান করা হয়েছে। আমার প্রভু প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয়কে বুঝা আমার জন্য সহজ করেছেন আর জীবন-যাত্রার সব সমস্যা থেকে আমাকে মুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর বিশেষ মেহের জন্য আমাকে বেছে নিয়েছেন আর আমাকে আমার অমিতের গৃহ থেকে মুক্ত করে সংগোপনে আমাকে তাঁর সুমহান ও বিশাল গৃহ অভিযুক্ত নিয়ে গেছেন। জল-স্থল পাড়ি দিয়ে যখন আমি প্রকৃত ক্ষিবলায় পৌছলাম এবং তাঁর মনোনীত গৃহ প্রদক্ষিণ করার সৌভাগ্য লাভ করলাম আর আমার বন্ধু ও মূর্তিমান ভালবাসা, প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহর মেহের সুদৃষ্টি, অন্তরাত্মার প্রখরতা ও আধ্যাত্মিক রহস্যকে বুঝার ক্ষেত্রে যখন আমাকে বিশেষত্ব প্রদান করলো তখন আমি আমার পূর্ণ অস্তিত্বে তাঁর হাতে সঁপে দিলাম। আমি তাঁর পক্ষ থেকে সব সূক্ষ্ম বিষয় ও আধ্যাত্মিক রহস্যের জ্ঞান অর্জন করেছি। বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে বৃংপত্তি দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মাঝে বিদ্যমান সব বিবাদের প্রতি আমি আমার মনোযোগ নিবন্ধ করেছি। আমি সব বিতর্কের উৎস ও কারণ সন্ধান করেছি। অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের কোন ক্ষেত্রে বাদ রাখিনি বরং সুনিশ্চিতভাবে আমি এর মূল খুঁজে বের করেছি। আমি বুঝতে পেরেছি, বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মানুষ যে ভুল-অস্তি করেছে, একটি দিককে উপেক্ষা করে অন্য আরেকটি দিককে অবলম্বন করাই হলো এর মূল কারণ। প্রকৃত জ্ঞান ছাড়াই তারা একটি আঙ্গিককে বড় করে দেখে আর এর বিপরীত মতামতকে তুচ্ছ ও খাটো মনে করে। কাঙ্ক্ষিত কোন কিছুর ভালবাসায় মন্দ হলে প্রবৃত্তি এর বিরোধী সব বিষয়কে ভুলে বসে -এই হলো মানব স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। তখন সে সহানুভূতিশীলদের সদুপদেশকেও মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায় না বরং বেশীর ভাগ সময় তাদের বিরোধিতা করে আর তাদেরকে শক্ত মনে করে। তখন সে তার হৃদয়ের অস্বচ্ছতার কারণে তাদের সান্নিধ্যে যায় না আর তাদের কথাও মন দিয়ে শোনে না। এ আত্মিক বিপত্তির নানা কারণ ও হেতু রয়েছে আর বিভিন্ন পথ ও পথ্তা দিয়ে এ ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটে। এর সবচেয়ে বড় কারণগুলো হলো, হৃদয়ের কাঠিন্য, পাপাসক্তি, পরকালে জীবাবদিহিতার প্রতি ঔদাসীন্য এবং প্রতারক ও মিথ্যাবাদী শক্রদের সাথে স্থ্যতা। মানব জীবনে অঙ্গতা বন্ধনমূল হয়ে গেলে হোঁচট খাওয়া তার স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয় আর প্রবৃত্তির দাসত্বাত্ত্ব তার অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পরিণত হয়। অতএব আমরা এমন স্থায়ী পদস্থলন থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। প্রায়শ এসব বদ-অভ্যাসই মানুষকে বিবাদ-বিতর্কের সময় গভীর হঠকারিতার পথে ঠেলে দেয়। সত্যাবেষী ও হেদায়েত সন্ধানী একজন মানুষের জন্য কুপ্রবৃত্তির খাতিরে ঝগড়া বিবাদে সিণ্ঠ হওয়া প্রকৃতপক্ষে জীবননাশী এক বিষ। এ ফাঁদে পতিত

মানুষ খুব কমই রক্ষা পায়। কখনও কখনও এসব অসৎ কারণ এবং বিভ্রান্তিকর হেতুগুলো প্রচলন ও দৃষ্টির আড়ালে থাকে। এসব ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ তা দেখতে পায় না আর মনে করে, সে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত কাজ করছে। সে তড়িঘড়ি করে যখন বিতভায় লিঙ্গ হয় আর বিবাদ-বিস্ময়ে ক্রমশ উগ্র হয়ে উঠে, এমন ক্ষেত্রে প্রায়শই একটি তুচ্ছ ধারণা এবং দুর্বল অভিমতকে জোরালো ও অকাট্য প্রমাণ বলে মনে করে, যার ফলে তার চালচলনে অহংকারীর হাবভাব দেখা যায়। এসব কিছুর কারণ হলো, গভীর মনোযোগের অভাব, অন্তর্দৃষ্টিহীনতা, সত্য-জ্ঞানের স্বল্পতা, সামাজিক কদাচারের দাসত্ব, রিপুর পুরোপুরি বশ্যতা স্থীকার, আধ্যাত্মিক রুচিশূন্যতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে নৈরাশ্য এবং জড় জগতের প্রতি পূর্ণ আসক্তি এবং এর অন্তর্বর্তী অনুসরণ-অনুকরণ।

এ কারণগুলোই মানুষকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে বরং তারা বহুধা বিভক্ত হয়ে যায়। এদের অধিকাংশই ধ্বংসের পথ বেছে নেয় আর সত্যকে নির্লজ্জভাবে প্রত্যাখ্যান করে বরং সত্যানুসারীদেরকে অভিসম্পাত দিতে গিয়ে সীমালজ্জনকারীদের রীতি অনুসরণ করে। এরা সত্কর্মশীলদের বিরুদ্ধে দক্ষ তীরন্দাজের মত তড়িঘড়ি হামলা করে আর সত্যানুসারীদেরকে তাছিল্যভরে ও ব্যাধিগ্রস্ত হন্দয়ের বক্র দৃষ্টিতে দেখে। বাস্তবে এদের তেমন কোন যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও এরা নিজেদেরকে জ্ঞানী ও সাহিত্যিক বলে মনে করে এবং অহঙ্কার দেখায়। তবে এদের মাঝে এমন লোকও আছেন যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন এবং তাদেরকে 'সত্য এবং প্রজ্ঞা' প্রদান করা হয়েছে আর আল্লাহ' তাদের চোখ খুলেছেন ও তাদের সন্দেহ দূর করেছেন যার ফলে তারা সত্যকে খুব ভালভাবে অনুধাবন করেন। তাদের মাঝে এমনও এক শ্রেণী আছে যারা পদে পদে ভুল করেছে, সত্য মিথ্যার মাঝে কোন পার্থক্য করে নি বরং তারা সত্যকে উপলক্ষ্য করার চেষ্টাও করেনি। তারা নিজ হন্দয়ে লালিত সব উন্নত ধারণা, নিজেদের ভাস্ত পদচারণা ও পাপের আচ্ছাদনকেই সবকিছু মনে করে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এরা এক দুর্বৃত্তিপরায়ণ জাতি।

আধ্যাত্মিক রূপ-ক্ষেত্রে পরাস্ত হবার পর এরা যখন যুদ্ধ-প্রশিক্ষণ ছেড়ে দিল এবং যুদ্ধ জয়ের বিষয়ে হতাশ হয়ে গেল তখন সহসাই এরা তুচ্ছ-তাছিল্য প্রদর্শন, হয়ে প্রতিপন্থ করা, অপবাদ আরোপ, মিথ্যা রটনা ও অপমান করার পছন্দ বেছে নিল। আমি বিনয়ের সাথে যখনই কথা বলেছি এরা অত্যাচার ও কষ্ট দেয়ার পথ অবলম্বন করেছে। আমার নিরাপত্তাদাতা ও সাহায্যকারী প্রভু যদি আমাকে রক্ষা না করতেন তাহলে এরা আমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। এরা যখন বক্রতা অবলম্বন করলো আল্লাহ'ও এদের হন্দয়কে বক্র করে দিলেন এবং উন্নরেন্তর এদের পাপ বৃক্ষি পেতে থাকলো আর তিনি এদেরকে অঙ্ককারে দিশেহারা অবস্থায় ছেড়ে দিলেন। পরম সম্মানিত আল্লাহ'র আদেশ ও দয়ালু খোদার নির্দেশে আমি যখন কুসংস্কারকে দূরীভূত করতে এবং রোগ নিরাময়ের জন্য প্রস্তুত হলাম তখন এরা ক্রেতের সাথে নিজেদের অঙ্গতার নিদ্রা থেকে জেগে উঠে দোষারোপ ও গালমন্দ করতে করতে আমার পিছু ধাওয়া করলো। তারা কৃফরী

ফতোয়ার বহু দুয়ার ও মিথ্যাচারের নতুন নতুন ধারা আবিষ্কার করলো এবং নানাবিধি সাজানো মিথ্যাচারের মাধ্যমে আমার ওপর আক্রমণ চালালো । কখনও এরা সাপ হয়ে আমাকে ছোবল মেরেছে আবার কখনও পাথর হয়ে আমাকে রঙ্গাঙ্গ করেছে । আমি যখনই সদুপদেশ দিয়েছি এরা শুনতে অশ্বীকার করেছে । আমি তাদেরকে বার বার ডেকেছি কিন্তু তারা মনোযোগ দেয় নি । প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকেও তারা পলায়ন করেছে । এরা বার বার ভুল করেছে ও হঠকারিতা দেখিয়েছে কিন্তু নিজেদের ভুল স্থীকার করে নি আর এরা খোদাকে ভয় করার পাত্রও নয় । এরা বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষেত্রে ধৃষ্টতা দেখায়, এ কাজকে পরিহারও করে না আর একে অন্যায়ও মনে করে না । এর ফলে সত্য চাপা পড়ার উপক্রম হলো, ধর্মীয় বিষয়াদি ঘোলাটে হয়ে গেল, তত্ত্বজ্ঞানের সূর্য ডুবে গেল আর হারিয়ে গেল ।

উন্মত্তের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে আর পশ্চিমা বিশ্ব তা লুকে নিয়েছে । সর্বগ্রাসী বিপদ ঘনীভূত হতে হতে এক পর্যায়ে ছেয়ে গেছে । ধার্মিকতা ও বিশ্বস্তার গুণ হারিয়ে গেছে । শাস্তি, নিরাপত্তা ও ঈমান উঠে গেছে । আমি অঙ্কারাচ্ছন্নকারী বিপদকে চারিদিকে ছেয়ে যেতে দেখেছি । সর্বোক্তৃপ্ত পথ অঙ্ককারে হারিয়ে গেছে । তাই আমি ধর্মের সমর্থনে কয়েকটি পুস্তক রচনা করেছি । ধর্মের সূক্ষ্ম রহস্যবাণী এবং প্রমাণাদি ধারা আমি সেগুলোকে কানায় কানায় ভরে দিয়েছি । কিন্তু তারা সেসব নসীহত থেকে আদৌ লাভবান হতে পারে নি বরং এগুলোকে ক্রোধের কারণ জ্ঞান করেছে । আসলে তারা বিরত হবার পাত্র ছিল না । তারা যখন দেখলো যে যুক্তি সমাগত আর প্রজলিত অগ্নি নির্বাপিত এবং সন্দেহের কোন অঙ্গের অবশিষ্ট নেই, তখন তারা বিভিন্ন প্রকার তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পছ্টা অবলম্বন করলো । তারা বললো, ইসলামের দিকে আহ্বানকারী মুজাদ্দেদের লক্ষণ হলো, তিনি পরিপক্ষ জ্ঞানের অধিকারী আলেম এবং সম্মানিত ফাযেল হবেন । কিন্তু এ ব্যক্তি যে আরবী ভাষার একটি অক্ষরও জানে না, সাহিত্যের জ্ঞানও তার নেই! আমরা তাকে অঙ্গ মনে করি । অন্ততপক্ষে তাদের একথাটি সত্য ছিল । অতএব, আমি আমার প্রভূর কাছে দোয়া করলাম, তিনি যদি পছন্দ করেন তাহলে আমাকে যেন আরবীর জ্ঞান দান করেন । তিনি আমার দোয়া গ্রহণ করলেন । তাঁর অনুগ্রহে আমি ভাষায় বৃৎপত্তি এবং বক্তৃতায় বাস্তিতা ও দক্ষতা অর্জন করলাম ।

এরপর খোদার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে আমি আরবী ভাষায় দুটো বই রচনা করেছি । আমি ঘোষণা করলাম, হে শক্ররা! তোমরা যদি আলেম এবং সাহিত্যিক হয়ে থাকো, হে দাবীসর্বো ভন্ডেরদল! তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে এর সমতুল্য কোন বই লিখে দেখাও । কিন্তু তারা পালিয়ে গেল আর সে ব্যক্তির ন্যায় আত্মগোপন করলো যে কপর্দিকহীন অবস্থায় ঝণ গ্রহণ করে । যে ব্যক্তি সব অর্থ ব্যয় করার পর সম্বিং ফিরে পায়, কিন্তু ঝণে জর্জরিত হবার পর সে তা আর পরিশোধ করতে পারে না । ঝণদাতা তার পিছু নেয়, একান্ত কঠোরভাবে টাকা ফেরত চায় কিন্তু মিথ্যা প্রতিশ্রূতি প্রদান করা ছাড়া তার কাছে দেয়ার আর কিছুই থাকে না । আগ্নাহ তাঁলা এভাবেই অহঙ্কারী জাতিকে লাঞ্ছিত করে থাকেন ।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারা এ শাঙ্খনা দেখে এবং নিজেদের নগ্নতা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও অনুশোচনা ও বিনয় অবলম্বন করলো না, পুণ্যবান ও নেক লোকদের পথ অবলম্বন করলো না, এদের ঝঁঝ হাত সুস্থ হলো না আর সত্য-বিরোধীদের মোর্চাও ভাঙলো না! এরা অনুত্তম হয়ে সত্ত্বের দিকে অগ্রসর হবার আন্তরিকতা প্রদর্শন করলো না বরং অবজ্ঞাভরে আমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল আর তড়িঘড়ি করে অন্যায়ের আশ্রয় নিল। আমি এদেরকে কার্পট্যের শিকলে আবদ্ধ দেখেছি। আমি এদেরকে যে সদুপদেশই দিয়েছি এর ফলাফল সম্পর্কে আমায় সর্বদা নিরাশই হতে হয়েছে। তখন বানর ও শূকরের উপমাটি আমার মান পড়ে গেল। চক্ষুস্মান লোকদেরকে অঙ্গের মত দেখে আমার নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হয়েছে তবুও আমি হতাশ হই নি। কিন্তু নিয়তি ঝদের নগ্নতা প্রকাশ করার ও লাম্পট্যের শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্র এরা সত্যবাদীদের বিরোধিতা করেছে এবং আল্লাহর সাহায্যপ্রাণ লোকদেরকে কষ্ট দিয়েছে। খোদার প্রতি আন্তরিকতাকে এরা অর্থহীন ভেবেছে এবং সত্যকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে আর এরা উপেক্ষাকারীদের সাথে ঘোগ দিয়েছে। আমি বেশ কয়েক বছর যাবত এদেরকে বাক-বিতভায় লিঙ্গ দেখেছি আর এদের মাঝে অনুশোচনার কোন লক্ষণ দেখি নি। তাই আমি এদেরকে পরিত্যাগ করার এবং উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। লিপিকারের নথি গুটিয়ে নেয়ার মত আমি এদের সাথে আলোচনা গুটিয়ে নিয়ে নেক লোকদের প্রতি মনযোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এদেরকে সত্য ও সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করার মত কোন উপায় যদি আমার হাতে থাকতো তাহলে আমি তা অবলম্বন করতাম কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি কোন পথ দেখি না। আমি যথনই এদেরকে ডেকেছি এরা তড়িঘড়ি করে দূরে সরে গেছে আর যখনই আমি এদেরকে পথের সন্ধান দিয়েছি এরা অট্টহাসি হেসে পিছনে সরে গেছে। তবে আজকাল অবশ্য কিছু সম্মানিত আলেমকে আমার প্রতি মনোযোগী হতে দেখা যাচ্ছে। এদের মনের শক্তির জট খুলে যাচ্ছে আর অঙ্গকার কিছুটা অপসারিত হচ্ছে। তাঁরা শক্তির ছড়ানো বাজে কথার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছেন। ভয়াবহ তমসাচ্ছন্ন রাতের স্ফুর তাঁদেরকে হতভম্ব করে দিয়েছিল কিন্তু তাঁরা নেক স্বভাবের মানুষের মত আমার কাছে এসেছেন।

এ সুমতির কারণে আমি তাঁদের সাধুবাদ জানিয়েছি। তাঁদের প্রতিপালক-প্রভু মরীচিকার অলীক চাকচিক্য থেকে বের করে সত্ত্বের ঝরনার পামে তাঁদের পরিচালিত করেছেন আর তাঁরা আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে আমার কাছে এসেছেন। তাঁরা দৃঢ় বিশ্বাসের পানীয় পান করেছেন এবং একান্ত স্বচ্ছ-সুপেয় পানির মাধ্যমে তাঁদের ত্বর্ণা মেটানো হয়েছে। আমি আশা করি, আল্লাহ তাঁদের পরিপূর্ণ হেদায়েত দান করবেন এবং তাঁদেরকে তত্ত্বজ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। একইভাবে, যারা এ বই পড়ে দেখবেন আমি দোয়া করি, আল্লাহ যেন তাদেরকে সঠিক পথ অবলম্বনের সৌভাগ্য দান করেন। আধ্যাত্মিক জন্মের নিরিখে যে ব্যক্তি পরিপক্ষতা লাভ করেছে আল্লাহর অনুগ্রহে সে আমার কথা গ্রহণ করবে। যে ব্যক্তি আমার হিতোপদেশ মনযোগ সহকারে শুনতে প্রস্তুত

তার জন্য আমি আমার কথা সুবিন্যস্ত করেছি। আমার এ কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য কী এবং কে সঠিক অর্থে সত্যাপ্নেয়ী আল্লাহই তা ভাল জানেন। মানুষ তার প্রকৃতিকে এড়াতে পারে না আর কোন স্বভাব তার নিজস্ব রীতিনীতিকে উপেক্ষা করতে পারে না। খোদাকর্তৃক হৈদায়াতপ্রাণ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি সঠিক পথ পেতে পারে না।

শোন! খোদা তোমাদের প্রতি করঞ্চা করুন। যারা নিজেদেরকে আহলে বায়তের অনুসারী বলে দাবী করে এবং শিয়া বলে পরিচয় দেয়, তাদের কিছু লোক প্রথম সারির সাহাবা, রসূলপ্রাহ (সাঃ)-এর কয়েকজন খলীফা এবং উম্মতের কয়েকজন ইমাম সম্পর্কে অবমাননাকর কথা বলে। মতামত প্রকাশ ও বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে এরা বাড়াবাঢ়ি করে ফেলে। এরা তাঁদেরকে কাফের ও যিন্দিক (অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্বৰ্দ্ধী সশন্ত মুরতাদ-অনুবাদক) আখ্যা দেয়, তাঁদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যায় আত্মসাধ, যুলুম ও ভষ্টার অপবাদ আরোপ করে। এরা আজ পর্যন্ত এ থেকে বিরত হয় নি আর এদের অপপ্রচারও বন্ধ হয় নি। আসলে এরা বিরত হবার পাত্রও নয়। বরং তাঁদের গালি দিয়ে এরা আনন্দ পায়। এরা উন্নেজিত হলেই এ ঘণ্য রীতি অনুসরণ করে আর একে একটি মহান পুণ্যকর্ম বলে মনে করে, বরং আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ বলে মনে করে। এরা তাঁদের অভিসম্পাত দিয়ে মনে করে বড় ভাল কাজ করেছে এবং এর প্রতিদানে বড় বড় পূরুষার প্রাণির আশা করে। নিজেদের অপর্কর্মকে এরা সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম, খোদার নৈকট্য লাভের মাধ্যম, খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের সবচেয়ে সহজ উপায় এবং ধার্মিকদের মৃত্তির সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে। আমি কিছুকাল এদের মাঝে কাটিয়েছি। আমার প্রভু আমার জন্য প্রতিটি পরীক্ষাকে সহজ করেছেন। এ বিষয়ে তারা যা গোপন করতো আমি অতি ভয়ে-ভয়ে কিন্তু স্বত্ত্বে তা দেখতাম আর তাদের প্রতারণার সব মাধ্যমকে বিশ্লেষণ করতাম। তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে আল্লাহ তাঁ'লা আমার ভাগ্যে তাদেরই একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসেবে রেখেছিলেন। আমি তাঁদের মধ্যে দিবারাত্রি সময় কাটিয়েছি এবং তাঁদের সাথে বার বার বিতর্ক করেছি। তাঁদের গোপন ও প্রকাশ্য বিশয়গুলি আমার অজ্ঞান থাকার কথা নয়। আমার অভিজ্ঞতা হলো, তারা এমন একটি দল যারা প্রথম সারির সাহাবিদের প্রতি শক্রতা পোষণ করে এবং সন্দেহের পর্দায় আবৃত্ত থাকতে পছন্দ করে। তাঁদের যাবতীয় প্রচেষ্টা কথায় কথায় শায়খাইন (অর্থাৎ হ্যারত আবুবকর ও উমর)-কে দোষারোপ করা এবং তাঁদের পবিত্র চেহারায় কালিমা লেপনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। তারা মানুষের সামনে কখনো কেরতাসের কাহিনী আর কখনো ফেন্দকের বিতভার দিকে ইঙ্গিত করে এবং এর সাথে তাঁদের মিথ্যার বেসাতি তো আছেই।

এভাবে তারা ধৃষ্টিতার সাথে মিথ্যা রটনা করে আর বাড়িয়ে বাড়িয়ে কখনও এক কথা আর কখনও আরেক কথা বলে। আমি তাঁদের মুখে সাহাবায়ে কেরাম, কুরআন শরীফ, খোদাপ্রেমিক আওলিয়া, মা'রেফাতসমৃদ্ধ বুর্যুর্গ এবং নবীজী (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনসঙ্গী উম্মুল মু'মেনীনদের সম্পর্কে অসম্মানজনক সমালোচনা শুনেছি। আমি

যখন তাদের প্রকৃত স্বরূপ ও অপ্রকাশিত রহস্য সম্পর্কে অবগত হলাম আমি তাদের এড়িয়ে চললাম আর নির্জনতা আমার কাছে পছন্দনীয় হয়ে উঠলো । আমার মনের গভীরে তখন কত যে অব্যক্ত কথা বিরাজ করছিল! আমি অভাবমোচনকারী খোদার দরবারে এ বিভাগের বিষয়ে জ্ঞান বৃক্ষের জন্য মিনতি করতে থাকি । এক পর্যায়ে আমি সম্মানিত প্রজ্ঞাবান প্রভুর কাছ থেকে সঠিক পথের দিশা পেয়েছি এবং সর্বজ্ঞানী প্রভুর দয়ায় সত্ত্বের পানে পরিচালিত হয়েছি । আমি বিশ্ব-জগতের প্রভুর কাছ থেকে সবকিছু নিয়েছি, মানুষের সৃষ্টি কোন বিদ্যার আমি গ্রহণ করি নি । আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির পক্ষ থেকে জ্ঞান লাভ না করে মানুষ জ্ঞানের সঠিক অবস্থান এবং সুস্থ-সঠিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ লাভ করতে পারে না । মহান প্রভুর বিশেষ কৃপা ছাড়া ভূল-আন্তি থেকে কেউ রক্ষা পায় না । কোন ব্যক্তি সারা জীবন ব্যয় করেও কোন বিষয়ের সঠিক তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতে পারে না যতক্ষণ রহমান খোদার পক্ষ থেকে তত্ত্বজ্ঞানের মৃদুবল্দ হিমেল বাতাস প্রবাহিত না হয় । তিনি সর্বমহান শিক্ষক ও সর্বজ্ঞানী প্রজ্ঞাময় সন্তা । যাকে চান তাঁর রহমতে প্রবিষ্ট করেন এবং যাকে চান তাকে তত্ত্বজ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত করেন । এভাবে আল্লাহু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাকে বিশেষ বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন । আর আমাকে এমন জ্যোতি প্রদান করেছেন যা শয়তানকে উক্ফার মত ধাওয়া করে । তমসাচ্ছন্ন রাত থেকে বের করে আমাকে তিনি এমন আলোকিত এক দিনে প্রবিষ্ট করেছেন যাতে মেঘের কোন নাম গদ্দও নাই । তিনি পথের সব প্রতিবন্ধকতাকে দূরীভূত করেছেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে আমি সুরক্ষা লাভ করেছি । আমাকে অলৌকিক জ্ঞান দান করা হয়েছে আর এমন আলো দেয়া হয়েছে যা মানব প্রকৃতিকে জ্যোতিময় করে এবং আমাকে এমন নিগৃত তত্ত্ব শিখানো হয়েছে যা সত্য অনুসন্ধানীদেরকেও হতবাক করে । আমার প্রভু আমার জ্ঞানকে সূক্ষ্ম গবেষণার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন এবং বিশুদ্ধ পানীয়ের মত সেটিকে পরিষ্কার করেছেন । আমার অঙ্গদৃষ্টি যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে মানসিক প্রশান্তি ও ঈমানের দৃঢ়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহু আমাকে তাঁর কিতাবে সেসব সিদ্ধান্তের সত্যায়ন দেখিয়েছেন । আমার দৃষ্টি তাঁর আয়াতের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক অর্থ এবং এর অঙ্গনিহিত তত্ত্বকে আয়ত করেছে আর একই সাথে আমাকে মুহাদ্দাসদের অঙ্গদৃষ্টি দেয়া হয়েছে । অধুনাকালের বিশ্বাখ্লা নিরসনকলে এবং সুস্থ প্রকৃতির লোকদের সঠিক পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে আমার প্রভু আমাকে পবিত্র ও পুণ্যবান লোকদের উপকারার্থে অনেক যুগোপযোগী জ্ঞান দান করেছেন । তিনি ছাড়া আর কে পথপ্রদর্শন করতে পারে? তিনিই সবচেয়ে বড় দয়ালু । যুগ সাক্ষী দিচ্ছে, মানুষ ঈমানকে নষ্ট করে ফেলেছে এবং মিথ্যা ও অপবাদ আরোপের পথ বেছে নিয়েছে । যার কাছে কোন আমানত রাখা হয় সে-ই বিশ্বাসঘাতকতা করে আর কথা বলতে গিয়ে সে মিথ্যা কথা বলে । অতএব তিনি আমার হনয়ে অনেক মহান আধ্যাত্মিক রহস্য এবং অনেক চিরস্তন সত্য ফুর্তকার করেছেন এবং আমাকে নবীদের উত্তরসূরী মনোনীত করেছেন । তিনি বলেছেন, “যাদের পূর্বপুরুষদের সতর্ক করা হয় নি তাদেরকে সতর্ক করার জন্য তুমি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছো যেন অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়” ।

খিলাফত সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়

আল্লাহু তালা তোমাকে গভীর চিন্তাশক্তি দান করুন। শোন! আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমাকে খিলাফত সম্পর্কে সুনিশ্চিত জ্ঞান দান করা হয়েছে। যারা তন্মতব করে অনুসন্ধান করে তাদের ন্যায় আমি তত্ত্বকথার গভীরে উপনীত হয়েছি। আমার প্রভু আমার কাছে প্রকাশ করেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ও হযরত উসমান (রায়িয়াল্লাহু আনহুম) শাস্তিপ্রিয় এবং বিশাসী-মুমিনদের অঙ্গৰ্ভুক্ত ছিলেন। এঁরা এমন লোকদের অঙ্গৰ্ভুক্ত ছিলেন যাঁদেরকে আল্লাহু প্রাধান্য দিয়েছেন এবং রহমান খোদার বিশেষ অনুগ্রহের জন্য তাঁদেরকে বেছে নেয়া হয়েছে। তাঁদের প্রশংসনীয় গুণবলী সম্পর্কে অনেক তত্ত্বজ্ঞানী সাক্ষাৎ দিয়েছেন। মহামহিমাপ্রিয় খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে তাঁরা স্বদেশ ত্যাগ করেছেন আর প্রতিটি রণক্ষেত্রের তয়াবহতম স্থানে যুদ্ধ করেছেন। গ্রীষ্মকালীন দুপুরের খর দাবদাহ বা শীতের রাতের তীব্র শীতের প্রতি তাঁরা ভ্রক্ষেপ করেন নি বরং সদ্য ঘোবনে উপনীত যুবকের প্রেমসংক্রিয় ন্যায় ধর্মপ্রেমে তাঁরা আবদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা আপন-পর কারো প্রতি আকৃষ্ট হন নি বরং বিশ্বপ্রিপালক খোদার ভালোবাসায় সবাইকে পরিত্যাগ করেছেন। তাঁদের কাজে এক প্রকার সুবাস এবং তাঁদের কর্মে বিড়িও ধরনের সৌরভ ছিল যা তাঁদের সুমহান মর্যাদা এবং তাঁদের বাগান-সদৃশ পুণ্যের প্রতি ইঙিত বহন করে যার প্রভাত সমীরণ নিজ সৌরভের মাধ্যমে তাঁদের অজানা অবস্থানের বিষয়ে দিক-নির্দেশ করে আর তাঁদের জ্যোতি নিজ আলো-বিকিরণ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। সুতরাং তাঁদের পুণ্য যে আলো বিকিরণ করেছে শুধু এর ঔজ্জ্বল্যের নিরিখে তাঁদের সুমহান দৈর্ঘ্যের বিষয়ে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হও। তড়িঘড়ি করে সন্দেহের অনুসরণ করো না। কেন গুজবে কান দিও না, বিশেষ করে যখন তা বিষয়ুক্ত এবং অতিরিক্ত হয় তখন তা কেনভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এর অধিকাংশ ঘূর্ণিবায়ুভূল্য বা পানিশূল্য মেঘের ন্যায়। অতএব তুমি আল্লাহুর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং এমন কথার অনুসরণ করো না আর তার মত হয়ো না যে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পরকালকে ভুলে যায় ও অগ্রহ্য করে। তাকওয়া ও সহনশীলতার পথকে পরিত্যাগ করো না এবং যে বিষয়ে জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না এবং সীমালংঘনকারীদের অঙ্গৰ্ভুক্ত হয়ো না। জেনে রেখো, কিয়ামত সন্ধিকট আর সর্বাধিপতি তোমার কর্মকাল দেখছেন। তোমার কর্মের হিসেব হবে। স্মরণ রেখো! যেমন কর্ম তেমন ফল। অতএব নিজ প্রাণের প্রতি অবিচার করো না এবং তাকওয়াশীলদের অঙ্গৰ্ভুক্ত হও। আমি তোমার সাথে ‘আখবার’ (বা রেওয়ায়াত) নিয়ে বিতর্কে জড়াতে চাই না কেননা এটি উত্তাল এক সমুদ্রের ন্যায় যা কুল-কিনারা বিহীন আর যা থেকে সুস্মদ্দৃষ্টিবান ব্যক্তি ছাড়া কেউ মণিমুক্তা আহরণ করতে পারে না। অধিকান্ত ‘আসার’ (এমন হাদীস যা রসূলুল্লাহর বরাত ছাড়া সাহবিরা নিজেরা বর্ণনা করেন— অনুবাদক)-এর কথা বললে মানুষ পরম্পরাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়া আরম্ভ করে। মুক্ত চিন্তার অধিকারী স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ এ থেকে

লাভবান হয় না। আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে শুধু তা-ই বলবো যা আমাকে আমার প্রভূর পক্ষ থেকে শেখানো হয়েছে। এমনও হতে পারে, এর মাধ্যমে খোদা তোমাদের সে আধ্যাত্মিক রহস্যের বিষয়ে পথ প্রদর্শন করবেন।

আমাকে জানানো হয়েছে, তাঁরা পুণ্যবান লোকদের অঙ্গৰুক্ত ছিলেন, তাঁদেরকে যে কষ্ট দেয় সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে কষ্ট দেয় এবং সে সীমালংঘনকারীদের অঙ্গৰুক্ত। যে তাঁদের বিরক্তে আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করে ও ক্রোধভরে গালি দেয় আর গালমন্দ করা পরিয়াগ করে না, অশ্লীল আচরণ ও অপলাপ থেকে বিরত হয় না বরং তাঁদেরকে বিভিন্ন অন্যায় আত্মসাং আর শক্ততার দায়ে অভিযুক্ত করে এমন মানুষ শুধু নিজ প্রাণের প্রতিই যুলুম করে এবং নিজ প্রভূর সাথেই শক্তা করে। সাহাবিমা নিশ্চয় নির্দোষ। সুতরাং এ বিষয়ে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে যেও না। কেননা এটি সবচেয়ে বড় ধ্বংসের পথ। প্রত্যেক অভিসম্পাতকারীর নিজ সীমালংঘনের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং হিসাব-নিকাশ দিবসকে স্মরণ রেখে আল্লাহকে ভয় করা উচিত। সে মুহূর্তকে ভয় করা উচিত যখন পাপাচারীদের আক্ষেপ চরম পর্যায়ে পৌছুবে আর সীমালংঘনকারীদের চেহারা সুস্পষ্টভাবে দেখানো হবে। আল্লাহর কসম! তিনি, শায়খাইন (অর্থাৎ হ্যরত আবু বকর ও উমর) এবং তৃতীয়জন অর্থাৎ হ্যরত মুন্বুরাইন [অর্থাৎ হ্যরত উসমান (রাঃ)]-কে ইসলামের দ্বার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সাঃ)-এর অগ্রসেনারী হ্যাবার সম্মানে ভূষিত করেছেন। সুতরাং যে তাঁদের পদমর্যাদাকে অধীকার করে, তাঁদের সত্যতাকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে, এবং তাঁদের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করে না বরং তাঁদেরকে অপমান ও গালমন্দ করতে উদ্যত হয় এবং তাঁদের ওপর নোংরা আক্রমণ করে আমি এমন ব্যক্তির অঙ্গ পরিণাম ও ঈমান নষ্ট হ্যাবার আশংকা করি। যারা তাঁদের কষ্ট দেয়, অভিসম্পাত বর্ণ করে, ও তাঁদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে- পরিণতিতে এমন লোকদের হ্যদয় কঠিন হয়ে যায় এবং তারা পরম করণাময়ের ক্রোধভাজন হয়। এটি আমার বারবারের অভিজ্ঞতা এবং একথা আমি স্পষ্টভাবে বলেছি যে, এসব নেতৃবর্গের প্রতি শক্তা, সব কল্যাণের উৎস আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিল হ্যাবার সবচেয়ে বড় কারণ। যে তাঁদের প্রতি শক্তা পোষণ করে এমন মানুষের জন্য দয়া ও স্নেহের সব দ্বার রুক্ষ হয়ে যায়, তার জন্য জ্ঞান ও অঙ্গৰুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করা হয় না। আল্লাহ তাঁ'লা তাকে ইহজগতের মোহ ও ইহজাগতিক কামনা-বাসনার অধীনস্ত করে দেন এবং সে অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির ভয়াবহ খাদ ও গহবরে পতিত হয় যা তাকে বহুদ্রুরে নিষ্কেপ করে, ফলে তার বেধবুদ্ধি লোপ পায়। তাঁদেরকে (অর্থাৎ প্রথম তিন খলীফাকে-অনুবাদক) নবীদের ন্যায় কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং রসূলদের মত অভিসম্পাত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তাঁরা যে রসূলদের উত্তরাধিকারী তা সাব্যস্ত হলো এবং যুগে যুগে আগত ইমামদের ন্যায় বিচার দিবসে তাঁদের পুরক্ষারও অবধারিত হয়ে গেল। কেননা যদি কোন মু'মেনকে বিনা দোষে অভিসম্পাত করা হয়, কাফের আধ্যা দেয়া হয়, নোংরা নামে ডাকা হয় এবং অকারণে গালি দেয়া হয় তাহলে এমন মানুষ নবী ও মনোনীতদের

সদৃশ হয়ে যান। তাঁকে নবীদের মত পুরস্কৃত করা হবে এবং তিনি রসূলদের মতই পুরস্কার পাবেন। সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আনন্দগত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা যে এক সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। সম্মান ও মহিমার অধিকারী খোদার প্রশংসনুসারে তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন এবং সব মনোনীত লোকের ন্যায় তাঁদেরকেও তিনি তাঁর ফিরিশ্বত্তা দ্বারা সাহায্য করেছেন।

তাঁদের সত্যনিষ্ঠার জ্যোতি ও পবিত্রতার লক্ষণাবলী সমুজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় প্রকাশ পেয়েছে আর তাঁরা যে সত্যবাদীদের অঙ্গরূপ ছিলেন এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তাঁরাও আল্লাহ্ প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদেরকে সেসব কিছু দান করেছেন যা পৃথিবীর অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। তাঁরা কি মুনাফেক ছিলেন? কখনই না! বরং তাঁদের পুণ্য ছিল অতি উল্লেখযোগ্য। আর তাঁরা ছিলেন পবিত্রচেতা। তাঁদের দোষ-ক্রটি আর দুর্বলতা খুঁজে বেড়ানোর মত বড় অন্যায় আর নেই। তাঁদের ছিদ্রাষ্঵েষণ এবং তাঁদের পাপ খুঁজে বেড়ানোর মত বড় অপরাধ আর হতে পারে না। আল্লাহ্ করসম! তাঁরা ক্ষমার চাঁদরে আবৃত মানুষ। কুরআন তাঁদের প্রশংসা করে ও সাখুবাদ জানায় এবং তাঁদেরকে এমনসব জালাতের শুভসংবাদ দেয় যার পাদদেশে নদনদী প্রবাহিত এবং বলে, তাঁরা 'ডান দিক' (অর্থাৎ মহা সাফল্য)-এর অধিকারী, সবচেয়ে অগ্রগামী পুণ্যবান ও নেক মানুষ আর তাঁদের প্রতি আশিসপূর্ণ সালাম প্রেরণ করে এবং তাঁরা যে পছন্দনীয় লোকদের অঙ্গরূপ ছিলেন এ কথার সাক্ষ্য দেয়। এতে সন্দেহ নেই যে, তাঁরা এমন মানুষ ছিলেন যারা ইসলামের খাতিরে অন্য সব ভালবাসাকে ছির করেছেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভালবাসায় জাতির দৃষ্টিতে শক্ত হবার ঝুঁকি নিয়েছেন। তাঁরা সর্বজ্ঞানী প্রভুর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সমূহ বিপদের মুখে বাঁপ দিয়েছেন। কুরআন সাক্ষ্য দেয়, তাঁরা নিজ অভিভাবক-প্রভুকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাঁর কিভাবকে যথাযথ সম্মান দেখিয়েছেন। তাঁরা নিজ প্রভু-প্রতিপালকের ভালবাসায় সেজদারাত ও দাঁড়ানো অবস্থায় রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কুরআন যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় তার স্বপক্ষে কোনু প্রমাণটি সত্য বলে গণ্য হতে পারে? হে কুধারণা পোষণকারী! ধারণা কখনও নিশ্চিত সত্য কথার সমান হতে পারে না। তুমি কি এমন এক পক্ষ অবলম্বন করবে যাকে কুরআন ভাস্ত সাব্যস্ত করে? তোমার কাছে কোন প্রমাণ থেকে থাকলে আমাদের মুখোমুখী হও। কুধারণা পোষণকারীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। খোদার করসম! তাঁরা এমন বীর পুরুষ যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবী (সাঃ)-এর সাহায্যের জন্য মৃত্যুপূরীতে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাঁরা খোদার খাতিরে নিজ পিতা-পিতামহ ও সন্তান-সন্ততিকে পরিত্যাগ করেছেন এবং ধারালো তরবারি দিয়ে তাদেরকে টুকরো-টুকরো করেছেন, প্রিয়জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং খোদার খাতিরে তাদের শিরচ্ছেদ করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্ খাতিরে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন উৎসর্গ করতেন, তা সন্তোষ নিজ কর্মকে ভুঁচ মনে করে কাঁদতেন এবং অনুশোচনা করতেন। বিশ্বামের জন্য আপন সন্তাকে সামান্য অধিকার প্রদান করা ছাড়া তাদের চোখ সুখনিদা যাপনের জন্য কমই বক্ষ হতো আর তাঁরা মোটেও আরাম প্রিয় ছিলেন না। তাঁরা

অত্যাচারী ও আত্মসাংকারী ছিলেন, তাঁরা সুবিচার করতেন না বরং অত্যাচার-নিষ্পেষণ করতেন -তোমরা কী করে একথা ভাবতে পারো? তাঁরা যে কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে মহান আল্লাহর সন্ধিধানে সেজদাবনত ছিলেন এবং তাঁরা যে আত্মবিলীন ছিলেন এটি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। সুতরাং হে শক্রগণ! তোমরা কী কারণে গালি দিচ্ছো? এ কেমন নির্লজ্জ ভঙ্গামী? অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নমনীয়তা ও ভদ্রতা অবলম্বন কর। জ্ঞান ও সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও তোমরা যে সন্দেহ পোষণ করছো এর জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা আমার কথার তীক্ষ্ণতা ও তিক্ততাকে আপত্তির চোখে দেখো না বরং আমি তোমাদের সামনে যে প্রমাণ উপস্থাপন করেছি এর প্রতি লক্ষ্য কর এবং এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা কর।

তোমরা কুধারণা পোষণকারীদের পদক্ষে অনুসরণ করেছো। তোমরা এমন একটি গ্রন্থকে পরিত্যাগ করেছো যা মানুষকে সত্য ও দৃঢ় বিশ্বাসে অলংকৃত করে। সত্যের বিপক্ষে গেলে প্রকাশ্য ভূষিত ছাড়ি আর কিইবা বাকী থাকে? এরপ কথা কিভাবে সাহাবিদের প্রতি আরোপ করা যেতে পারে যা খোদাইভূতি ও এর বিধান বিরোধী এবং যা তাকওয়া ও এর আনুসঙ্গিক বিষয়ের পরিপন্থী? অথচ কুরআন সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ তালা তাঁদের চোখে দীমানকে প্রিয় আর কুফরী, অবাধ্যতা এবং পাপকে ঘৃণ্য করে দেখিয়েছেন। ঝাগড়া-বিবাদ নয় বরং খুনাখুনি ইওয়া সত্ত্বেও কুরআন তাঁদের কাউকে কাফের আখ্যা দেয় নি বরং তাদের উভয় পক্ষকে মুসলমান আখ্যা দিয়েছে। কুরআন শরীফে আল্লাহ তালা বলেন,

وَلَنْ تَأْفِتُنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ إِنَّ بَعْدَ رَاحِدٍ هُمْ مَا عَلِمْتُمْ إِلَّا لِخَرْقِي فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفْئِي إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ فَلَمْ تَأْكُلْنَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَذْلِي وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُشْرِكِينَ ① إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ لَهُوَمُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ إِنَّمَا يُكْرِهُونَ مَنْ وَأَنْفَقُوا اللَّهَ
لَعَلَّهُمْ تُرْجِعُونَ ②

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرُ قَوْمٌ فِنْ قَوْمٍ إِنَّمَا يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا يُنَاهَا قِنْ تَنَاهِ عَنِ
أَنْ يَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَنَاهِ عَنِ الْفَسَدِ كُلُّ دُلَّا تَنَاهِ عَنِ الْفَسَدِ إِنَّمَا يَنْهَا
الْإِنْسَانُ وَمَنْ لَمْ يَنْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ③

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءُوكُمْ مِّنَ الظَّفَرِ إِنْ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْهُ مُّقْلَمٌ لَا تَجْعَسُوا وَلَا يَغْتَبْ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنْ يَجْعَبْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلْ لَهُمْ أَخْيَهُ مَيْتَانًا فَكُوْهْ شَمْوَةٌ وَأَنْفَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
تَوَابُ رَحِيمٌ ④

(সূরা হজুরাত : ১০-১৩)

অতএব আল্লাহ্ যা বলেছেন সেদিকে দৃষ্টি দাও কেননা, তিনি সবচেয়ে বড় সত্যবাদী। কিছু বাক-বিতভার কারণে তুমি মুমেনদেরকে কাফের আখ্যা দিচ্ছো অথচ পরম্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিহুহে লিখ হওয়া সন্ত্রেও তিনি তাদেরকে মুমিন আখ্যা দিয়েছেন! আর একে অন্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাঢ়ি করা সন্ত্রেও তাদেরকে ভাই-ভাই আখ্যা দিয়েছেন! তাদের কোন পক্ষকেই তিনি কাফের আখ্যায়িত করেন নি। আল্লাহ্ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন যারা তাঁদেরকে মন্দ নামে ডাকে এবং দোষারোপ করে, যারা বস্তুর ন্যায় তাঁদের দুর্বলতাকে না ঢেকে বরং হাসি-ঠাণ্ঠা, কুৎসা, কুধারণা পোষণ ও ছিদ্রাব্বেষণ করে বেড়ায়। এ ধরনের আচরণকে কুরআন ঈমানের পর অবাধ্যতা বলে আখ্যা দিয়েছে। বরং তিনি তার প্রতি শক্তির মত ক্রোধাস্থিত হন। তাঁর বান্দারা মুমিন মুসলমানদের গালি দিবে তিনি এটি পছন্দ করেন না। যদিও এ আয়াতগুলোতে তিনি মুমিনদের এক পক্ষকে বিদ্রোহী ও অত্যাচারী এবং অন্য পক্ষকে অত্যাচারিত আখ্যা দিয়েছেন কিন্তু তাদের কোন পক্ষকেই মুরতাদ আখ্যায়িত করেন নি।

তুমি যদি মুস্তাকী হও তাহলে তোমার জন্য এ দিক-নির্দেশনাই যথেষ্ট হওয়া উচিত। নিজেকে এ আয়াতের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করো না এবং তড়িয়াড়ি করে নিজেকে ধৰ্মসের মুখে ঠেলে দিও না এবং সীমালজ্ঞনকরীদের সাথে মেলামেশা করো না। মুমিনদের প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, ওয়া আল্যামাহুম সুতরাং বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের উক্তি দেখ। তুমি কি এমন এক জাতিকে বিদ্রোহী আখ্যা দেবে যাদেরকে আল্লাহ্ খোদাইরু আখ্যা দিচ্ছেন? পুনরায় আল্লাহ্ খাতামান নবীসৈন (সাঃ)-এর সাহাবিদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন,

مُنَذَّدِ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْتَأْنَ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْسَادٌ بِيَنْهُمْ تُرْبَزُهُمْ رَكْعًا سُجْدًا أَبْتَغُونَ فَصَنْعًا
 فَنَّ اللَّهُ وَرِضْوَانًا يُسِمَّاهُمْ فِي رُجُوْهِهِمْ فَنَّ أَكْرَمُ الشَّجَوْبِ ذَلِكَ مَثْنَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْخَلْقِ
 فِي الْإِنْجِيلِ فَكَرِّزْعَ أَخْرَجَ شَطَّةً فَازْرَعَ فَأَتَنْظَلَ فَأَسْتَوْيَ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الرِّزْعَ لِيُغَيِّبُهُ
 الْكُفَّارُ

(সূরা ফাতাহ-৩০)

দেখ! প্রত্যেক সে ব্যক্তি যে তাঁদের প্রতি শক্তি রাখে, স্পষ্টভাবে তিনি তাকে কাফের আখ্যা দিয়েছেন এবং তার প্রতি ক্রোধাস্থিত হয়েছেন। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর আর সে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যিনি সাহাবিদেরকে কেবল কাফেরদের দৃষ্টিতেই ক্রোধের কারণ করেছেন। এ আয়াতগুলো এবং অন্যান্য আয়াত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা কর। আল্লাহ্ তোমাকে হেদায়াতপ্রাপ্তদের অঙ্গুরু করেও দিতে পারেন।

শিয়াদের মাঝে যারা ঘনে করে, হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক বা হ্যরত উমর ফারুক অধিকার হরণ করেছেন আর হ্যরত আলী ও ফাতেমার প্রতি অন্যায় করেছেন এমন

ব্যক্তি ন্যায়নিষ্ঠাকে জলাঞ্চল দিয়ে অন্যায়কে গ্রহণ করে এবং অত্যাচারীদের পথ বেছে নেয়। নিশ্চয়ই তাঁরা (অর্থাৎ আবুবকর ও উমর-অনুবাদক) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের খাতিরে স্বদেশ, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ ও সব মূল্যবান বস্তু পরিত্যাগ করেছেন, কাফেরদের হাতে কষ্ট পেয়েছেন এবং দুর্কৃতকারী কর্তৃক বিহৃকৃত হয়েছেন। এসব সন্ত্রেও পুণ্যবান এবং নেক লোকদের ন্যায় তাঁরা ধৈর্যধারণ করেছেন। তাঁদেরকে খ্লীফা নিযুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু তাঁরা নিজেদের বাড়ি-ঘরকে সোনা-রূপায় পরিপূর্ণ করেন নি, নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে স্বর্ণ-রৌপ্যের উত্তরাধিকারী করেন নি বরং যা কিছু পেয়েছেন তা বায়তুল মালে ফেরত পাঠিয়েছেন। তাঁরা জাগতিক ভট্ট লোকদের ন্যায় নিজ সন্তানদেরকে স্বীয় খ্লীফা নিযুক্ত করেন নি। এ পৃথিবীতে তাঁরা দারিদ্র্য এবং অসচলভাব মাঝে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধানদের ন্যায় বিলাসিতার প্রতি আসঙ্গ হন নি। এমন ধরনের মানুষ সম্পর্কে কি ধারণা করা যেতে পারে যে, এঁরা মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতেন? আত্মার ছিনতাই ও রাহাজানী করতেন? সৃষ্টির সেৱা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহচর্যের ফলাফল কি এই দাঁড়ায়?

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁদের প্রশংসা করেছেন এবং শুণগান গেয়েছেন। তোমরা যা ধারণা করছো তা আদৌ সঠিক নয় বরং তিনি তাদের আত্মা ও অস্তরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করেছেন। তাঁদের সততার সূর্যকে তিনি দেদীপ্যমান করেছেন এবং তিনি তাদেরকে পরবর্তী পবিত্র প্রজন্মের অহজ বানিয়েছেন। তাঁদের সাথে অন্যায়ের কোন সম্পর্ক দেখানো দূরে থাক আমরা এমন কোন বিষয়ের ক্ষীণ সন্তানবাও দেখি না বা আমরা ঘুণাঙ্কের ও এমন কোন সন্দেহ পোষণ করতে পারি না যা তাঁদের রূপঘ মন-মানসিকতা বা তাঁদের সামান্যতম পাপের দিকে ইঙ্গিত করতে পারে। আল্লাহর কসম! তাঁরা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। এক উপত্যকা পরিমান অবৈধ সম্পদ ও যদি তাঁদেরকে দেয়া হতো তাঁরা তাতে থু থুও ফেলতেন না। পর্বত প্রমাণ বা পৃথিবী সমান স্বর্ণও যদি থাকতো তাঁরা কামনা-বাসনার পুজারীদের মত এর প্রতি আকর্ষণ বোধ করতেন না। কোন বৈধ সম্পদ পেলে তাঁরা তা মহা প্রতাপের অধিকারী আল্লাহর পথে ধর্মীয় কাজে ব্যয় করতেন। অতএব আমরা কি করে ভাবতে পারি, এঁরা নবীজীর কলিজার টুকরো হ্যরত ফাতেমাতুয় যাহরাকে কয়েকটি গাছের জন্য ক্ষিণ করতে ও নবী-কন্যাকে দুর্কৃতকারীদের মত কষ্ট দিতে পারেন? সত্য কথা হলো, সাধুজনদের হৃদয় পরিষ্কার হয়ে থাকে। তাঁরা সত্যের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং তাঁদের ওপর খোদার পক্ষ থেকে অনেক কল্যাণ বর্ষিত হয়। আল্লাহ'তা'লা খোদাভীরুদের হৃদয়ের গোপন চিত্ত সম্পর্কে সর্বিশেষ অবহিত। এটি যদি কষ্ট দেয়া হয়ে থাকে তাহলে খোদার সিংহ এবং বীর পুরুষ হ্যরত আলীও এ থেকে মুক্ত নন বরং তিনি একেত্রে একজন সম-অংশীদার তিনি বরং আবু জাহলের মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাৱ পাঠিয়ে হ্যরত ফাতেমাকে কষ্ট দিয়েছেন। অতএব তোমার শক্তা পরিত্যাগ করা উচিত। তাকওয়া অবলম্বন কর আর বাড়াবাড়ি করা ছেড়ে দাও। সেসব লোকের উচ্ছিষ্টকে গ্রহণ করো না যারা সত্য পথ

থেকে বিচৃত আর যুক্তির আলো দেখার পরও যারা সত্যকে অবজ্ঞা করেছে। তারা মিথ্যার খাতিরে হঠকারিতার আশ্রয় নেয়। আমি তোমাকে এমন এক পথের দিকে পরিচালিত করবো যা তোমাকে সন্দেহ থেকে মুক্তি দিবে। সুতরাং চিন্তা কর এবং অজ্ঞতার আশ্রয় নিও না। আমি আল্লাহর খাতিরে কথা বলছি এবং আশা করি তুমি আকৃষ্ট হবে, যদিও আমি তোমাদের অনেকের পক্ষ থেকে কষ্টদায়ক কথা শুনছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পথপ্রদর্শনের ইচ্ছা না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দা হেদায়াত পেতে পারে না আর তাঁর ঐশ্বী পানি ছাড়া কারো পিপাসা নিবারণ হতে পারে না। তিনি আমার হৃদয়ও দেখেন আর তোমাদের হৃদয়কেও দেখেন। আমার ধ্যান-ধারণা এবং তোমাদের রীতি-নীতির ওপর তাঁর দৃষ্টি রয়েছে আর বিশ্ববাসীর হৃদয়ে কী আছে তা-ও তিনি অবহিত।

হে প্রিয়! তোমার জানা উচিত, শিয়া আলেমদের এক শ্রেণী প্রায়ই বলে থাকে, প্রথম তিনজন খলীফার (আসহাবে সালাসা) খিলাফতের সত্যতা কুরআন ও সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত নয় কিন্তু সবচেয়ে খোদাভীর বীর মুরজার (অর্থাৎ হযরত আলীর) খিলাফতের বিষয়টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এবং স্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়। এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হলো, প্রথম তিনজন খলীফা আত্মসাক্ষকারী, অত্যাচারী এবং দোষী, কেননা তাদের খিলাফত খাতামান নবীঈন ও শ্রেষ্ঠ রসূল (সা) কর্তৃক সত্যায়িত নয়।

একথার উত্তরে এতটুকু বলা যেতে পারে, চিন্তাশীল, বিচক্ষণ ও খোদাভীরদের একথা অজানা নয়, শুধু সৈয়দনা মুরজার (অর্থাৎ হযরত আলীর) খিলাফতের সত্যতা প্রমাণিত হবার দাবী নিছক একটি হঠকারিতা। এতে সত্যের লেশমাত্র নেই। এটি এমন এক অঙ্গীক ধারণা যার স্বপক্ষে আমাদের সুমহান প্রভুর প্রচেষ্ট কোন সাক্ষ্য নেই। এ দাবীর পক্ষে শিয়াদের কাছে প্রমাণের কোন নামগুলও নেই। আলোকোজ্জ্বল হোক আর প্রশংসা-বিমুখই হোক না কেন তাঁর খিলাফত যে প্রয়াণহীন এবং নিঃস্ব ব্যক্তির ন্যায় বন্ধুহীন-এতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং তুমি অন্যায় তর্ক করো না আর অথবা বীরত্ব দেখিয়ে মন্তব্যকৃত অবর্তীর্ণ হবার ধৃষ্টতা দেখাতে যেও না। আমাদের সামনে বৃথা বাগ্ধীতা প্রদর্শন করো না এবং অত্যাচারীদের পক্ষা অবশ্যম্ভব করো না। আল্লাহর কসম! আমি দীর্ঘকাল ধরে কুরআনে অভিনিবেশ ও কুরআনের আয়াতে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে আসছি আর আমি সুনিশ্চিতভাবে এথেকে খিলাফতের বিষয়টি উদ্ঘাটন করেছি। এ বিষয়ে সূক্ষ্ম গবেষণার পুরো প্রস্তুতি নিয়েছি আর গবেষণার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করেছি এবং চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করেছি, কিন্তু এক্ষেত্রে ‘আয়াতে ইস্তেখলাফের’ চেয়ে ধারালো কোন যুক্তির তরবারী আমি খুঁজে পাই নি। স্পষ্ট হয়ে গেল, ন্যায়পরায়ণ বিচারকদের মত সত্যনিষ্ঠ রায় দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য এটি খিলাফতের সত্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে বিশ্বজগতের প্রভূর পক্ষ থেকে সবচেয়ে মহান একটি আয়াত, সরব একটি প্রমাণ ও দ্যৰ্থহীন একটি ঘোষণা। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, যার স্বভাব ভাল এবং যার গভীর চিন্তাভাবনা করার অভ্যাস আছে, সে কৃতজ্ঞতার সাথে তা গ্রহণ করবে এবং তিনি

যেহেতু তাকে হেদয়াত দিয়েছেন আর প্রষ্টদের মধ্য থেকে তাকে উদ্ধার করেছেন তাই
সে আল্লাহকে স্মরণ করার পাশাপাশি তাঁর প্রশংসা গাইবে ।

নিচয় কুরআনের আয়াতগুলি সুস্পষ্ট এবং এর শিক্ষা সুনিশ্চিত । কিন্তু ‘আখবার’
(অর্থাৎ রেওয়ায়াত) ও ‘আসার’ (অর্থাৎ এমন হাদীস যা সাহাবিরা রসূলুল্লাহর বরাত না
দিয়ে বর্ণনা করেছেন) অনুমান নির্ভর, নির্ভরযোগ্য ও দক্ষ বর্ণনাকারীর দ্বারা বর্ণিত হলেও
এর শিক্ষা সন্দেহযুক্ত । তোমরা এর মুখাবয়বে বাহ্যিক ঢাকচিক্য এবং এ মহীরূহে
বাহ্যিক সতেজতা দেখতে পাবে না । কেননা, এর অধিকাংশ অঙ্ককারে ঢাকা এবং
অঙ্ককারবাসীদের হস্তক্ষেপমুক্ত নয় । এগুলোর নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করা মৌচাক থেকে
মধু সংগ্রহ করার চেয়েও কঠিন কাজ । পবিত্র ও অপবিত্র লোকদের একথা অজানা নয়,
অধিকাংশ হাদীস এভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে যেভাবে পিগসার্ত ব্যক্তি প্রথম বর্ষণের
পানি নির্বিচারে গ্রহণ করতে উদ্যত হয় । সুতরাং আল্লাহর কিতাবকে বাদ দিয়ে তোমরা
আর কোনু কথায় ঈমান আনবে? সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবার পর তোমরা যাচ্ছা কোথায়?
সত্যকে পরিত্যাগ করলে প্রতিটা ছাড়া আর কিছিবা বাকী থাকে? হে মুসলমানগণ!
পথঅস্তিতা থেকে সাবধান ।

আমি পূর্বেই বলেছি, ‘আসার’ বিশ্বাসযোগ্যতার আবশ্যিকীয় উপকরণ নিজের মাঝে
রাখে না বরং তা ধারণা, অনুমান, সন্দেহ ও দুর্বল কথার স্তুপ । সুতরাং যে কুরআনকে
পরিত্যাগ করে এগুলোর ওপর নির্ভর করে সে ধর্মসের গহ্বরে পতিত হবে এবং
ধর্মস্পাঞ্চদের শ্রেণীভুক্ত হবে । নিচয় হাদীস এক জীর্ণবত্ত্ব ও কম্পমানদেহ বিশিষ্ট
বৃক্ষের ন্যায় যে ফুরকানের ঘষ্ট ও কুরআনের সাহায্য ছাড়া দাঁড়াতে পারে না । সুতরাং
এ শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শককে (অর্থাৎ আল কুরআনকে) বাদ দিয়ে হাদীস যে তত্ত্ব ও সূক্ষ্মতার
আধ্যাত্মিক ধনভাস্তৱে সম্মত হবে -একথা কিভাবে আশা করা যায়? এটিই (অর্থাৎ আল
কুরআনই) আশ্রয়হীনদের আশ্রয় প্রদান করে, অপবিত্রদের পবিত্র করে, সঠিক প্রমাণ ও
দ্ব্যাধীন আয়াত উপস্থাপনের মাধ্যমে কথা আরম্ভ করে । এর পুরোটাই মৃত্যুমান ঈমান ।
এতে হৃদয়ে প্রশান্তি লাভের ব্যবহা আছে । এটি বর্ণনা ও ভাবের দিক থেকে দৃঢ়তর
এবং সম্মানের আসনে সমাসীন করতে ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের দিক থেকে অধিক কার্যকরী ।
যে একে পরিত্যাগ করে অন্যের প্রতি প্রেমিকের ন্যায় আসক্ত হয় সে ধর্ম ও বিশ্বস্ততাকে
পরিত্যাগ করে, আর ধর্ম থেকে সেভাবে বেরিয়ে যায় যেভাবে একটি তীর ধনুক থেকে
বেরিয়ে যায় । যে কুরআনকে পরিত্যাগ করে এবং একে শুন্দার দৃষ্টিতে দেখে না আর
এমন সব বর্ণনার অনুসরণ করে যার নির্ভেজাল হবার কোন প্রমাণ নেই, এমন ব্যক্তি
স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিপত্তি এবং সে দু'টি আক্ষেপের লেলিহান শিখায় জ্বলবে । আল্লাহ
তাকে দেখাবেন, সে স্পষ্ট ভ্রান্তির মাঝে রয়েছে । সারকথা হলো, কুরআনের প্রতি
আনুগত্যের মাঝেই নিরাপত্তা নিহিত আর কুরআনকে পরিত্যাগ করার মাঝে পূর্ণ ধর্মস
অনিবার্য । চিনাশীলদের দৃষ্টিতে ঐশী গ্রহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার মত বড় বিপদ আর

নেই। হে উদাসীন শ্রেণী! হোসাইনের কষ্ট যদি তোমাদের কাছে বড় মনে হয় তাহলে এ বিপদের ভয়াবহতাকেও একটু স্মরণ কর আর সত্যানুসঙ্গানী হও।

এখন আমরা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর খিলাফতের সত্যতা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণের লক্ষ্যে তোমার সামনে কুরআনের আয়াত এবং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করবো। কেননা সন্দেহের বাতিক এক ধরনের কষ্টে নিপত্তিত হবার নামাঞ্জুর। যে ব্যক্তি সন্দেহের বশবর্তী হয় সে নিজেকে ধৰ্মসের মুখে ঠেলে দেয়। কলহ-বিবাদ দূর করতে চাইলে তা কেবল সুনিশ্চিত প্রমাণের মাধ্যমেই করা সম্ভব। অতএব আমার কথা শুন আর দূরে সরে যেও না। আল্লাহর কাছে দোয়া কর যেন তিনি তোমাকে অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের গভিভুত করেন। সম্মানিত ও মহামহিমাবিত খোদা তাঁর পৰিত্ব অছে বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الْذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَمْكُثُنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
وَلَيَبْدِلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ
بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكُوْنَةَ وَأطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
لَا تُحْسِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُغْرِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِسْ
الْمَصِيرُ

আমাদের প্রতিপালক-প্রত্ব মু'মিনদের এই শুভ সৎবাদ দিয়েছেন এবং খলীফাদের লক্ষণাবলী উল্লেখ করছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে মার্জনা লাভের প্রত্যাশা নিয়ে আসে এবং নির্লজ্জ পছ্টা অবলম্বন করে না আর স্পষ্ট বিষয়ের ওপর সন্দেহ লেপন করে না এমন ব্যক্তির জন্য এ যুক্তি গ্রহণ করে, নির্বাচক অজুহাত ও মিথ্যা পরিত্যাগ করে পুণ্যবানদের সীমিত অবলম্বন করা আবশ্যিক।

তুমি যাতে যুক্তিটি বুঝতে পারো তাই কিছুটা বিস্তারিত বলছি। হে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ! আল্লাহ তালা এ আয়াতে মুসলমান পুরুষ ও নারীদেরকে নিশ্চিত প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই তাদের কয়েকজন মু'মিনকে অনুগ্রহ ও দয়ার নির্দর্শনস্বরূপ তাঁর খলীফা নিয়ুক্ত করবেন। তাদের ভয়ের পর তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করবেন। এটি এমন একটি বিষয় যা আমরা হযরত আবু বকরের খিলাফত ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে পুরোপুরি দেখতে পাই না। অনুসঙ্গানীদের এটি অজানা নয়, তাঁর খিলাফতকাল আশঙ্কা ও সমস্যায় জর্জরিত যুগ ছিল। কেননা, মহানবী (সাঃ)-এর ইস্তেকালের পর ইসলাম ও

মুসলমানদের ওপর একাধারে বিপদাবলী নেমে আসতে থাকে, অগণিত মুনাফেক মুরতাদ হয়ে যায় এবং মুরতাদরা ধ্ট হয়ে ওঠে । মিথ্যাবাদীদের এক শ্রেণী নবুওয়াতের দাবী করে বসে যাদের সাথে অনেক মরহুমাসী বেদুইন যোগ দেয় । এমন কি মুসায়লামার সাথে প্রায় এক লক্ষ অঙ্গ ও দুরাচারী লোক যোগ দেয় । বিশৃঙ্খলা ছেয়ে যায়, সমস্যা ঘনিষ্ঠুত হয়, দূরের ও কাছের সবকিছুই সমস্যাবৃত্ত হয়ে যায় এবং মু'মিনগণ প্রচলভাবে প্রকস্পিত হন । এমতাবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হয় আর এমন ভীতিপ্রদ অবস্থা দেখা দেয় যে মানুষের কান্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে যায় ।

মু'মিনরা এত উৎকৃষ্টিত ছিলেন যেন তাঁদের হৃদয়ে উদ্বেগের আগুন জুলছিল বা মনে হচ্ছিল যেন তাঁদেরকে ছুরি দিয়ে জবাই করা হয়েছে । একদিকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিয়োগান্তক বেদনায় কাদছিলেন অপরদিকে সে অরাজকতার কারণে অশ্রু বিসর্জন দিছিলেন যা উপস্থিতি অগ্নির মত আবির্ভূত হয়েছিল । কোথাও শাস্তির কোন নামগঞ্জও ছিল না । বিশৃঙ্খলাকারীরা গোবর-স্তুপে গজিয়ে ওঠা ঘাসের মত সর্বত্ত্বে মাথা চারা দেয় । মু'মিনদের ভয়-ভীতি বাড়তে থাকে, হৃদয়ে আশংকা ও আসের সংশ্লেষণ হয় । এমন সময় আবু বকরকে যুগের 'হাকাম' (অর্থাৎ মীমাংসাকারী) ও খাতামান নবীটিন (সা:)-এর খলীফা নিযুক্ত করা হয় । মুনাফেক, কাফের ও মুরতাদের আচার-ব্যবহার ও হাবভাব দেখে তাঁর মন দুঃখ-বেদনায় ছেয়ে যায় । তিনি আশাঢ়-শ্রাবণ ঘাসের প্রবল বর্ষণের ন্যায় একাধারে অশ্রু বিসর্জন দেন । তাঁর অংশধারা ঝর্ণার মত বইতে থাকে এবং তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য আল্লাহর দরবারে মিনতি করেন ।

হয়রত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার পিতাকে যখন খলীফা নিযুক্ত করা হয় আর আল্লাহ যখন তাঁর ওপর আমারতের (বা ঐশী নেতৃত্বের) দায়িত্ব ন্যস্ত করেন, তিনি দায়িত্ব পেতেই দেখেন, চতুর্দিক থেকে নৈরাজ্য ঢেউয়ের মত ধেয়ে আসছে । মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীকারকদের দৌরাত্ত্ব এবং মুরতাদ ও মুনাফেকদের বিদ্রোহ সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে । তাঁর ওপর এমন বিপদ নেমে আসে, যা পাহাড়ের ওপর আপত্তি হলে তা তৎক্ষণাৎ ধর্সে পড়তো এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো । কিন্তু তাঁকে নবীদের মত সুমহান ধৈর্য দেয়া হয়েছে । এক পর্যায়ে খোদার সাহায্য এসে যায়, মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীকারকরা নিহত হয়, মুরতাদ ধৰ্মস হয় এবং নৈরাজ্য দূরীভূত ও সংকট অপসৃত হয় । সমস্যার নিরসন হয় এবং খিলাফত দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় । আল্লাহ মু'মিনদের বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত করেন এবং ভয়-ভীতির পর নিরাপত্তা বিধান করেন আর তাঁদের ধর্মকে দৃঢ়তা দান করেন । একটি বিশাল জনগোষ্ঠীকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বিশৃঙ্খলদেরকে অপদস্থ করেন । তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত রক্ষা করেন এবং তাঁর বাস্তা 'সিদ্দীক'কে সাহায্য করেন । বিদ্রোহী ও গরানিকদের (অর্থাৎ প্রতিমাদের) ধৰ্মস করেন এবং কাফেরের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করেন । অতএব তাঁরা পরাজিত হয় ও কুফরী থেকে

ফিরে আসে এবং অনুশোচনা করে। এটিই কাহ্হার খোদার প্রতিশ্রুতি ছিল এবং তিনি সবচেয়ে বড় সত্যবাদী। দেখ! কত স্পষ্টভাবে হ্যরত আবু বকরের সতায় খিলাফতের প্রতিশ্রুতি সব আনুসঙ্গিকতা ও লক্ষণসহ পূর্ণ হয়েছে। আল্লাহর কাছে দোয়া কর, তিনি যেন তোমার বক্ষকে এ নিশ্চিত সত্য প্রহণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। তিনি যখন খলীফা হন তখন মুসলমানদের অবস্থা কেমন ছিল তা একটু ভেবে দেখ। সমস্যার কারণে ইসলামের অবস্থা অগ্নিদণ্ড ব্যক্তির মত ছিল। এরপর আল্লাহ তা'লা ইসলামকে পুনরায় শক্তি যুগিয়েছেন এবং অঙ্কারাধন গভীর কৃপ থেকে একে উদ্ধার করেছেন। মিথ্যা নবুওয়তের দাবীকারকদের বেদনাদায়ক শাস্তি দিয়ে হত্যা করা হয় আর মুরতাদরা ছাগল ভেড়ার মত ধ্বংস হয়। আল্লাহ মু'মিনদেরকে সেই ভয়ভীতির অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন যাতে তারা মৃত্যুবৎ হয়ে ছিল। এ সমস্যা দূরীভূত হবার পর মু'মিনগণ আনন্দিত হন। আর তাঁরা হ্যরত সিদ্দীক (রাঃ)-কে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করেন, তাঁকে প্রাণঢালা সম্ভাষণ জানান, তাঁর প্রশংসা করেন এবং তাঁর জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন। তাঁকে মাহাত্ম্য প্রদান করতে ও সম্মান প্রদর্শনে তাঁরা কালাবিলম্ব করেন নি। তাঁর ভালবাসাকে তাঁরা নিজ হৃদয়ে স্থান দেন, সব বিষয়ে তাঁর আনুগত্য করেন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁরা নিজ হৃদয়কে খুব ভালভাবে পরিষ্কার করেন এবং ঈমানের সত্তেজতাকে ধরে রাখার সর্বৈব চেষ্টা করেন। তাঁরা প্রেম ও ভালবাসার চেতনায় সমৃদ্ধ হন। সর্বাত্মক চেষ্টা করে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তাঁরা তাঁর আনুগত্য করেছেন এবং তাঁকে নবীদের মত কল্যাণমত্তিত ও সাহায্যপ্রাণ মনে করতেন। এ সবকিছু সিদ্দীকের নিষ্ঠা ও তাঁর গভীর ঈমানের প্রমাণ।

আল্লাহর কসম! তিনি ইসলামের জন্য দ্বিতীয় আদম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক জ্যোতির প্রথম বিকাশ ছিলেন। তিনি নবী ছিলেন না ঠিকই কিন্তু তাঁর মাঝে নবীদের বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর নিষ্ঠার কারণে ইসলামের বাগানের পরিপূর্ণ আকর্ষণ বহাল হয়েছে। তীরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হবার পর এটি পুনরায় নিজ সৌন্দর্য ও সত্তেজতা ফিরে পেয়েছে, এতে বিভিন্ন প্রকারের ফুল ধরেছে এবং এর ডালপালা মলিনতামুক্ত হয়েছে। অথচ ইতোপূর্বে ইসলামের অবস্থা এমন এক লাশের ন্যায় ছিল যার জন্য বিলাপ করা হয়েছে, এমন এক ভূমির ন্যায় ছিল যা পরিত্যক্ত ও পতিত, এমন এক আহত ব্যক্তির ন্যায় ছিল যাকে বহু সমস্যায় জর্জরিত করা হয়েছে এবং জবাইকৃত এমন এক পশুর মত ছিল যার ওপর নির্দয়ভাবে ছুরি চালানো হয়েছে আর এমন ক্রিট এক মানুষের মত ছিল যে বিভিন্ন প্রকার ক্লাসিতে অবসাদগ্রস্ত আর এমন এক অগ্নিদণ্ড ব্যক্তির মত ছিল যাকে গ্রীষ্মের তঙ্গ দুপুরে জলস্ত আওনের লেলিহান শিখায় পোড়ানো হয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'লা একে সমৃহ বিপদ থেকে মুক্তি ও সব সমস্যা থেকে পরিআশ দিয়েছেন এবং একে বিস্ময়কর সমর্থন যুগিয়েছেন। বাহ্যত ভেসে পড়ার পর এবং মাটির সাথে মিশে যাবার পর এক পর্যায়ে ইসলাম আবার বাদশাহদের নেতৃত্ব দানের আসনে অধিষ্ঠিত হয় এবং শিকলে আবদ্ধ মানুষের

অভিভাবকের আসন অলংকৃত করে। ফলে মুনাফেকদের মুখ বঙ্গ হয়ে যায় আর মু'মিনদের মুখে হাসি ফুটে। তখন সবাই প্রভু-প্রতিপালকের প্রশংসা ও আবু বকরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আর যিন্দিক (অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্বারী সশস্ত্র মুরতাদ) ও অবাধ্য ব্যক্তি ছাড়া সবাই তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। এ সবকিছু সে ব্যক্তির নির্ধারিত পুরুষার যাঁকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন এবং বেছে নিয়েছেন, যাঁর প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং যাঁকে তিনি সুরক্ষা করেছেন। আল্লাহ পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

সারকথা হলো, এ আয়াতগুলো হয়রত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর খিলাফতের সত্যতার প্রমাণ বহন করে। এর অন্য কোন অর্থ করা যায় না। সুতরাং তুমি বিশ্বেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখ এবং খোদাকে ভয় কর আর বিদ্বেশপরায়ণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। দেখ! এ আয়াতগুলোতে ভবিষ্যত্বাণী করা হয়েছে যেন এর পরিপূর্ণতার মাধ্যমে মু'মিনদের ঈমান বৃক্ষ পায়। আর আল্লাহ তা'লা এ আয়াতগুলোতে মহানবী (সাঃ)-এর তিরোধানের পর ইসলামের উপর নৈরাজ্য ও বিপদাবলী আপত্তি হবার সংবাদ দিয়েছেন, তাঁরা যেন মহা সম্মানিত প্রভুর এ প্রতিশ্রূতিকে অনুধাবন করতে পারেন। তিনি প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন, সে যুগে তিনি কয়েকজন মু'মিনকে খলীফা নিযুক্ত করবেন যাদেরকে ডয়াতীতিপূর্ণ অবস্থা থেকে মুক্ত করে তিনি নিরাপত্তা প্রদান করবেন এবং তিনি নিজ ধর্মকে অস্থিতিশীল অবস্থা থেকে মুক্ত করে দৃঢ়তা দান করবেন আর শক্তদের ধৰ্মসে করবেন। এ সংবাদ যে হয়রত আবু বকরের সত্ত্বায় ও তাঁর যুগে পূর্ণ হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং তুমি অস্থীকার করো না। তাঁর সত্যতার প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে তিনি ইসলামকে এমন একটি দেয়ালের মতো দেখতে পেয়েছেন যা দুর্কৃতকারীদের দুর্কৃতির ফলে ধৰ্মসে পড়ার উপকৰণ হয়েছিল আল্লাহ তা'লা এটিকে তাঁর হাতে এমন একটি দূর্ভেদ্য দূর্গে ঝাপান্তরিত করেন যার দেয়াল লৌহ নির্মিত। এতে এমন সেনাদল রয়েছে যারা একান্ত অনুগত, ভৃত্যের ন্যায় বাধ্য। সুতরাং একটু চিন্তা করে দেখ, এ কথায় কি কোন সন্দেহ আছে বা তুমি অন্য কারও দলে কি এর দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে?

আমি জানি কিছু কিছু শিয়া এ ব্যাপারে (অর্থাৎ খিলাফত প্রসঙ্গে) সুন্নীদের সাথে বিভিন্ন লিঙ্গ হয়। বিভিন্নার এযুগ অনেক দীর্ঘায়িত হয়েছে। প্রায়শই বিষয়টি বাক-বিভিন্ন থেকে মারামাতি অনন্তর কলহ-বিবাদে গিয়ে ঠেকে আর আদালত ও মামলাবাজি পর্যন্ত গড়ায়। আমি শিয়াদের আচরণ এবং তাদের নিরুদ্ধিতা দেখে আশ্চর্য হই। তাদের সীমাত্তিরিত সন্দেহ দেখে আক্ষেপ হয়। তাদের সামনে আয়াত স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও এসে গেছে, এতদস্বত্বেও তারা রেগে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর ন্যায়পরায়ণদের মত চিন্তা করে না।

তাদের ও আমাদের মাঝে সুবিদিত একটি বিষয়ের প্রতি আমি তাদেরকে আহবান জানাই যা তাদের দৃষ্টি উয়োচন করতে পারে। তা হলো, আমরা একটি নির্দিষ্ট প্রতিযোগিতার ময়দানে উপস্থিত হয়ে বিনয়ের সাথে 'কাহহার' খোদার দরবারে দোয়া

করি এবং মাঠে বিরুদ্ধে আল্লাহর অভিসম্পাত যাচনা করি। আমার দোয়ার ফলাফল যদি এক বছরের মধ্যে প্রকাশ না পায় তাহলে আমি যে কোন শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত। সেক্ষেত্রে আমি স্থিরাকার করে নেবে, তারা সত্যবাদীদের অস্তর্ভুক্ত। একই সাথে তাদেরকে পাঁচ হাজার প্রচলিত মুদ্রা দেব। আমি যদি না দেই তা হলে আমার ওপর কিয়ামত পর্যন্ত অভিশাপ বর্ষিত হোক! তারা চাইলে আমি ট্রিটিশ সরকারের কোষাগারে বা অন্য কোন সম্মানিত ব্যক্তির কাছে এ অর্থ জমা রাখতে পারি। অবশ্য এক্ষেত্রে আমি যেন-তেন ব্যক্তিকে সমোধন করছি না। আমি শুধু তাকে সমোধন করছি, যে আমার এ পৃষ্ঠিকার আদলে একটি পৃষ্ঠিকা রচনা করবে। আমি এই রীতি অবলম্বন করেছি যেন এটি স্পষ্ট হয়ে যায়, যাকে মোবাহালা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহবান করা হচ্ছে সে ব্যক্তি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী এবং এমন কান্ডজানহীন অঙ্গদের অস্তর্ভুক্ত নয় যে আরবী ভাষার জ্ঞান রাখে না। কেননা যে ব্যক্তি পশ্চতুল্য সে পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হতে পারে না। যে উটের ন্যায় অসভ্য সে সভ্য ও শালীন লোকের বৈঠকে বসার যোগ্য নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তির জন্য প্রতিপক্ষের সাথে কিছুটা সামঞ্জস্য থাকা অবশ্যক। সুতরাং যে আমার মত দক্ষ লেখক নয়, আমার মতে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্য নয়। যেহেতু সর্বশক্তিমান ও সৃষ্টির সূচনাকারী খোদার কৃপায় আমি এ অনবদ্য পদমর্যাদার শিখরে উপনীত, তাই আমি এ সম্মানিত স্থানে আমার মত ব্যক্তিই দেখতে চাইব। আমি যার তার সাথে প্রতিযোগিতায় নামা পছন্দ করি না, কারণ এটি আমার জন্য অসমানজনক আর এটি আমার সুমহান মর্যাদার পরিপন্থী। আমি এমন কোন ব্যক্তির সাথে কথা বলবো না এবং অঙ্গদেরকে উপেক্ষা করবো।

আমাকে জানানো হয়েছে, মহিমা ও পদমর্যাদার দিক থেকে সব সাহাবীর মাঝে হ্যারত আবু বকর (রাঃ) সবচেয়ে বড় ও মহান ছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি প্রথম খলীফা ছিলেন আর তাঁর সম্পর্কে আয়ত ইস্তেখলাফ অবর্তীর্ণ হয়েছে।

সুতরাং হে কৃষ্টি ও সভ্যতার শক্র! তাঁর যুগ অতীত হবার পর যদি খিলাফতের যোগ্য অন্য কেউ ছিল বলে তোমরা দাবী কর আর তোমরা যদি এ দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে তার সঠিক প্রমাণ উপস্থাপন কর। তোমরা তা কখনও করতে পারবে না। যদি তা না পার তাহলে নেক লোকদের শক্রতা পরিত্যাগ কর আর এমন কলহ-বিবাদ বন্ধ কর যা শক্রতার আগুন ছড়িয়ে থাকে। সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবার পরও অন্যায় কলহ-বিবাদের আশ্রয় নেয়া এবং প্রতিবন্ধকতা দ্রু হবার পরও সত্যের দুয়ারে প্রবেশ না করা মুমিনের জন্য শোভনীয় নয়। তোমরা কিভাবে এমন এক ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করতে পারো, যার দাবীকে আল্লাহ তাল্লা সত্য প্রমাণ করেছেন? যখন তিনি সাহায্য চেয়েছেন তিনি তাঁকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর সমর্থনে নির্দর্শন প্রকাশ করেছেন আর যত্যন্ত্রকারীদের চক্রান্তের মূল উৎপাটন করেছেন? তিনি ইসলামকে এমন সব বিপদপদ থেকে মুক্ত করেছেন যা সবকিছু দুমড়েমুচড়ে ফেলে আর এমন অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছেন যা সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তিনি সমস্ত বিষাক্ত সাপকে হত্যা

করেছেন, শাস্তি ও নিরাপত্তা বিধান করেছেন এবং বিশ্বপ্রতিপালকের অনুগ্রহে সকল মিথ্যাবাদীকে পরাম্পরাগত করেছেন।

হযরত সিদ্দীকের আরও অনেক গুণ ও অবদান রয়েছে যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। মুসলমানদের প্রতি তাঁর অনেক অনুগ্রহ রয়েছে। এ কথাকে চরম সীমালংঘনকারী ছাড়া অন্য কেউ অঙ্গীকার করবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেখানে আল্লাহ তা'লা তাঁকে মু'মিনদের মাঝে শাস্তি প্রতিষ্ঠা এবং কাফের ও মুরতাদের জ্বালানো আগুন নিভানোর কারণ বানিয়েছেন, সেখানে আল্লাহ তাঁকে কুরআনের প্রথম সুরক্ষাকারী, কুরআনের প্রথম সেবক ও এর প্রথম প্রচারকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কুরআন সঞ্চলন ও দয়াময় খোদার প্রিয় রসূল (সা:) -এর কাছ থেকে এর ধারাবিন্যাসের জ্ঞান লাভের জন্য তিনি নিজের সব চেষ্টা নিয়োজিত করেছেন। ধর্মের শুভাকাঞ্চিততায় তাঁর দু'নয়ন বহমান বরনার তুলনায় অধিক পানি বিসর্জন দিয়েছে। এ কথাগুলো সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বাসযোগ্য কিন্তু বিদ্বেষ মানুষের বৃদ্ধি-জ্ঞানকে বন্ধ্যা করে দিয়েছে। তুমি যদি প্রকৃত ঘটনা ও সার কথা জানতে চাও তাহলে নিজের সংশোধন কর, বিদ্বেষের ধূলা যেন আবার তোমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে না ফেলে। বিশেষ করে তোমাকে অন্যায় পরিত্যাগ করতে হবে, কেননা সুবিচার কল্যাণের চাবিকাঠি। অধিকন্তু শুধু সুবিচার ও ন্যায়ের আলোই হৃদয় থেকে অঙ্গকারের কল্পনা দ্রু করতে পারে। সত্য জ্ঞান আর সঠিক বৃৎপত্তি খোদার আরশের ন্যায় মহান একটি বিষয় আর সুবিচার এতে আরোহণের সিঁড়িস্বরূপ। সুতরাং যে সমস্যার সমাধান চায় আর আধ্যাত্মিক রহস্য উদ্ঘাটন করতে চায় তার পুণ্য কর্ম করা উচিত এবং অন্যায়, বিদ্বেষ ও অত্যাচারীদের রীতি পরিহার করা উচিত।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর বিশেষ গুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের একটি দিক হলো, তাঁকে হিজরতের সময় মহানবী (সা:) -এর সফরসঙ্গী হবার বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে এবং সমস্যার সূচনাতেই তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির (সা:) বিপদের সাথী ও তাঁর বিশেষ বক্তু সাব্যস্ত করা হয়েছে যেন এর ফলে সম্মানিত খোদার একান্ত প্রিয় রসূলের পাশাপাশি তাঁর বিশেষত্বও প্রমাণিত হয়। এর রহস্য হলো, আল্লাহ তা'লা জানতেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন সাহাবীদের মাঝে সবচেয়ে সাহসী, সবচেয়ে বেশী খোদাবীরু, রসূলুল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় ও বিভিন্ন গুণের সমাহার এবং বিশ্ব-সর্দারের ভালবাসায় নিবেদিত প্রাণ। তিনি শুরু থেকেই রসূলে করীম (সা:)-এর পাশে দাঁড়াতে এবং তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের তত্ত্ববধানে অভ্যন্তর ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা তাঁর নবীকে কঠিন সময় ও সংকটময় পরিস্থিতিতে সান্ত্বনা দিয়েছেন। তাঁকে সিদ্দীক নাম দেয়া হয়েছে এবং জিন্ন ও মানবকুলের মধ্যে তাঁকেই রসূলের নৈকট্যের লাভের বিশেষত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'লা তাঁকে 'সানিয়া ইসনাইনে'র (দু'জনের দ্বিতীয়) উপাধি দান করেছেন এবং তাঁকে বাছাইকৃত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এর পাশাপাশি হয়েরত আবু বকর (রাঃ) একান্ত অভিজ্ঞ এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের অঙ্গৰুক ছিলেন। তিনি অনেক জটিল বিষয় দেখেছেন এবং এর ভয়াবহুতা প্রত্যক্ষ করেছেন। অনেক যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং এর রীতিনীতি অবলোকন করেছেন। অনেক মরুজঙ্গল এবং এর প্রস্তরাকীর্ণ প্রান্তর তিনি অতিক্রম করেছেন। কত ধ্বংসস্থল তিনি জয় করেছেন, কত বক্র পথ তিনি সোজা করেছেন! কত যুদ্ধে তিনি বীরসেনানীর ন্যায় সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করেছেন! কত নৈরাজ্যকে তিনি নির্মূল করেছেন আর কত বাহন তিনি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে দুর্বল করেছেন! পথ পাড়ি দিতে দিতে তিনি অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোকদের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। একই সাথে তিনি কঠিন পরিস্থিতির মুখে পরম ধৈর্য প্রদর্শন করেছেন এবং খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকেছেন। তাই আল্লাহু তাঁকে তাঁর সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছেন এবং তাঁর আয়াতের সত্যায়নস্থল সাব্যস্ত করেছেন আর আন্তরিকতা ও দৃঢ়ত্বার জন্য তাঁর প্রশংসন্মা করেছেন এবং ইঙ্গিত করে বলেছেন, তিনি মহানবী (সাঃ)-এর নিকটতম বক্সুদের অঙ্গৰুক এবং সামু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বিশ্বস্তার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বাপ্রে। সেই কারণেই তাঁকে চরম ভীতিপ্রদ মুহূর্তে (সাথী হিসেবে) বেছে নেয়া হয়েছে এবং এরপ আশক্তাজনক সময় তাঁকে বেছে নেয়া হয়েছে যা ছিল সর্বশাস্ত্রী ও ভয়কর। সর্বজ্ঞানী ও প্রজাময় আল্লাহু যেভাবে পানিকে এর উৎস থেকে প্রবাহিত করেন সেভাবে তিনি প্রতিটি বিষয়কে এর যথাযথ মর্যাদা দিয়ে থাকেন। তদনুযায়ী তিনি ইবনে আবী কাহাফার দিকে মেহের দৃষ্টি দিয়েছেন, তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করছেন এবং তাঁকে অসাধারণ লোকদের শ্রেণীভুক্ত করেছেন। সবচেয়ে সত্যভাষী আল্লাহু বলেন :

إِلَّا تَصْرُوُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي
 الْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ
 بِحَتْمَدَ لَمْ تَرُوهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلَى
 وَاللَّهُ أَعْزِيزٌ حَكِيمٌ

সুতরাং কিছুটা বুদ্ধিমত্তা ও প্রজার সাথে এ আয়াত সম্পর্কে ভেবে দেখ, আর জেনে-শুনে উদ্দেশ্য প্রশংসিতভাবে উপেক্ষা করো না।

বিশ্বজগতের প্রত্যু যা বলেছেন এর প্রতি সুদৃষ্টি দাও। সৎ, পুণ্যবান এবং কাহার খোদার প্রিয়দের গালি দিয়ে বিপজ্জনক পথে পা বাঢ়িও না। কেননা সবচেয়ে উত্তম নৈকট্য লাভের মাধ্যমে হলো, তাকওয়ার পথ অনুসরণ করা আর ধ্বংসের পথকে পরিহার করে চলা। নিরাপদ থাকার সবচেয়ে উত্তম পথ হলো নিজের মুখ সামলানো, গালি, পরচর্চা ও ভাইয়ের মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকা। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা কর। এগুলো কি সিদ্ধীকরে প্রশংসন্মা করে নাকি তাঁকে নিন্দনীয় ও ক্রোধভাজন আখ্যা দেয়? অন্য কোন সাহাবী সম্বন্ধে এসব প্রশংসনীয় গুণাবলী উল্লেখ

করতঃ স্পষ্টভাবে প্রশংসা করা হয়েছে বলে কি তোমার জানা আছে? তুমি কি এমন অন্য কাউকে জানো যাকে ‘দু’জনের দ্বিতীয়’ এবং মহানবী (সাঃ)-এর সাথী আখ্য দেয়া হয়েছে ‘ইন্দ্রান্নাহ মাআনা’র সমানে যাকে অংশীদার এবং দু’জন সাহায্যপ্রাণদের অঙ্গভূক্ত করা হয়েছে অন্য কোন ব্যক্তিকে কি তুমি জানো যাকে কুরআনে এভাবে প্রশংসা করা হয়েছে এবং যার গোপন আত্মিক অবস্থাকে সন্দেহের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে এভাবে উম্মোচন করা হয়েছে? তাঁর সম্পর্কে একথা কোনো ধারণা বা সন্দেহের ভিত্তিতে নয় বরং সুস্পষ্ট আয়াতের আলোকে প্রমাণিত যে, তিনি নৈকট্যপ্রাণদের অঙ্গ রূক্ষ ছিলেন। আল্লাহর কসম! এমন অকাট্য সুস্পষ্ট উল্লেখ আদি গৃহ কা’বা শরীফের প্রভূর গ্রহে হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে আমি দেখি নি। আমার বক্তব্য সম্পর্কে যদি তোমার সন্দেহ থাকে বা তুমি যদি মনে কর, আমি সত্য থেকে বিচ্যুত, তাহলে অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে কুরআন থেকে সুস্পষ্ট উদাহরণ উপস্থাপন কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

আল্লাহর কসম! হ্যরত আবু বকর এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষভূতের পোষাক দান করা হয়েছে। আল্লাহ তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি বিশেষ লোকদের অঙ্গভূক্ত ছিলেন, তাঁকে সঙ্গ দেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর প্রশংসা করেছেন, তাঁকে মূল্যায়ন করেছেন, তাঁর গুণগান গেয়েছেন এবং তার সমক্ষে ইঙ্গীত করে বলেছেন, তিনি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি অন্য সব নিকট আত্মীয়কে পরিত্যাগ করা পছন্দ করেছেন কিন্তু প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সাথে বিচ্ছেদ তাঁর জন্য অসহ্য ছিল। তিনি বস্তুকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাঁর কাছে ছুটে এসেছেন। পরম আত্মহের সাথে তিনি মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়েছেন এবং হৃদয়ের সব কামনা-বাসনাকে পরিহার করেছেন। রসূল (সাঃ) তাঁকে সঙ্গ দেয়ার অনুরোধ করলে তিনি বললেন, ‘লাববায়েক’ আমি উপস্থিতি। জাতি যখন মহানবী মুস্তাফা (সাঃ)-কে বিহিন্দারের ঘড়যন্ত্র করলো, মহান খোদার বস্তু নবী (সাঃ) তাঁর কাছে গেলেন এবং বললেন, আমাকে হিজরতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তুমিও আমার সাথে হিজরত করবে আর এ আবাসভূমি পরিত্যাগ করবে। এ ধরনের সমস্যার মুখে সফরসঙ্গী করার কারণে হ্যরত আবু বকর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন। তিনি নির্বাতিত নবী (সা:)-কে সাহায্য করার সুযোগ খুঁজতেন। এক পর্যায়ে সে সুযোগ এসে গেল। তখন তিনি দুঃখ ও চরম উৎকর্ষার সময় পরম আত্মরিকতা ও এক দুর্বার উম্মাদনার সাথে তাঁকে সংগ দিয়েছেন আর হত্যাকারীদের আক্রমণের ভয় করেন নি।

অতএব তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব জাজ্জল্যমান প্রজ্ঞা ও কুরআনের দ্ব্যাধীন আয়াতের আলোকে প্রমাণিত। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অকাট্য মুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর নিষ্ঠা সমুজ্জ্বল প্রভাতের ন্যায় সুস্পষ্ট। তিনি পরকালের নিয়ামত নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন আর ইহ-জাগতিক বিলাসিতাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। কেউ তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ধারেকাছেও ভিড়তে পারবে না।

তুমি যদি প্রশ্ন কর, আল্লাহু খিলাফতের ধারা সূচিত করার জন্য তাঁকে কেন বেছে নিলেন? অতিশয় দয়ালু খোদার এহেন কাজের পেছনে রহস্যই বা কি? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, আল্লাহু তাঁ'লা জানতেন, হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক (খোদা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকেও নিজ সন্তুষ্টির ছায়ায় রাখুন) এক অমুসলিম জাতির মধ্য থেকে মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি সমর্পিত হৃদয় নিয়ে তখন ঈমান এনেছেন যখন তিনি (সাঃ) একা ছিলেন আর চারিদিকে চরম নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। ঈমান আনার পর তিনি বিভিন্ন ধরনের লাঙ্গলা, গঞ্জনা সয়েছেন। স্বজাতি, আতীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধু সবাই তাঁকে অভিসম্পাত দিয়েছে। রহমান খোদার পথে তাঁকে কষ্ট দেয়া হয়েছে। যেভাবে বিশ্ব-রসূল বহিঃকৃত হয়েছেন সেভাবে তিনিও স্বদেশ থেকে বহিঃকৃত হন। শক্তর পক্ষ থেকে অনেক কষ্ট এবং বন্ধুদের পক্ষ থেকে তিনি অনেক অভিসম্পাত ও সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি তাঁর সম্পদ ও জীবনের বাজি রেখে মহাসম্মানিত প্রভুর পথে জিহাদ করেছেন। সম্মান ও প্রাচুর্যের মাঝে লালিত-পালিত হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যত: লাঙ্গলার জীবন বরণ করেছেন। খোদার খাতিরে তিনি বহিঃকৃত হন এবং খোদার পথে তাঁকে দুঃখ দেয়া হয়। তিনি আল্লাহুর পথে সম্পদ দিয়ে জিহাদ করেছেন। প্রাচুর্য লাভের পর তিনি গরীব ও নিঃশ্ব ব্যক্তির মত হয়ে যান। তাঁর অতীত দিনগুলোর প্রতিদান দিতে এবং তাঁর যে ক্ষতি হয়েছে এর তুলনায় উত্তম দানে ভূষিত করতে এবং খোদার সন্তুষ্টির সঙ্কানে তিনি যে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন এর জন্য আল্লাহু তাঁকে পূরকৃত করার সিদ্ধান্ত নেন। আল্লাহু নেক লোকদের প্রতিদানকে নষ্ট করেন না। তাঁর প্রভু তাঁকে খলীফা বানিয়েছেন এবং তাঁর নামকে সম্মুত করেছেন। তিনি দয়া ও অনুগ্রহের নিদর্শনস্বরূপ তাঁকে সাম্রাজ্য প্রদান করেন, তাঁর সম্মান প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁকে আমীরুল্ল মুমিনীন নিযুক্ত করেন।

শোন! আল্লাহু তোমাদের প্রতি করুণা করুন। সাহাবিরা সবাই মহানবী (সাঃ)-এর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গতুল্য এবং মানব জাতির গর্ব ছিলেন। তাঁদের কেউ রহমান খোদার প্রেরিত রসূলের চোখ সদৃশ, কেউ কান এবং কেউ হাত আর কেউবা পা সদৃশ ছিলেন। তাঁরা যে কাজ বা যে চেষ্টাই করেছেন সবকিছু এ নীতি অনুসরণেই সংঘটিত হয়েছে। সে কাজের মাধ্যমে তাঁরা বিশ্ব-জগতের প্রভু, বিশ্ব-প্রতিপালকের সন্তুষ্টি সঙ্কান করতেন। যে বলে সাহাবাত্য {অর্থাৎ হ্যরত আবু বকর, উমর ও উসমান (রাঃ)} কাফের, মুনাফেক এবং আত্মসাংকারী ছিলেন, সে আসলে তাঁদের সবাইকে অস্থীকার করে। কেননা সাহাবিরা সবাই হ্যরত আবু বকর, হ্যরত উমর এবং তাঁর পর হ্যরত উসমানের হাতে বয়াত করেছেন- (আল্লাহু তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন আর তাঁদেরকেও নিজ সন্তুষ্টির ছায়ায় রাখুন)। তাঁরা তাঁদের মহান নির্দেশে অনেক যুদ্ধে গিয়েছেন, অনেক দেশ পাড়ি দিয়েছেন এবং ইসলাম প্রচার করেছেন আর অবিশ্বাসীদের অনেক দেশ জয় করেছেন। আমি সে ব্যক্তির চেয়ে বড় অজ্ঞ আর দেখি না যে দাবী করে, মহানবী (সাঃ)-এর ইস্তেকালের পর সব মুসলমান মুরতাদ হয়ে গেছে। এমন ব্যক্তি বাস্তবিক পক্ষে

সেসব প্রতিশ্রূতিকে মিথ্যা আখ্যা দিচ্ছে যা সর্বজনীনী আল্লাহ, আমাদের অতি প্রিতি প্রভু, জাতি ও ধর্মের নিরাপত্তাবিধায়ক খোদা ইসলামকে সাহায্য করার নিমিত্তে দিয়েছেন এবং যা তাঁর কিভাবে উল্লেখিত আছে। এটি অধিকাংশ শিয়ার উক্তি। তারা অন্যায় কথা বলতে গিয়ে সব সীমা লংঘন করে। তারা সত্যকে দেখেও চোখ বন্ধ করে রাখে। সুতরাং আমাদের ও তাদের মাঝে মৈতেক্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? ভালবাসা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? তারা এক উপত্যকায় অবস্থান করছে আর আমরা ভিন্ন উপত্যকায়। আল্লাহ জানেন, আমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

তাদের জন্য আঙ্কেপ! তারা তাদের বিদ্বেষের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারছে না এবং অপবাদ আরোপ করা থেকেও বিরত হচ্ছে না। তাদের অবস্থা দেখে আমি আশ্চর্য হই। জানি না তাদের ঈমানটি কেমন? তারা সাহাবাত্রয়কে কাফের আখ্যা দেয়, মুনাফেক ও মুরতাদ মনে করে অথচ আল কুরআন তাদের কাছে এ তিনজন ‘কাফেরের’ মাধ্যমেই এসে পৌঁছেছে। এমন পরিস্থিতিতে তাদের বিশ্বাস এটি হওয়া উচিত, মানুষের হাতে বর্তমানে যে কুরআন আছে তা তেমন কিছু নয় বরং এর কোন ভিত্তিই নেই, এটি মানুষের প্রতিপালকের বাণী নয়, বরং প্রক্ষেপণকারীদের কথার সংকলন। তাদের দাবী অনুসারে, এরা সবাই বিশ্বাসঘাতক ও আত্মসাংকারী ছিলেন আর তাঁদের কেউ বিশ্বস্ত এবং ধার্মিক ছিলেন না। বিষয়টি যখন এমনই তখন ধর্ম নিয়ে এত মায়াকান্ডার দরকার কি? শিক্ষা লাভের জন্য তাদের হাতে আল্লাহর কোন্ত কিভাবটিই বা রইলো? তাই প্রমাণিত হলো, এরা এমন একটি প্রবাস্তিত জাতি যাদের কোন ধর্ম নেই, কোন ধর্মীয় কিভাবও নেই। কেননা যে জাতি মনে করে, সাহাবিরা কুফরী করেছেন, মুনাফেক হয়ে গেছেন, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছেন, শিরুক করেছেন, তারা কুফরীর নোংরামীতে কল্পুষ্ট এবং পরিব্রাতা ও অবলম্বন করেন নি; তাদেরকে একই সাথে এ কথাও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, কুরআনও তাহলে আর নির্ভেজাল নেই। এর প্রকৃত রূপে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে বা সংযোজন ও বিয়োজন ঘটেছে। এর আকার-অবয়ব পরিবর্তন করে একে অঞ্চলিক করে তোলা হয়েছে। উক্ত স্বীকারেক্ষিত ফলে তাদের অবশ্যই এ কথা বলারও ধৃষ্টতা দেখাতে হবে, কুরআন পুণ্যবান মু'মিনদের হাতে প্রচারিত হয় নি বরং এর প্রসার করেছে এক কাফের, বিশ্বাসঘাতক ও মুরতাদ জাতি। যে ক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাস হলো, কুরআন হারিয়ে গেছে, যারা তা সংকলন করেছেন তারা সবাই কাফের এবং প্রত্যাখ্যাত। সে ক্ষেত্রে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, খাতামান নবীসুন্ন হ্যরত আবুল কাসেম মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি যা নাযেল হয়েছে, এর প্রতি এদের কোন বিশ্বাস নেই। এদের জন্য জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিশ্বাস অর্জনের পথ রুদ্ধ। এদেরকে সমুদয় ঐশ্বী গ্রন্থাবলী অস্থীকার করতে হবে। সুতরাং এরা নবীদের সত্যায়ন এবং তাঁদের কিভাবের প্রতি ঈমান আন্দৰণ করা থেকে বর্ণিত। একথাকে যদি আমরা সত্য বলে ধরে নেই, সাহাবিরা সবাই খাতামুল আমিয়া (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর মুরতাদ হয়ে গেছেন, এ দেদীপ্যমান শরীয়তের ওপর হ্যরত আলী এবং গুটি কতক এমন দুর্বল মানুষ ছাড়া অন্য কেউ

প্রতিষ্ঠিত ছিল না আর এরাও এমন যারা দৈমান থাকা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন রাখা পছন্দ করেছেন আর শক্তির ভয়ে, তুচ্ছ পৃথিবীর লোভে বা ইনস্বার্থ ও জাগতিক ধন-সম্পদকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ‘তাকিয়া’ (প্রাণ রক্ষার খাতিরে সত্য গোপন-অনুবাদক) অবলম্বন করেছেন, অবস্থা যদি এমনই হয় তাহলে এটিকে ইসলামের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ আর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্মের জন্য ভয়াবহ পরীক্ষা বলতে হবে। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রূতির ব্যতিক্রম করবেন আর নিজ সমর্থন প্রদর্শন করবেন না বরং যাদের সর্বোৎকৃষ্ট হবার কথা তাদের সর্বনিকৃষ্ট সাব্যস্ত করেছেন এবং বিশ্বাসযাতকদের চক্রান্তে র মাধ্যমে ধর্মে বিশ্বজ্ঞলা সৃষ্টি করেছেন -তুমি একথা কীভাবে ভাবতে পারলে ?

আমরা পুরো সৃষ্টিকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমরা এমন সব বিশ্বাস পোষণ করা থেকে দায়মুক্ত। আমাদের মতে এটি কুফরী ও ধর্মত্যাগের সূচনা। আর এটি এমন বিশ্বাস যা পুণ্যবানদের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রাখে না। ইসলামের খাতিরে জীবন নিঃশেষ করার পর কি সাহাবিরা কুফরী করেছেন? সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সাহায্যের জন্য তারা নিজেদের সম্পদ ও প্রাণের মাধ্যমে জেহাদ করতে করতে বৃদ্ধ হয়ে গেছেন আর তাদের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। বদঅভ্যাস পরিত্যাগের পর পুনরায় কোথেকে এ নতুন রংগ মনমানসিকতার উন্নেশ্য ঘটলো? ঈমানের ঝার্ণা প্রবাহিত হবার পর এর পানি কিভাবে শুকিয়ে গেল? সুতরাং ধৰ্মস তাদের জন্য যারা বিচার দিবসকে স্মরণ করে না আর সকল অধিপতির সর্বাধিপতিকে ভয় করে না এবং কথায় কথায় পুণ্যবানদের গালি দেয়।

অঙ্গুত বিষয় হলো, শিয়ারাও স্বীকার করে, আবু বকর এমন এমন সময়ে দৈমান এনেছিলেন যখন শক্তির সংখ্যা ছিল অগণিত। তিনি চরম পরীক্ষার যুগে মুস্তাফা (সাঃ)-এর সঙ্গ দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন বের হয়েছেন তাঁর সাথে হযরত আবু বকরও নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে বের হয়েছেন। সব কষ্ট তিনি সহ্য করেছেন আর প্রিয় স্বদেশ ও আন্তরিক বন্ধুদের পরিত্যাগ করেছেন। সব আতীয়-স্বজনদের ছেড়ে দিয়ে তিনি স্নেহশীল প্রভুকে বেছে নিয়েছেন। সব যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন আর মনোনীত নবী (সাঃ)-কে সাহায্য করেছেন। এমন সময় তিনি খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন যখন মুনাফেকদের একটি বড় দল ধর্মত্যাগ করেছিল আর অনেক মিথ্যাবাদী তখন নবুওয়তের দাবী করেছিল। যতক্ষণ দেশে শাস্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসে নি এবং সন্ত্রাসীরা ব্যর্থ হয়নি ততক্ষণ তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন এবং লড়াই অব্যাহত রেখেছেন। এরপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন আর মৃত্যুর পর নবীকুল শিরোমণি ও নিষ্পাপদের ইমাম মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কবরের পাশে সমাহিত হন। আল্লাহর বন্ধু এবং আল্লাহর রসূলের কাছ থেকে জীবদ্ধশায় ও বিচ্ছিন্ন হন নি আর মৃত্যুর পরও পৃথক হন নি বরং অল্প কিছু দিনের বিচ্ছিন্নতার পর আবার উভয়ে মিলিত হয়েছেন এবং বন্ধুর সাথে বন্ধু উপহার বিনিময় করেছেন। একান্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাদের দাবী অনুসারে, আল্লাহ তাঁলা তাঁর নবী খাতামান নবীস্তুন (সাঃ)-কে এবং

কাফের, আত্মসাংকারী ও বিশ্বাসঘাতকদেরকে একই গোরস্থানের অংশীদার করেছেন! তিনি তাঁর নবী ও একান্ত বন্ধুকে এ দু'জনের পার্শ্বে থাকার যাতনা থেকে পরিত্রাণ দিলেন না বরং তাদের দু'জনকে ইহকালে ও পরকালে তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক দু'জন সাথী নিযুক্ত করে দিলেন এবং তাঁকে এ দুই নোংরা ব্যক্তি থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখলেন না! তারা যা বলে আমাদের প্রতিপালক-প্রভু এর অনেক উৎৰে। সত্য কথা হলো, তিনি পরিত্রদের ইমামের সাথে পরিত্রদেরকে মিলিত করেছেন। নিষয় এতে গভীরভাবে দৃষ্টিপাতকারীদের জন্য অনেক নির্দশন রয়েছে।

হে বোধবুদ্ধির অলংকারে সজ্জিত ব্যক্তি! একটু ভেবে দেখ। দৃঢ় বিশ্বাস ছেড়ে সন্দেহের কোলে আশ্রয় খুঁজো না। নিষ্পাপদের ইমামের বিরুদ্ধে ধৃষ্টতা দেখিও না। তুমি জানো, আমাদের নবী (সাঃ)-এর কবর স্বর্গোদ্যনগুলোর মাঝে একটি শ্রেষ্ঠ মন্দনকানন। এটা শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহচেয়ের শিখরে অধিষ্ঠিত এবং এটা ঐশ্বর্য ও সম্মানের সবটুকু ধারা করে আছে। অতএব এর সাথে অগ্নিবাসীদের সম্পর্কই বা কি? তাই চিন্তা কর, আর ক্ষতির পথে পা বাড়িও না। হে বিচক্ষণ ব্যক্তি! রসূলবিলাহুর (সাঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। দু'জন কাফের ও আত্মসাংকারীর মাঝে তাঁর কবরকে গণ্য করো না, হযরত আলী এবং হাসান হোসাইনের জন্য নিজ ঈমানকে নষ্ট করো না। হে মিথ্যার মোহজালে বন্দী! তোমার অতিরিক্তি প্রশংসার কোন প্রয়োজন তাঁদের নেই। তোমার ভাষার ক্ষুরধার তরবারীকে খাপের ভেতর সামলে রাখো আর মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হও। তোমার মন কি কখনও চাইবে আর তোমার হৃদয় কি কখনও পছন্দ করবে, তুমি কাফেরের মাঝে সমাহিত হও এবং তোমার ডানে বামে দু'জন দুর্ভূতকারী কাফের শায়িত থাকুক? হে কাহার খোদার ক্ষেত্রে শিকার! তুমি নিজের জন্য যা ঠিক মনে কর না তা পুণ্যবানদের সর্দার মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্য কেন বৈধ মনে করছো। তুমি কি সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলকে এমন স্থানে পৌছাতে চাও যা তুমি নিজের জন্যও পছন্দ কর না? তুমি কি তাঁর সম্মান-সম্মরের প্রতি আদৌ ঝংক্ষেপ কর না। তোমার শ্রদ্ধাবোধ ও বিবেক-বুদ্ধি গেল কোথায়? নাকি তোমার সন্দেহের জিন্ন একে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে এবং তোমাকে সমোহিত ব্যক্তির ন্যায় ছেড়ে দিয়েছে? তুমি মহান মুত্তাকী আবু বকরের (রাঃ) ওপর আক্রমণ করে আলী মুর্তজার (রাঃ) ওপরও হামলা করেছো। কেননা তুমি আলী (রাঃ)-কে নাউয়ুবিলাহু মুনাফেকসদৃশ প্রতিপন্থ করেছো আর কাফেরদের ঘারে ভিক্ষার জন্য তাঁকে বসিয়েছো যেন তাঁর শুষ্ক ঝর্ণা পুনঃ প্রবাহিত হয় এবং তাঁর বিধ্বন্ত অবস্থা শুধুরে যায়। এতে কোন সন্দেহ নেই, এমন বৈশিষ্ট্য নিষ্ঠাবানদের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। যে মুনাফেকদের বদ অভ্যাস নিয়ে সন্তুষ্ট সে ছাড়ি এমন অভ্যাস অন্য কারো মাঝে থাকতে পারে না।

পক্ষপাতদুষ্ট শিয়াদের যদি প্রশংস করা হয়, অবাধ্য ও বিরোধীদের সাথে সম্পর্ক ছিল করে সাবালকদের মধ্যে কে প্রথম ঈমান এনেছিল? তারা বাধ্য হয়ে এর উত্তর দেবে, আবু বকর। এরপর যদি জিজেস করা হয়, স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিল করে কে

খাতামান নবীস্টিন (সাৎ)-এর সাথে হিজরত করেছে? তারা অবশ্যই এর উভরে বলবে, তিনি আবু বকর। পুনরায় যদি তাদের জিজ্ঞেস করা হয়, আত্মসাক্রান্তিসদৃশ (নাউয়ুবিল্লাহ) হলেও প্রথম খলীফা কে ছিলেন? তাহলে এ উভর ছাড়া তাদের আর গত্যগত নেই, তিনি ছিলেন আবু বকর। পুনরায় তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, বিভিন্ন দেশে প্রচারের উদ্দেশ্যে কে কুরআন সংকলন করেছেন? তারা উভরে বলতে বাধ্য হবে, হ্যরত আবু বকর। তাদেরকে আবার যদি জিজ্ঞেস করা হয়, নিষ্পাপদের নেতা হ্যরত মুহাম্মদ (সাঠ)-এর পাশে কাকে দাফন করা হয়েছে? তারা অবশ্যই এ কথা বলতে বাধ্য, আবু বকর এবং উমর। মহা আশ্চর্যের বিষয়, সব ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে মুনাফেক এবং কাফেরদেরকে! ইসলামের সব কল্যাণ প্রকাশিত হয়েছে এর শক্তিদের হাতে! একজন মু'মিন কি ভাবতে পারে, ইসলামের সূচনা হয়েছে এমন এক কাফেরের মাধ্যমে যে সবচেয়ে নিচ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, আর রসূলদের গর্ব মুহাম্মদ (সাঠ)-এর সাথে সর্বপ্রথম যে হিজরত করেছে সে কাফের ও মুরতাদ ছিল? এভাবে সব শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে একজন কাফের! এমনকি সে পুণ্যবানদের সর্দার মুহাম্মদ (সাঠ) কবরের নৈকট্যও লাভ করেছে আর আলী এথেকে বস্তিত রয়ে গেছেন! আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করলেন না আর তাঁর কোন কাজেও লাগলেন না, যেন তাঁকে তিনি চিনেন্হি নি! না চিনে তিনি ভুল করেছেন আর সঠিক পথ থেকে বিচুত হয়েছেন! -এটি এক ডাহা মিথ্যা কথা।

সত্য কথা হলো, হ্যরত আবুবকর ও উমর (রাঠ) উভয়েই প্রথম সারির সাহবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা অধিকার প্রদানের বিষয়ে কোন ঝটি করেন নি। তাঁরা তাকওয়ার পথকে জীবনের মূলমন্ত্র আর ন্যায়-নীতিকে লক্ষ্য হিসেবে অবলম্বন করেছেন। তাঁরা পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যালোচনা করতেন আর রহস্যের মূল উদ্ঘাটনের ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু থাকতেন। তাঁরা ইহজগতকে কখনও নিজেদের লক্ষ্যস্থল হিসেবে গণ্য করেন নি। তাঁরা নিজেদের জীবনকে খোদার আনুগত্যের জন্য উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। অচেল পরিমাণ কল্যাণ বর্ণন ও বিতরণ এবং বিশ্ব রসূলের ধর্মের সমর্থনের ক্ষেত্রে শায়খাইন (অর্থাৎ আবু বকর ও উমর (রাঠ)-এর মত অন্য কাউকে আমি দেখতে পাইনি। মানবকুল-সূর্য হ্যরত মুহাম্মদ (সাঠ)-এর অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁরা চন্দ্রের তুলনায় বেশি গতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা তাঁর ভালবাসায় বিলীন ছিলেন আর সত্য ও সঠিক পথকে পাবার বাসনায় সব কষ্টকে সুমধুর বিষয় বলে জ্ঞান করতেন। তাঁরা অনন্য ও অদ্বিতীয় নবীর জন্য সব লাঞ্ছনিকে সানন্দে বরণ করেছেন।

কাফের বাহিনী ও সত্যবিরোধী শক্র সেনার মোকাবেলায় তারা সিংহ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এর ফলে এক পর্যায়ে ইসলাম জয়যুক্ত হয়েছে, বিরোধী সেনাদল পরাজিত হয়েছে, শিরীক বা খোদার অংশীবাদিতা দুর্বল হতে হতে নির্মূল হয়ে গেছে এবং মুসলমান ও ইসলামের সূর্য বলমলে হয়ে উঠেছে। বহুমুখী ও প্রশংসনীয় ধর্মসেবা এবং মুসলমানদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের অনুগ্রহ ও অনুকূল্য প্রদর্শনের পাশাপাশি সর্বশ্রেষ্ঠ

মুসলমান মহানবী (সাৎ)-এর সাম্রাজ্য লাভ ছিল তাঁদের জীবনের শুভ পরিসমাপ্তি। এটি আল্লাহর সেই অনুগ্রহ যে সম্পর্কে মুসলিম অনবহিত নন। ফয়ল বা অনুগ্রহ খোদার হাতে, তিনি যাকে চান তা দান করেন। যে পুরো নিষ্ঠার সাথে তাঁর আঁচল আঁকড়ে ধরে, গোটা পৃথিবী তার বিরোধিতা করলেও আল্লাহ তাকে কক্ষনো বিফল মনোরথ হতে দেন না। তাঁর অনুসন্ধানী কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং কঠিন সময়ের সম্মুখীন হয় না। আল্লাহ সত্যবাদীদের কখনো পরিত্যাগ করেন না।

আল্লাহ আকবর! তাঁদের অপ্রকাশিত জীবনের চিত্র এবং তাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা কত মহান! তাঁরা এমন এক সমাধিস্থলে দাফন হয়েছেন যে মূসা (আৎ) ও ইস্মাইল (আৎ)-ও যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁরা উভয়েই সানন্দে সেখানে কবরস্থ হবার বাসনা পোষণ করতেন। কিন্তু এ পদমর্যাদা শুধু চাইলেই পাওয়া যায় না বা চাইলেই দেয়া হয় না বরং তা সমানিত প্রভূর পক্ষ থেকে এক চিরস্থায়ী রহমত। এ রহমত শুধু তাঁদেরই লাভ হয় যাঁদের ওপর থাকে খোদার সুদৃষ্টি এবং যাঁদেরকে অনুগ্রহের চাঁদর আগা-গোড়া আবৃত করে রেখেছে। সুতরাং এ বিবাদের মীমাংসা হয়ে গেছে। অতুত বিষয় হলো, যারা হযরত আলীকে আবু বকরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে তারা এ নিশ্চিত সত্যের দিকে আসে না। এরা আলী মুর্তজার প্রশংসা করতে ব্যগ্র অথচ বড় মুসলিম হযরত আবু বকর সিদ্দীকের পদমর্যাদাকে বিবেচনা করে না। তাই যারা ‘সিদ্দীক’ (রাঃ) কে কাফের আখ্যা দেয় ও অভিসম্পাত করে তাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন কর। অন্যায়কারী অচিরেই বুঝতে পারবে, সে কোনুন দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ‘সিদ্দীক’ এবং ‘ফারুক’ এমন কাফেলার আমীর ছিলেন যাঁরা খোদার জন্য অনেক উচ্চশৃঙ্খল জয় করেছেন। তাঁরা জনপদের ও মরণ অধিষ্ঠলের সব মানুষকে সত্যের দিকে ডেকেছেন, এক পর্যায়ে তাঁদের তবলীগের ফলে ইসলাম দূর-দূরান্তের দেশসমূহে পৌছে গেছে। তাঁদের খিলাফতকাল ইসলামের ঐশ্বর্য ফল-ফলাদিতে পরিপূর্ণ ছিল এবং তা বহুমুখী সফলতার সর্বব্যাপী সৌরভে ছিল সুরভিত। হযরত সিদ্দীকের যুগে ইসলাম প্রথমে বিভিন্ন ধরনের অগ্রিম প্রদাহে বেদনা-বিহুল ছিল। এর সৈন্যদলের ওপর আগ্রাসীবাহিনী আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, তারা যখন লুটতরাজের শিকার হচ্ছিল বাঁচাও-বাঁচাও বলে আর্তনাদ করতে থাকে। মহা প্রতাপশালী খোদা তখন একে আবু বকরের নিষ্ঠা দ্বারা সাহায্য করেন আর তিনি তার হারানো সম্পদকে গভীর কুপ থেকে উদ্ধার করেন এবং মারাত্মক দুর্ভিক্ষ ও শোচনীয় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পর তা সুস্থ অবস্থার দিকে ফিরে আসে। সুতরাং সুবিচারের দাবী হলো, আমাদের এ সাহায্যকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া আর শক্তির প্রতি ভ্রক্ষেপ না করা। সুতরাং এমন ব্যক্তির কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে সাবধান হওয়া উচিত, যিনি তোমার নেতা ও খোদার মনোনীত রসূলকে সাহায্য করেছেন। যিনি তোমার ধর্ম ও তোমার গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমার সফলতা কামনা করেছেন এবং তোমার কাছে বিন্দুমাত্র সুবিধা চান নি। আশৰ্য! হযরত ‘সিদ্দীকে আকবরের’ সুউচ্চ মর্যাদাকে কীভাবে অস্বীকার করা যেতে

পারে? তাঁর চরিত্র যে সূর্যের মত সমুজ্জ্বল! এতে কোন সন্দেহ নেই, সব মু'মিন তাঁর রোপিত বৃক্ষের ফল থাচ্ছে এবং তাঁর শেখানো জ্ঞান থেকে কল্যাণমণ্ডিত হচ্ছে। আমাদেরকে ধর্মের জন্য তিনি ফুরকান দিয়েছেন আর আমাদের ইহজাগতিক কল্যাণের জন্য তিনি শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করেছেন। যে তাঁকে অস্থীকার করে সে মিথ্যা বলে। সে আগনে জুলবে আর শয়তানের সাথে মিলিত হবে। যাদের সামনে তাঁর পদমর্যাদা অস্পষ্ট তারা জেনে-শুনে ভুল করে। তারা গভীর নদীকে ডোবা জ্ঞান করে, ক্রোধের আগনে জুলে আর এমন এক ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করে যিনি একজন মহা সম্মানিত মানুষ।

হযরত সিদ্দীকের ব্যক্তিত্বে আশা, ভয়-ভীতি, উদ্দীপনা, স্নেহ ও ভালবাসার সমাহার ঘটেছে। স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা ও আদর্শ স্থাপন, মহামহিমাষিত খোদার প্রতি সদাবিনীত, অবাধ্য প্রকৃতি ও এর আকর্ষণ থেকে বিমুক্ত, কুপ্রবৃত্তির সাথে সম্পর্কহৃদে - এই ছিল তাঁর প্রকৃতির মূল বৈশিষ্ট্য আর একই সাথে তিনি ছিলেন খোদানুরক্তদের অঙ্গৰুক্ত। তাঁর মাধ্যমে শুধু সৎশোধনই হয়েছে আর তাঁর হাত দিয়ে মু'মিনদের ভাগ্যে শুধু সফলতাই জুটেছে। কষ্ট দেয়া ও ক্ষতিসাধনের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং তুমি অভ্যন্তরীণ দুর্দ ও বিবাদকে বেশি গুরুত্ব দিও না বরং এটিকে ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখ। তুমি চিন্তা করে দেখ, যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী নিজের সন্তান-সন্ততিকে বা কোন উত্তরাধিকারীকে সম্পদশালী করার কথা ভাবেন নি বরং এ পৃথিবীতে জীবনের নৃন্যতম চাহিদা পূরণের জন্য যা প্রয়োজন তা ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই ছিল না, সে ব্যক্তি রসূলের বৎশের প্রতি অবিচার করবেন একথা তুমি কীভাবে ভাবতে পারো? আল্লাহ তাঁ'লা নিয়তের স্বচ্ছতার কারণে তাদের সবার ওপর তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তাঁকে সাহায্যপ্রাপ্তদের অঙ্গৰুক্ত করেছেন।

কোন কোন অজ্ঞতার অনুসারী যেভাবে দাবী করে থাকে বিষয়টি তেমন নয়। সব বিবাদ কিন্তু নিয়তের ঝটির কারণে হয় না। প্রায়শই বিবাদ-বিত্তনা ইজতেহাদ বা ব্যাখ্যার পার্থক্যের কারণে হয়ে থাকে। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের কিছু সাহাবীর মধ্যে যে বিরোধ হয়েছে সে সম্পর্কে আমাদের একথা বলা সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত এবং সঠিক হবে, বিবাদের কারণ ছিল ইজতিহাদ (বা ব্যাখ্যা)-গত, অন্যায় বা পাপের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। মুজতাহেদগণ (অর্থাৎ ব্যাখ্যাকারীরা) ভুল করলেও তা মার্জনীয়। পুণ্যবানদের বিবাদের মধ্যে বরং বড় বড় মুস্তাকী ও সূফীদের বিত্তনাতে অনেক সময় হিংসা ও বিদ্রোহ অনুপ্রবেশ করে। এর পিছনে খোদা তাঁ'লার কোন বিশেষ প্রজ্ঞা থেকে থাকে।

সুতরাং তাদের মধ্যে যা ঘটেছে বা তাদের মুখ থেকে যা নিঃসৃত হয়েছে তা বলাবলি না করে বরং তেকে রাখা উচিত। তাদের বিষয়টি সেই আল্লাহর হাতে সোপন্দ করা উচিত যিনি পুণ্যবানদের বস্তু। তাঁর রীতি হচ্ছে, তিনি পুণ্যবানদের মধ্যে এমনভাবে মীমাংসা করে থাকেন যেভাবে দুর্কৃতকারীদের বিবাদ মীমাংসা করা হয় না।

সুতরাং তারা সবাই তাঁর বক্স ছিলেন এবং তাদের সবাই তাঁর কাছে প্রিয়ভাজন ও গ্রহণীয় ছিলেন। সে কারণে আমাদের প্রভু, যিনি সবচেয়ে সত্যভাষী, তাদের ঝগড়ার মূল বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করতে গিয়ে বলেন :

وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍ إِنْحُوَ أَنَا عَلَىٰ سُرُورٍ مُّتَقَابِلِينَ ۝

(সূরা হিজর: আয়াত-৪৮)

(অনুবাদ : আর আমরা তাদের অস্তরের বিদ্যে সব বের করে দিব। তারা ভাই ভাই হয়ে একে অপরের সম্মুখে আসন্নে বসে থাকবে।)

এটিই সঠিক নীতি এবং সুস্পষ্ট সত্য। কিন্তু সাধারণ মানুষ একটা বিষয়কে চক্ষুশানদের মত খতিয়ে দেখে না বরং তারা শোনা কথা চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করে। এরপর তাদের একজন বর্ণিত মূল কথার সাথে নিজের পক্ষ থেকে অনেক কিছু যোগ করে। অন্য এক ব্যক্তি তাকে সানন্দে গ্রহণ করে এবং পুনরায় নিজের পক্ষ থেকে এতে আরও কিছু যোগ করে। আবার তৃতীয় ব্যক্তি একান্ত আগ্রহভরা হৃদয়ে এটা শুনে, এর প্রতি দ্রোমান আনে এবং এর সাথে আরও টীকা পাদটীকা যোগ করে আর এধারা এভাবে অব্যাহত থাকে। ফলে প্রথম সত্যটি ঢাকা পড়ে যায় এবং একটি নুতন কথা সামনে আসে যা প্রকৃত, সমুজ্জ্বল সত্যের বিরোধী। এভাবে মানুষ বর্ণনাকারীদের দুর্নীতির কারণে ধ্বন্দ্ব হয়েছে। এভাবে কত সত্য যে পর্দার আড়ালে চাপা দেয়া হয়েছে, কত ঘটনা যে পর্দাবৃত্ত রয়ে গেছে আর কত কাহিনী যে বদলে দেয়া হয়েছে! বহু সংবাদ আছে যা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের শিকার হয়েছে। বহু মনগড়া মিথ্যা কাহিনী বানানো হয়েছে। অনেক বিষয় আছে যাতে সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছে। কেউ জানে না প্রথম ঘটনা কি ছিল আর পরে তা কী হয়ে গেছে বা সেটাকে কী বানানো হয়েছে। প্রথম যুগের সাহাবী ও আহলে বায়ত এবং মহানবী (সাঃ)-এর নিকটাতীয়দের পুনর্জীবিত করে তাঁদের সামনে যদি এসব কাহিনী উপস্থাপন করা হয় তাহলে, মানুষের মিথ্যা রচনা, খাল্লাসের কুম্ভনাগার অধীনে প্রলম্বিত বিবাদ, বিন্দুকে সিঙ্গুতে ঝুপাঞ্চর, পচা হাড়-গোড়ের চূর্ণকে পাহাড় সদৃশ করে দেখানো আর তাদের মিথ্যা বেসাতীর মাধ্যমে উদাসীন মানুষকে প্রতারিত করার দৃশ্য দেখে তাঁরা নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবেন এবং ‘লা হাওল’ এবং ‘ইন্না লিন্নাহ’ পড়বেন।

সত্য কথা হলো, মধ্য যুগে অরাজকতা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল এবং প্রবল ঝঁঝঁবায়ু ও সর্বগ্রাসী প্রচল শৈত্যপ্রবাহের ন্যায় এটা আত্মপ্রকাশ করেছিল। এসময় মিথ্যা রঁটনাকারীর বহু গুজবকে সত্যবাদীদের সংবাদ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং বুদ্ধিমান হও আর তাড়াভড়ো করো না। যে অনুগ্রহে আল্লাহ্ আমাদেরকে ভূষিত করেছেন এর এক ভগ্নাংশও যদি তোমাকে দেয়া হতো তাহলে তুমি আমার কথা গ্রহণ করতে আর প্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে না। এখন আমি জানি না তুমি তা গ্রহণ করবে নাকি প্রত্যাখ্যান করবে। শায়খাইন (অর্থাৎ আবু বকর ও উমর)-এর বিরোধিতা

যাদের আত্মার মূল বৈশিষ্ট্য, যাদের স্বভাবের অংশ এবং স্বভাবগত অভ্যাস তারা কখনো আমাদের কথাকে গ্রহণ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সিদ্ধান্ত এসে না যায়। আর তারা সহস্র সহস্র দিব্যদর্শন পূর্ণ হলেও এর সত্যায়ন করবে না। সুতৰাং তাদের সে যুগের জন্য অপেক্ষা করা উচিত যা বিশ্ববাসীর বক্ষের অভ্যন্তরীণ চিত্ত উম্মোচন করবে।

হে মানবমন্ত্রী! তোমরা সাহাবিদের সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করো না। সন্দেহের জঙ্গলে হারিয়ে গিয়ে নিজেদের ধৰ্মস করো না। তাঁরা এমন এক শ্রেণীর মানুষ ছিলেন যারা অতীত হয়ে গেছেন। তোমরা এমন সত্যকে জানো না যা সুদূর অতীতের গহ্বরে হারিয়ে গেছে এবং দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। তাঁদের মাঝে কি ঘটেছিল এবং আল্লাহ কর্তৃক তাদের দৃষ্টিকে আলোকিত করার পর তা কিভাবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল তা তোমরা জানো না। অতএব যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই ভূমি তার অনুসরণ করো না। খোদার তাকওয়া অবলম্বন কর যদি তাঁর ভয় থেকে থাকে। নিশ্চয় সাহাবিরা এবং ‘আহলে বায়ত’ এমন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গ যাঁরা অন্য সব কিছুর সাথে সম্পর্ক ছিল করে সম্পূর্ণভাবে খোদার দিকে বিনত হয়েছিলেন। তাঁরা জগতের হীন স্বার্থে বাগড়া করতেন এবং পরম্পরারের বিরঞ্জে নিজেদের মনে বিদ্বেষ পোষণ করতেন আর এসব বিষয় পারস্পরিক কলহ-বিবাদ, অশান্তি ও প্রকাশ্য শক্রতা পর্যন্ত গড়াতো- এমন কথা আমি কখনো গ্রহণ করবো না!

যদি ধরেও নেই, হ্যরত সিদ্দীক এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা দুনিয়া এবং এর আকর্ষণকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং আত্মসাংকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; তাহলে আমাদেরকে বাধ্য হয়ে একথাও স্বীকার করতে হবে, খোদার সিংহ হ্যরত আলীও মুনাফেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমরা তাঁকে যেমন খোদানুরাগীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি প্রকৃতপক্ষে তিনি তেমন ছিলেন না, বরং তিনিও দুনিয়ার পিছনে ছুটেলেন, এর মোহে আচ্ছন্ন ছিলেন এবং এর চাকচিক্যের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ ছিল। সে কারণেই কাফের ও মুরতাদদের সাথে তিনি সম্পর্ক ছিল করেন নি বরং চাটুকার হিসেবে তাদের সাথে যোগ দিয়েছেন। প্রায় ত্রিশ বছর তিনি ‘তাকিয়া’র (স্টেমান গোপন করার) আশ্রয়ে ছিলেন। প্রশ্ন হলো, আলী মুর্তজার চোখে যখন হ্যরত সিদ্দীক (রাঃ) কাফের ও আত্মসাংকারীই ছিলেন তখন কেন তিনি তাঁর হাতে বয়াত করলেন? তিনি অন্যায় ও অশান্তি-ভরা ধর্মহীন দেশ ত্যাগ করে অন্য কোন দেশে হিজরত করলেন না কেন? আল্লাহর ভূমি কি বিস্তৃত ছিল না? মুসাকীদের রীতি অনুসারে তিনি হিজরত করতে পারতেন। বিশ্বে ইব্রাহীমের প্রতি লক্ষ্য করে দেখ। সত্য সাক্ষ দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি কত দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন! তিনি যখন দেখলেন, তাঁর পিতা পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত এবং জাতি সুমহান প্রভুকে পরিত্যাগ করে প্রতিমা-পূজায় মগ্ন, তখন তিনি তাদের নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে মিলেন। তিনি মোটেও ভয় ও অঙ্গেপ করেন নি। আগুনে নিষ্কিপ্ত হয়েছেন, দুঃকৃতিকারীদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন কিন্তু তাদের ভয়ে ‘তাকিয়া’ অবলম্বন করেন নি। এটিই পুণ্যবানদের আদর্শ। তাঁরা তরবারী বা বর্ণাকে ভয় করেন না। তাঁরা

'তাকিয়া'কে সবচেয়ে বড় পাপ, অশ্লীল কাজ ও অন্যায় বলে মনে করেন। এমন হীন কাজ যদি বিন্দুমাত্রও তাদের মাধ্যমে সাধিত হয় তাঁরা তৎক্ষণাত্মক ক্ষমার প্রত্যাশায় আল্লাহর দিকে ক্ষমা চেয়ে বিনত হন।

হ্যরত আলী (রাঃ)-এর কাজকর্মে আমরা বিস্মিত হই! তিনি কীভাবে হ্যরত আবু বকর ও হ্যরত উমরের হাতে বয়াত করলেন অর্থ তিনি জানতেন, তাঁরা কুফরী করেছেন এবং অধিকার খর্ব করেছেন? তাঁদের অপকর্ম, বিশ্বাসঘাতকতা ও ধর্মত্যাগ সম্পর্কে অবিহিত থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের মাঝে দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছেন, নিষ্ঠা ও ভালবাসার সাথে তাঁদের আনুগত্য করেছেন, কোন ক্লান্তি ও দুর্বলতা দেখান নি, ঘৃণা প্রদর্শন করেন নি, তাঁর উদ্দীপনায়ও তাটা পড়ে নি এবং তাঁর খোদাভাতিও তাঁকে একাজ থেকে বিরত রাখে নি! তাঁর এবং আরব জাতির মাঝে মেলা-মেশার দ্বার রূদ্ধ ছিল না, কোন অঙ্গরায়ও ছিল না আর তিনি কারারূদ্ধও ছিলেন না। তাঁর জন্য আরবের পূর্ব বা পশ্চিমের কোন অঞ্চলে হিজরত করে মানুষকে যুদ্ধের জন্য উদ্ধৃত করা, মরুবাসীদেরকে যুদ্ধের জন্য ক্ষেপিয়ে তোলা এবং জোরালো বক্তৃতার মাধ্যমে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে মুরতাদ জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আবশ্যিক ছিল।

মুসাইলামা কায্যাবের সাথে প্রায় এক লক্ষ মরুবাসী মিলিত হয়েছিল, অর্থ এ অভিমানে সাহায্য করার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হ্যরত আলীর ছিল এবং এ অভিযান পরিচালনার জন্য তিনি সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। প্রশ্ন হলো, তিনি কেন কাফেরদের অনুসরণ করলেন? কেন তাঁদের সাথে বস্তুত্ব করলেন? অলসদের মত তিনি কেন বসেছিলেন? কেন মুজাহিদের চেতনা নিয়ে দাঁড়ালেন না? সম্মান, যশ ও খ্যাতি অর্জনের পরিকার সুযোগ সত্ত্বেও কে তাঁকে অভিযানে বের হতে বারণ করেছিল? তিনি কেন লড়াই ও যুদ্ধের জন্য, সত্যের সমর্থন এবং মানুষকে ডাকার জন্য উদ্যত হলেন না? উপদেশবাণী ও কথার মাধ্যমে যারা প্রাণ সঞ্চার করতে পারে তাঁদের মধ্যে তিনি কি সবচেয়ে বাগ্ধী ও সুবজ্ঞ ছিলেন না? বাগ্ধীতা, কথা বলার দক্ষতা ও শ্রোতাদেরকে আকর্ষণ করার গুণে, মানুষকে একত্র করা তাঁর জন্য মুহূর্তের ব্যাপার ছিল মাত্র বরং এরচেয়েও কম সময়ের বিষয় ছিল। মানুষ যখন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের সমর্থনে একত্র হচ্ছিল তখন সর্বশক্তিমান খোদার সাহায্যপ্রাণ এবং বিশ্বপ্রতিপালকের প্রিয়ভাজন 'আল্লাহর সিংহ' কোথায় ছিলেন?

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা আর সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হলো, তিনি শুধু বয়াত করেই ক্ষান্ত হন নি বরং হ্যরত আবু বকর ও উমর (রাঃ)-এর পিছনে সব নামাযও পড়েছেন। এক বেলাও পিছিয়ে ছিলেন না। আর আপত্তিকারীরা যেমন এড়িয়ে চলে সেভাবে তিনি এড়িয়েও চলেন নি। তিনি তাঁদের পরামর্শ সভায় বসেছেন, তাঁদের দাবীকে সত্যায়ন করেছেন, সব বিষয়ে তাঁদেরকে সাহায্য করার জন্য পুরো শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োজিত করেছেন আর কখনও পিছিয়ে থাকেন নি। বল, এসব কি নির্যাতিত কাফের আখ্যাদানকারীদের লক্ষণ? দেখ! তিনি তাঁদের মিথ্যা-বলা ও প্রতারণা সম্পর্কে জেনেও

তাদের এমনভাবে অনুসরণ করলেন, যেন তাঁর দৃষ্টিতে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই! তিনি কি জানতেন না, যারা সর্বশক্তিমান খোদার ওপর নির্ভর করেন তাঁরা ঘৃণাভরেও কখনও চাঁচুকারিতা অবলম্বন করেন না? সত্য ও ন্যায় অবলম্বন যদি তাঁদেরকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে, ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় বা টুকরো-টুকরোও করে ফেলে তবুও তাঁরা সত্যকে পরিত্যাগ করেন না?

সত্য অবলম্বন করা আওলিয়াদের বৈশিষ্ট্য ও সূফী-সাধকদের বিশেষত্ব। কিন্তু মুর্তজা এ রীতি পরিত্যাগ করেছেন এবং নিজের জন্য ‘তাকিয়া’ উদ্ভাবনপূর্বক এক নীচ ও লাঞ্ছনিকায়ক রীতি অনুসরণ করেছেন! তিনি সকাল-সন্ধ্যা ‘কাফেরদের’ আঙিনায় বসতেন, চাঁচুকারিতার ছলে তাঁদের প্রশংসা করতেন! কেন তিনি জিন্ন ও মানব সম্প্রদায়ের নবী (সাঃ)-এর অনুগত্য করেন নি বা কেন হ্যরত হোসাইনের মত বীরত্ব প্রদর্শন না করে প্রতারকদের পথ অবলম্বন করলেন? আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজেস করছি, যাঁদের হৃদয় ভীরুত্ব ও চাঁচুকারিতামুক্ত, যাঁদের বিশ্বাস তাঁদের অন্তরাআকে শক্তি যুগিয়ে থাকে, যাঁরা কপটতা ও চাঁচুকারিতা বিমুখ আর স্বীয় প্রভুকে ভয় করেন এবং যাঁরা অন্য সব ভয়ের উর্দ্ধে- এটিই কি তাঁদের রীতি? কক্ষনো নয়, বরং এমন বৈশিষ্ট্য কেবল সেসব লোকের মধ্যেই দেখা যায় যারা মহা সম্মানিত আল্লাহর ওপর কুপ্রবৃত্তিকে আর পরকালের ওপর ইহজগতকে প্রাধান্য দেয়, যারা সত্যিকার অর্থে খোদাকে মূল্যায়ন করে না, তাঁর পূর্ণ চন্দ্রের আলোতে আলোকিত হবার চেষ্টা করে না এবং যারা নিষ্ঠাহীন। আমি অসাধারণ এবং সাধারণ তথ্য সব ধরনের মানুষের মধ্যে জীবনযাপন করেছি, সব শ্রেণীর মানুষকে দেখেছি: কিন্তু আমি ‘তাকিয়া’ এবং সত্যকে গোপন করার অভ্যাস যারা মহাসম্মানিত আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয় না তাদের ছাড়া অন্য কারো মাঝে দেখি নি। আল্লাহর কসম! আমাকে ছুরি দিয়ে কেটে ফেললেও এক পলকের জন্যও আমার প্রকৃতি ধৰ্ম বিষয়ে চাঁচুকারিতাকে গ্রহণ করবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শনপূর্বক যাকে হেদায়াত দিয়েছেন আর যাকে গভীর আন্তরিকতা প্রদান করেছেন সে কপট এবং মুনাফেকদের রীতি-নীতিকে কখনও পছন্দ করবে না। তুমি কি সেসব লোকদের ঘটনা পড় নি যারা চাঁচুকারিতাপূর্ণ জীবনের ওপর মৃত্যুকে প্রাধান্য দিয়েছেন, এক মৃত্যুর্তের জন্যও ‘তাকিয়া’র ভরসায় জীবিত থাকা পছন্দ করেন নি। তাঁরা বলেন :

رَبِّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبَرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ۝

“রাববানা আফরিগ আল্লাইনা সাবরাওঁ ওয়া তাওয়াফ্ফানা মুসলিমীন” (অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ধৈর্য ও দৃঢ়তা দান কর এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী হিসেবে মৃত্যু দিও)।

তাই শিয়াদের জন্য আক্ষেপ! তারা সবচেয়ে বড় মুস্তাকী হ্যরত আবু বকরের প্রতি ঘৃণার কারণে হ্যরত আলীকে দোষারোপ করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। অন্ধ বিদ্বেষের

কারণে তাদের কান্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে। আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ থাকা সত্ত্বেও জেনে-শুনে তারা অন্ধ সাজে। তারা এমন ব্যক্তির ন্যায় চিন্তা করতে জানে না যার সমালোচনা গঠনমূলক। আমি তাদের কথাবার্তাকে সন্দেহের স্পৃষ্ট আর তাদের উক্তিকে অদৃশ্য সম্পর্কে নিষ্কর্ষ অনুমান মনে করি। গবেষকের কোন বৈশিষ্ট্যই তাদের মাঝে নেই।

হে পাঠক! তুমি যদি সত্য ও সঠিক কথাকে ভালবেসে থাকো তাহলে সত্যভিত্তিক প্রতিমেধক অর্জন ও প্রাণহারী বিষ প্রতিহত করার নিমিত্তে ‘আয়াতে ইস্তেখলাফ’ই তোমার জন্য যথেষ্ট। কেননা এতে ন্যায়পরায়ণ লোকদের জন্য জোরালো প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং পুণ্যবানদেরকে দুষ্কৃতকারীদের ন্যায় মনে করবে না আর হৃদ নবীকে আদ জাতির সাথে তুলনা করবে না। কিছুটা গবেষকদের ন্যায় চিন্তা করতে শেখো। তুমি জানো, সত্যের অনুসারী ও অন্যায়কারীদের মাঝে বিবাদ মীমাংসার জন্য গ্রেশী ভবিষ্যদ্বাণী বিচারকের ন্যায় কাজ করে যা বিদ্রোহ দমন ও অত্যাচারের মূলোৎপাটনের ক্ষেত্রে আল্লাহর সেনাদলসদৃশ হয়ে থাকে, যা নিজ আক্রমণের মাধ্যমে সমস্যার জটিলতাকে দূরীভূত করে, ফলে যা সংকীর্ণ তাকে বিস্তীর্ণ মনে হয়। এ ভবিষ্যত-সংবাদ প্রত্যেক তীরন্দাজের বিরুদ্ধে বিষয়কু বর্ণ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নামে আর এক পর্যায়ে প্রত্যেক সন্দেহকারীকে বিশ্বাসের পথে পরিচালিত করে এবং আপত্তিকারীর আপত্তি খনন করে। আয়াতে ইস্তেখলাফের এটিই স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। অতএব এটি প্রত্যেক আক্রমণকারীকে প্রতিহত করে, ফলে সে আক্রমণাত্মক অবস্থান পরিত্যাগ করে এবং ময়দান ছেড়ে পালায়। আর শক্র না চাইলেও এ আয়াত শক্রের সামনে সত্যকে স্পষ্ট করে দেয়। অত্যাচারী ও অনাচারী শক্রের সৃষ্টি ভয়ভীতিপূর্ণ যুগাবসানের পর এ আয়াত মানুষকে শাস্তিপূর্ণ ও নিরাপদ যুগের শুভসংবাদ দেয়। অনুসন্ধানীদের একথা অজানা নয়, হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফত ছাড়া অন্য কারণে ক্ষেত্রে এর প্রকৃত বাস্তবায়ন সাব্যস্ত হয় না। হ্যরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফত এমন উন্নতি, উৎকর্ষ আর সফলতায় ভাস্বর ছিল না, বরং তাঁর খিলাফতের শক্রপক্ষ খিলাফতের অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং তাঁর প্রভাব ও প্রতাপকে অব্যাহতভাবে ভোংতা করতে থাকে। তাঁরা তাকে গভীর গহ্বরে নিষ্কেপ করে এবং ভাইকে ভাইয়ের অধিকার প্রদান করা ভুলে যায় আর এক পর্যায়ে মাকড়সার জাল থেকেও তাঁকে অধিক দুর্বল করে তুলে এবং সেই গৃহের অধিবাসীদের বিস্মিত ও হতভয় করে দেয়।

হ্যরত আলী যে বুভুকদের ভরসাস্থল, দয়াশীলদের জন্য আদর্শ, মানুষের জন্য খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ, যুগের শ্রেষ্ঠ মানব এবং দেশকে আলোকিত করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর এক জ্যোতি ছিলেন -এতে কোন সন্দেহ নেই। কিষ্ণ তাঁর খিলাফতকাল শাস্তি ও শৃঙ্খলার যুগ ছিল না বরং অশাস্তি ও অন্যায়ে জর্জরিত ছিল। মানুষ তাঁর এবং আবু সুফিয়ানের পুত্রের খিলাফত নিয়ে বিভাষ্য লিঙ্গ ছিল। তারা হতভয় ব্যক্তির ন্যায় এক বুক আশা নিয়ে তাদের উভয়ের পানে চেয়ে থাকতো। অনেকেই তাদেরকে ইসলামের আকাশের দুটো উজ্জল নক্ষত্র এবং একই পাত্রে রাখা দুটো মূল্যবান রত্ন আখ্যা-

দিলো । সত্যি কথা হলো, সত্য আলী মুর্তজার পক্ষে ছিল । যে তাঁর যুগে তাঁর বিরক্তিকে যুদ্ধ করেছে সে নির্মাত বিদ্রোহ ও সীমালঞ্চন করেছে । তবে তাঁর খিলাফতকালে সেই শান্তি দেখা যায় না যার শুভ সংবাদ রহমান খোদার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে । সত্যি কথা হলো, হ্যরত আলী মুর্তজাকে সাধীদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং তাঁর খিলাফতকাল বিভিন্ন প্রকারের নেরাজ্য ও অশান্তিতে নিমজ্জিত ছিল । তাঁর প্রতি আল্লাহ তাল্লার মহান অনুগ্রহ ছিল, কিন্তু তিনি দুঃখভারাক্রান্ত ও বেদনাপূর্ণ জীবন কাটিয়েছেন । প্রথম খলীফাদের মত তিনি ধর্মপ্রচার ও শর্যাতানকে দমনে ততটা সফলতা লাভ করেন নি বরং তিনি নিজেই মানুষের তীর্যক আক্রমণের শিকার ছিলেন । তাঁকে তাঁর সব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা থেকে বক্ষিত রাখা হয়েছে । তারা তাঁকে সহযোগিতা না করে তাঁর বিরক্তি অত্যাচার ও নিষ্পেষণে উঠে পড়ে লেগে যায় । তারা কষ্ট দেয়া থেকে বিরত হয় নি বরং তাঁর কাজে বাঁধ সেধেছে আর তাঁর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, অথচ তিনি মূর্ত্যমান ধৈর্য ও পরম পুণ্যবান লোকদের অসর্বুক্ত ছিলেন । সুতরাং আমরা তাঁর খিলাফতকে এ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাপ্রাপ্তির স্থল বলতে পারি না । কেননা তাঁর খিলাফতকাল ছিল অশান্ত, বিদ্রোহপূর্ণ ও কষ্টদায়ক যুগ । সে যুগে শান্তি ছিল না বরং শান্তির স্থলে ভয়ঙ্গিতি দেখা দেয় এবং অরাজকতা আরম্ভ হয়, সমস্যার পর সমস্যা মাথাচাড়া দেয় বরং ইসলাম ধর্মে বহু বিপত্তি নেমে আসে আর সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের উম্মতে প্রবল মতভেদ সৃষ্টি হয় । নেরাজ্যের বহু দ্বার খুলে যায় আর ঘৃণা ও বিদ্বেষের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে । প্রতিদিন নতুন নতুন দলের পক্ষ থেকে বিতভা দেখা দেয় । যুগের অশান্তি অনেক বেড়ে যায়, শান্তির পাথী নীড় ছেড়ে উড়ে যায়, বিশ্বজ্ঞান চরমে পৌঁছায়, নেরাজ্য ফুঁসে ওঠে এবং এক পর্যায়ে নির্যাতিতদের শিরোমণি হ্যরত হোসাইনকে প্রাণ হারাতে হয় ।

যে মনে করে, খিলাফত প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি আধ্যাত্মিক বিষয়, আর সূচনা থেকেই এটি আলী মুর্তজার প্রাপ্য ছিল কিন্তু তিনি অত্যাচারী জাতির সাথে এ বিষয়ে ঝগড়া করা পছন্দ করতেন না আর এক্ষত্রে লজ্জা বোধ করতেন- তার জেনে রাখা উচিত, এটি একটি কৃৎসিত অজুহাত আর এমন একটি কথা যা নির্লজ্জ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না । যে সত্য গৃহীত হওয়া উচিত আর যে সত্যকথা স্থীরূপ হওয়া উচিত তা হলো, খিলাফতের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর সপক্ষেই পূর্ণ হয়েছে যিনি নিজে এ সব গুণের সমাহার ছিলেন । তিনি যে মুসলমানদের জন্য নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার অনেক পথ উম্মোচন করেছেন এবং তাদেরকে নেরাজ্য ও কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছেন -এটি এক প্রমাণিত সত্য । তিনি ইসলাম বিরোধী সব ধারালো দাঁতকে ভেঁতা করে দিয়েছেন । ইসলামের নিরাপত্তার লক্ষ্যে তিনি সেই ব্যক্তির ন্যায় আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন, যে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে বিদ্যুমাত্র কুঠাবোধ করে না । তিনি ক্লান্ত হন নি আর দুর্বলতাও দেখান নি, বরং সব বক্রতা সমান করে দিয়েছেন । হারিয়ে যাওয়া নিরাপত্তা এবং বিলুপ্ত সম্মানকে আল্লাহ তাঁর হাতে পুনর্বহাল করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমে ভয়ের পর মানুষ নিরাপত্তা ফিরে পেয়েছে । ভবিষ্যদ্বাণীকে আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ হতে দেখেও

এর অন্য অর্থ করা অন্যায় ও অবাধ্যতার নামাত্তর। কেননা এর পূর্ণতা হস্তয়কে প্রশান্ত করে, বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে এবং এতে কঠিন পাথরও নরম হয়ে যায়।

মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হলো, সে চোখে দেখা বিষয়কে অন্য সব কথার ওপর প্রাধান্য দেয়। আর এটিই তত্ত্বজ্ঞানীদের মানদণ্ড। একটু চিন্তা করে দেখ, কে সেই ব্যক্তি যিনি ইসলামের ক্ষেত্রকে দূর করে এর সৌন্দর্য পূর্ণবর্হাল করেছেন, কে এর দুর্দশা দূর করেছেন, কে দুষ্কৃতকারীদের ধৰ্মস এবং ধর্মত্যাগীদের নির্মূল করেছেন? কে হারিয়ে যাওয়া সব মানুষকে আপ্নাহার ধর্মের দিকে ডেকে এনে এমন আলোর মাধ্যমে তাদেরকে সত্য দেখিয়েছেন যার ফলশ্রুতিস্বরূপ মসজিদ প্রত্যাগত মানুষের ঢলে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে? কে বিশ্বপ্রতিপালকের ইচ্ছায় প্রথিবীকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন, মানুষের জীবনকে তার সব ঘামসহ এবং বিদ্রোহের কলুষকে তার যাবতীয় অহংকারসহ পরিত্র পানি দিয়ে কে ধূয়ে মুছে পরিষ্কার ও দূরীভূত করেছেন?

আবু বকর সিদ্দীকের প্রতি আপ্নাহ রহমত বর্ষণ করুন। তিনি ইসলামকে জীবিত করেছেন এবং যিনিদিকদের (অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্বারাই মুরতাদদের) হত্যা করেছেন। তাঁর কল্যাণধারা কিয়ামত পর্যন্ত বহুমান থাকবে। তিনি অতি কোমল হস্তয়ের অধিকারী এবং একান্ত খোদানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। প্রভুর সম্মুখে আকৃতি-মিনতি, দোয়া করা, তাঁর সম্মুখে ভুলুষ্টিত হওয়া ও ক্রন্দন এবং তাঁর দ্বারে অনুরাগের সাথে বিনত থাকা ও তাঁর আঁচলকে আঁকড়ে ধরে রাখা তাঁর অভ্যাস ছিল। তিনি দোয়া ও সিজদায় সব শক্তি নিয়োজিত করতেন এবং তেলাওয়াতের সময় কাঁদতেন। তিনি যে ইসলাম এবং রসূলদের গর্ব ছিলেন -এতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর প্রকৃতির মূল বৈশিষ্ট্য অনেকটা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মহানবী (সা):-এর গুণাবলীর মতই ছিল। নবুওয়তের আধ্যাত্মিক সৌরভকে বরণ ও ধারণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রথম সারির লোকদের অন্যতম। তিনিই এমন লোকদের মধ্যে প্রথম মানব যাঁরা এক মহান একত্রিকারীর হাতে সৃষ্টি কিয়ামতসদৃশ আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন আর নিজেদের মলিন চাঁদরকে পৃত-পরিত্র আচ্ছাদনে পরিবর্তন করেছেন। অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তিনি নবীদের সাথে সাদৃশ্য রাখতেন।

আমরা কুরআনে একমাত্র তাঁর সুনিশ্চিত উল্লেখ ছাড়া অন্যদের উল্লেখের কথা শুধু ধারণা করতে পারি। ধারণা বা অনুমান নিশ্চিত সত্যের তুলনায় কিছুই নয় আর তা অনুসন্ধানী জাতির পিপাসাও নিবারণ করে না। যে তাঁর প্রতি শক্ততা রাখে, তার এবং সত্যের মাঝে এমন একটি রূপক্ষ দ্বার অস্তরায় হবে যা সিদ্দীকদের নেতার কাছে সমর্পিত না হওয়া পর্যন্ত কখনো খুলবে না। এ কারণে শিয়াদের মাঝে আমরা কোন ওল্লি বা খোদাভীরুম শ্রেণীর কাউকে দেখতে পাই না। এর কারণ হলো, তারা খোদার দ্রষ্টিতে অপচন্দনীয় কাজ করছে আর পুণ্যবানদের বিরোধিতা করছে।

হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা

তিনি (রাঃ) একজন পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী, নম্র স্বভাবসম্পদ ও দয়াদ্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি বিনয়ের সাথে ও দারিদ্র্যের বেশে জীবন অতিবাহিত করতেন। অতি ক্ষমাশীল, ম্লেহশীল ও দয়ালু ছিলেন তিনি, ললাটের জ্যোতি দেখেই তাঁকে চেনা যেতো। মহানবী মুন্তাফা (সাঃ)-এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির আআর সাথে তাঁর আআ একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাঁর আআ এমন জ্যোতিতে উত্তুসিত ছিল যা তাঁর নেতা আল্লাহর প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আচ্ছন্ন করেছিল। রসূলুল্লাহর জ্যোতির ঔজ্জ্বল্য ও তাঁর মহান কল্যাণ ধারায় তিনি নিজেকে বিলীন করেছিলেন। কুরআনের ব্যুৎপত্তি অর্জন ও নবীনেতা, মানবতার গর্ব মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে তিনি সব মানুষের মাঝে স্বতন্ত্র ছিলেন। পারলৌকিক জীবনের স্বরূপ এবং ঐশ্বী রহস্যাবলী যখন তার সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন তিনি ইহজাগতিক বন্ধন ছিল করে ও দৈহিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করে প্রেমাস্পদের রঙে রঙীন হয়ে যান এবং শুধু একটি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের খাতিরে নিজের সব চাওয়া-পাওয়াকে জলাঞ্জলি দেন। তাঁর প্রাণ জাগতিক কৌলুষ থেকে মুক্ত হয়ে এক সত্য ও অদ্বিতীয় সন্তান রঙ্গে রঙীন হয় আর বিশ্ব প্রতিপালকের সন্তুষ্টির সঙ্গানে নিজেকে তিনি বিলীন করেন। সত্যিকারের ঐশ্বী প্রেম যখন তাঁর সব শিরা-উপশিরায় ও হৃদয়ের গভীরতম স্থানে এবং অস্তিত্বের রঞ্জে রঞ্জে স্থান করে নিল আর তাঁর কথায় ও কাজে ওঠা ও বসায় সে প্রেমের জ্যোতি যখন প্রকাশ পেতে শাগলো তখন তাঁকে 'সিদ্ধীক' নাম দেয়া হলো এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দাতার পক্ষ থেকে তাঁকে সতেজ ও গভীর জ্ঞান দান করা হলো। নিষ্ঠা ছিল তাঁর স্থায়ী বৈশিষ্ট্য ও একটি সহজাত বিষয়। এর ছাপ ও জ্যোতি তাঁর সব কথা, কাজ, উঠাবসা এবং সব ইন্দ্রিয় ও শাস্ত্র-প্রশাসে প্রকাশ পেত। আকাশ ও পৃথিবীর প্রভুর পক্ষ থেকে তাঁকে নিয়ামতপ্রাণদের অস্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নবুওয়তকে একটি গ্রন্থের সাথে তুলনা করলে তিনি ছিলেন সেই গ্রন্থের ক্ষুদ্র অনুলিপি। তিনি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ও সাহসী লোকদের ইমাম আর নবীদের গুণাবলীর উত্তরাধিকারী ছিলেন।

আমাদের একথাকে তুমি কোন প্রকার অতিরঞ্জন বা ছাড় মনে করবে না, এটি চোখ বুঁজে বলা কথা নয় বা ভালবাসাপূর্ণ দৃষ্টির উপেক্ষার কোন ফলশ্রুতিও নয়; বরং এটি সেই বাস্তব সত্য যা আমার কাছে সম্মানিত প্রভুর পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। জাগতিক উপায়-উপকরণের দিকে বেশী মনোযোগী না হয়ে সর্বাধিপতি খোদার প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখাই ছিল তাঁর চারিক্রিক বৈশিষ্ট্য।

যাবতীয় আচার-আচরণ ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে তিনি আমাদের রসূল (সাঃ)-এর ছায়াশ্বরূপ ছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সাথে তাঁর এক চিরস্থায়ী সামঞ্জস্য ছিল, যে কারণে অতি অল্প সময়ে তিনি এমন কল্যাণের অধিকারী হয়েছেন যা অন্যরা দীর্ঘ যুগ ব্যয় করে বা সুদূর পথ অতিক্রম করেও লাভ করতে পারে না। আমি জানি সামঞ্জস্য ছাড়া কেউ কখনো কল্যাণের ভাগী হতে পারে না। বিশ্ব-জগতে আল্লাহর নিয়ম এভাবেই কাজ

করছে। যে ব্যক্তিকে স্থায়ী বন্টনকারী আল্লাহু, ওলী ও সূফীদের সাথে বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য দান করেন নি তার জন্য এটিই সেই বঞ্চনা যাকে ভাগ্য বিড়ব্বনা বলতে হবে, আর মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে এটিই অভিশাপ। পরম সৌভাগ্যবান সে, যে বঙ্গুর অভ্যাসকে আয়ত করে, এমন কি সে প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ এবং সব রীতিনীতিতে তার সদৃশ হয়ে যায়। যেভাবে রাতকানারা রঙ ও আকৃতিকে অনুধাবন করতে পারে না সেভাবে দুর্ভাগারাও এ আদর্শকে বুঝে না। দুর্ভাগার অদৃষ্টে প্রতাপশালী ও ভীতিপূর্ণ নির্দশন ছাড়া অন্য কোন নির্দশন প্রকাশ পায় না। কেননা তার প্রকৃতি রহমতের নির্দশন দেখার যোগ্যতা রাখে না, আকর্ষণ ও প্রেমের সৌরভকে অনুধাবন করে না, খাঁটি ভালবাসা, সাধুতা, সৌহার্দ্র ও মনের প্রশান্তি কাকে বলে -সে জানে না। তার প্রকৃতি যেহেতু বিভিন্ন ধরনের অঙ্ককারে ভরা তাই তাতে কল্যাণময় জ্যোতি নাযেল হবার প্রশ্নই উঠে না। বরং দুর্ভাগার আআ প্রবল বঢ়ের মত অশান্ত থাকে। তার অবাধ্য আকর্ষণ তাকে সত্য ও তত্ত্বজ্ঞান থেকে দূরে রাখে। সুতরাং তা সৌভাগ্যবান লোকদের ন্যায় স্বতঃকৃত এক আকর্ষণ নিয়ে তত্ত্বজ্ঞানের দিকে ধাবিত হয় না। হ্যরত আবু বকর সিদ্দীককে কল্যাণের উৎসের প্রতি অনুরাগী করে ও রহমান খোদার রসূলের প্রতি আকর্ষণ দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছিল। সে কারণে নবুওয়তের বৈশিষ্ট্য অবলম্বনের ক্ষেত্রে তিনি মানুষের মাঝে সবচেয়ে যোগ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মহানবী (সাঃ)-এর খলীফা হবার সবচেয়ে উপযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর অনুসৃত নেতা (সাঃ)-এর সাথে প্রতিটি ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রাখতেন এবং মত ও পথের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে পুরো মিল ছিল। সব নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে, সব অভ্যাসে এবং খোদার জন্য স্বজন-আপন-পর সবার সাথে সম্পর্ক ছিল করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তাঁর প্রতিচ্ছবি। কিন্তু তরবারী ও বর্ণার সাথে কখনো তাঁর সম্পর্ক ছিল হতো না। এ অবস্থা তার জীবনে সদা বিরাজ করতো। কোন সমস্যা, ভয়, কারো সমালোচনা বা কারো অভিসম্পাত তাঁকে টলাতে পারতো না। তাঁর আত্মিক গুণাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল সততা, স্বচ্ছতা, দৃঢ়চিত্ততা এবং খোদাভীতি। গোটা পৃথিবীও যদি মুরতাদ হয়ে যেতো তিনি তাতে ভ্রক্ষেপণ করতেন না এবং পিছপাও হতেন না বরং অব্যাহতভাবে এগিয়ে যেতেন।

সে কারণে আল্লাহু নবীদের পরেই সিদ্দীকদের উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন

فَأَوْكِلْتُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ التَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ ۝

(সূরা নিসা : ৭০)

এতে হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক এবং অন্যদের তুলনায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা মহানবী (সাঃ) তাঁর পদমর্যাদা ও ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যকে স্পষ্ট করার লক্ষ্যে তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে 'সিদ্দীক' আখ্যা দেন নি। সুতরাং চিনাশীলদের মত

দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখ! এ আয়াতে পুণ্যের পথ অতিক্রমকারীদের জন্য আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের বিভিন্ন শর ও এতে উপনীত লোকদের সম্পর্কে এক মহান ইঙ্গিত রয়েছে। আমরা যখন এ আয়াত নিয়ে ভাবলাম এবং ভাবনাকে দিগন্ত বিস্তৃত করলাম তখন এটি স্পষ্ট হয়ে গেল, এ আয়াত হ্যরত আবু বকরের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আর এতে একটি গভীর রহস্য রয়েছে যা প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য উন্মোচিত হবে, যে অনুসন্ধিৎসু। কেননা আবু বকরকে প্রিয় রসূলের ভাষায় ‘সিদ্ধীক’ আখ্য দেয়া হয়েছে। বিবেকবানদের একথা অজানা নয়। কুরআন নবীদের পরপরই সিদ্ধীকদের উন্মেশ করেছে। এই উপাধি ও শিরোপা আমরা অন্য কোন সাহাবির অনুকূলে দেখি না। সুতরাং বিশ্ব সিদ্ধীকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো, কেননা তাঁর নাম ‘নবীস্টন’ শব্দের পরেই উন্মেশ করা হয়েছে। সুতরাং তুমি সমর্পিত ব্যক্তির চোখে তাকিয়ে দেখ আর সন্দেহের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসো। কেননা প্রচন্ন রহস্য কুরআনের সূক্ষ্ম কথার মাঝে আচ্ছন্ন রয়েছে। যে সত্যিকার অর্থে কুরআন পড়ে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুধাবন না করলেও তার হৃদয়চক্ষু কুরআনে বিখৃত তত্ত্বজ্ঞানকে আবিষ্কার করে। তত্ত্বজ্ঞানীদের সামনে এসব তত্ত্বকথা এমনভাবে খোলাসা হয় যাতে আর সন্দেহের নামগঙ্কণ থাকে না। তত্ত্বজ্ঞানীরা মহাসম্মানিত খোদার দরবারে বিনত চিন্তে লুটিয়ে পড়েন আর তাঁদের আত্মার দর্পণে এমন সূক্ষ্ম বিষয়াদি প্রতিভাত হয় যা বিশ্বের অন্য কারো কাছে ধরা দেয় না। তাঁদের কথাই প্রকৃত কথা, বাকি সবকিছু বাতুলতা মাত্র। তাঁরা অতি সূক্ষ্ম কথা বলেন এবং সাধারণ মানুষের বৈধ ও বুদ্ধির উর্ধ্বে থাকেন। কথা না বুঝে তুলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি তাদেরকে কাফের আখ্যা দেয়। তাঁরা এমন মানুষ যারা এ জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, কেউ তাদের সাথে সামঞ্জস্য রাখে না আর তারাও করো সাথে সামঞ্জস্য রাখেন না। এক অদ্বিতীয় সন্তা ছাড়া তারা অন্য কারো ইবাদত করেন না। যারা ক্রীড়া কৌতুকে ঘঘ তাদের দিকে তাঁরা তাকান না। আল্লাহ তাঁদেরকে সেভাবে লালন করেন যেভাবে একজন ব্যক্তি এতীমকে পালন করে থাকে, যাকে সে এক দুধ-মারের হাতে সোপর্দ করে, এক পর্যায়ে তার দুধ খাওয়া শেষ হয় এরপরও তাকে লালন-পালন করা অব্যাহত রাখে, তাকে সুশিক্ষা দেয়, এরপর তাকে উন্নতাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে। এক কথায় তাঁর প্রতি সে অনেক বড় অনুগ্রহ করে। অতএব কল্যাণমণ্ডিত সেই খোদা যিনি সবচেয়ে বড় অনুগ্রহশীল।

হ্যরত আলী (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে। হে আল্লাহ! যে তাঁর সাথে বন্ধুত্ব রাখে তুমি তাঁর বন্ধু হয়ে যাও, যে তাঁর প্রতি শক্তি করে তুমি তাঁর শক্তি হয়ে যাও।

রহমান খোদার দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় লোকদের মাঝে তিনি (রাঃ) ছিলেন একজন অতি বিশুদ্ধচিত্ত খোদাভীরু মানুষ, সর্বোৎকৃষ্ট বংশ ও যুগের নেতৃত্বানীয় মানুষ, প্রবল শক্তিধর খোদার বিজয়ী সিংহ, মেহশীল খোদার বীর যুবক, দানশীল, পবিত্র হৃদয় এবং এমন অসাধারণ সাহসী যে গোটা শক্রবাহিনী তাঁর মুখোযুদ্ধি হলেও রণাঙ্গণই হতো তাঁর

অবস্থানের কেন্দ্রস্থল। তিনি সারাটা জীবন কষ্টদায়ক অবস্থার ভেতর কাটিয়েছেন। নিজ যুগে মানুষের জন্য নির্ধারিত তাকওয়ার উচ্চমার্গে তিনি উপনীত ছিলেন। খোদার পথে ধনসম্পদ খরচ, মানুষের কষ্টলাঘব, এতীম-মিসকীন ও প্রতিবেশীদের দখেশুণা করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবার আগে। যুদ্ধে তিনি বহুমুখী বীরত্ব প্রদর্শন করতেন। তীর ও তরবারী পরিচালনায় তিনি আশ্চর্যজনক দক্ষতা প্রদর্শন করতেন। একই সাথে তিনি ছিলেন সুমিত্তভাষী ও বাগ্নী। তিনি তাঁর বক্তৃতা মানব হৃদয়ের গভীরে প্রবিষ্ট করিয়ে মনের মরিচা দূর করতেন। নিজ বক্তৃতার দিগন্তকে যুক্তির জ্যোতিতে তিনি আলোকিত করতেন। বিভিন্নমুখী কাজে তিনি ছিলেন অসাধারণ পারদর্শী। এসব বিষয়ে তাঁর প্রতিবন্ধিতায় অবতীর্ণ ব্যক্তিকে পরাজিতের ন্যায় তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হতো। সব কল্যাণময় কাজ, বক্তব্যের গভীরতা ও বাগ্নীতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উন্নত আদর্শ। যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে অঙ্গীকার করে সে নির্লজ্জতার পথ অবলম্বন করে। নিরপায় লোকদের প্রতি সহমর্মিতায় তিনি অঞ্চল বিসর্জন দিতেন এবং সল্লুট মানুষ ও নিঃস্বদের খাবারের ব্যবস্থা করতেন। তিনি ছিলেন খোদার একজন নৈকট্যপ্রাণু বন্দু। এর পাশাপাশি তিনি ছিলেন কুরআনের জ্ঞান আহরণকারীদের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় মানুষ। কুরআনের সূক্ষ্ম জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁকে অসাধারণ বৃৎপত্তি দান করা হয়েছিল। আমি তাঁকে ঘূর্ণত অবস্থায় নয় বরং জাগ্রত অবস্থায় কাশ্ফে দেখেছি। তিনি আমাকে সর্বজ্ঞানী আল্লাহর কিতাবের একটি তফসীর তুলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, এটি আমার তফসীর। এখন আপনাকে এর উত্তরাধিকারী করা হলো। আপনাকে যা দেয়া হয়েছে এর জন্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমি হাত বাড়িয়ে তফসীরটি গ্রহণ করলাম এবং দানশীল ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। আমি তাঁকে ঝুঁ ও বলিষ্ঠদেহ, উল্লিখ চরিত্রসম্পন্ন, বিনয়ী এবং হাস্যোজ্জ্বল চেহারার অধিকারী দেখতে পেয়েছি। আমি কসম খেয়ে বলছি, তিনি আমার সাথে একান্ত স্নেহ ও ভালবাসার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। আমার মনে হলো, তিনি আমাকে চিনেন এবং আমার বিশ্বাস সম্পর্কে তিনি অবহিত। মতবাদ ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমি যে শিয়াদের বিরোধিতা করি তা-ও তিনি জানতেন। কিন্তু তিনি কঠোরতাবশত তাছিল্য আর ঘৃণার কারণে মুখ ফিরিয়ে মেন নি। তিনি আমার কাছে এলেন আর পরম ও আনন্দরিক বন্ধুর মত বিশেষ ভালবাসার জন্য আমাকে বেছে নিলেন এবং নিষ্ঠাবান বন্ধুর মত ভালবাসা প্রকাশ করলেন। তাঁর সাথে হ্যরত হোসাইন বরং হাসান-হোসাইন এবং নবীকূল শিরমনি খাতামান নবীঈন (সাঃ)-ও ছিলেন। তাদের সাথে একজন একান্ত সুন্দরী, পুণ্যবৃত্তী, মহীয়সী, কল্যাণময়ী, পবিত্র, মহতী ও গাণ্ডীর্ঘময়ী মহিলাও ছিলেন তাঁর ঔজ্জ্বল্য ও জ্যোতি ছিল সুস্পষ্ট। তাঁকে আমি দুঃখে ভারাক্রান্ত দেখেছি। কিন্তু তিনি স্থীয় দুঃখ গোপন করছিলেন। আমার হৃদয়ে এ ধারণা সৃষ্টি করা হলো, তিনি ফাতেমাতুয় যাহরা। আমার শায়িতাবস্থায় তিনি আমার কাছে এলেন এবং বসলেন, আমার মাথা তাঁর রান্নের ওপর রাখলেন আর স্নেহ প্রকাশ করলেন। আমি দেখলাম, আমার কিছু দুঃখের কারণে তিনি দুঃখিত ও উৎকঠিত।

সন্তানের সমস্যায় মায়েরা যেভাবে ব্যাকুল হয়ে উঠেন তিনি সেভাবে মেহ ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করলেন। আমাকে জানানো হলো, ধর্ম-সম্পর্কে আমি তাঁর ছেলের মত। মনে হলো জাতি, স্বদেশবাসী ও শক্ত কর্তৃক আমি যে অত্যাচারের সম্মুখীন হতে যাচ্ছি সেটিই তাঁর দুঃখের কারণ। এরপর আমার কাছে হ্যারত হাসান-হোসাইন এলেন। তারাও সহোদরের ন্যায় ভালবাসা প্রকাশ করলেন এবং দুই সহমর্মীর মত ভালবাসা দেখালেন। এটি ছিল জাগ্রত অবস্থায় একটি দিব্যদর্শন। আমি এ কাশফ দেখেছি বেশ কয়েক বছর হয়েছে। হ্যারত আলী এবং হোসাইনের সাথে আমার বিশেষ একটি মিল আছে, যার রহস্য পূর্ব-পশ্চিমের প্রদু আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আমি তাকে শক্ত মনে করি যে তাঁদের প্রতি শক্ততা রাখে। আর আমি অত্যাচারীদের অঙ্গৰুক্ত নই। আল্লাহ আমার সামনে যা প্রকাশ করেছেন তা আমি উপেক্ষা করতে পারি না। আর আমি সীমালংঘনকারীও নই। তোমরা যদি না মানো তাহলে আমার কর্মের জন্য আমি দায়ী আর তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী। আল্লাহ সন্তুর তোমাদের এবং আমার মাঝে মীমাংসা করবেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ମାହଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗେ- ଯିନି ଏହି ଉତ୍ସତର ଆଦମ ସ୍ଵରୂପ ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇମାମ

ସ୍ମରଣ ରାଖତେ ହେ, ଆଜ୍ଞାହୁ ତା'ଲାଇ ଦିବାରାତି ସୃଷ୍ଟି କରେଛେନ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଆଲୋର ଉତ୍ସାବନ ଘଟିଯେଛେନ । ଆଦିକାଳ ବରଂ କାଳେର ସୂଚନା ଲମ୍ବ ଥେକେଇ ତା'ର ରୀତି ହଲୋ, ତିନି ଯଥନଇ ଚରମ ପାପାଧିକ୍ୟ ଦେଖେନ ସଂଶୋଧନେର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେନ । ବିପଦ-ଆପଦ ଯଥନ ସୀମା ଛୁଟି ଛୁଟି କରେ ଆର ସଂକଟ ଯଥନ ଚରମ ରୂପଧାରଣ କରେ ତଥନ ଐଶ୍ଵରୀ କୃପା ତା ଦୂର କରାର ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରେ ଏବଂ ଏମନ ଉପକରଣ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଯା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାର କାରଣ ହୁଏ । ଯାର ଓପର ସନ୍ଦେହେର ଭୂତ ଭର କରାରେ ବା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ବାସୀନ ତାର ଜନ୍ୟ ଏର ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ ବନ୍ଦଜଗତେ ଅନେକ ପରିକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଓ ସୁମ୍ପଟ ଉଦାହରଣ ରମେଛେ ।

ଏଇ ସବଚେଯେ ବଡ଼ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହଲୋ ସାଧାରଣ ବୃଷ୍ଟିପାତ । ବନ୍ଦେର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷଗେର ମାଝେ ଏହି ମହାନ ଐଶ୍ଵରୀ ବିଧାନ ଦେଖା ଯାଏ । ଶୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବୃକ୍ଷରାଜିର ସତେଜତାର ବାରତା ନିଯେ ଆସେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ । ସତ୍ୟକାର ଅର୍ଥେ ଚରମ ସଂକଟେର ସମୟ ଯେ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷିତ ହୁଏ ସେଟାଇ ସବଚେଯେ କଳ୍ୟାଣଜନକ ହୁଏ ଥାକେ । ପ୍ରୋଜନ ଓ ସନ୍ନିଯେ ଆସା ବିପଦ ଦେଖେ କଞ୍ଜିତ ବୃଷ୍ଟିର ସମୟ ଅଁଚ କରା ଯାଏ । ଜୟି ଯଥନ ଶୁକିଯେ ଚୋତିର ହୁଏ ଯାଏ ଏବଂ ଭୂମିତେ ଜନ୍ମାନୋ ସବ ଶସ୍ୟ ଓ ଉତ୍ସିଦ ଯଥନ ହଲୁଦ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରେ, ପୃଥିବୀବାସୀର ଜୀବନେ ଯଥନ ଦୁଃଖ-କଟ୍ଟ ନେମେ ଆସେ, ମାନୁଷେର ଓପର ସମସ୍ୟାର ପାହାଡ଼ ଯଥନ ଭେଙେ ପଡ଼େ, ମାନୁଷ ଯଥନ ମନେ କରେ ତାରା ଧବଂସେର ଦ୍ୱାରାପାତ୍ର ଉପନୀତ, ବିପଦାବଲୀ କ୍ରମଶ ଘନୀଭୂତ ହତେ ଥାକେ, ପୁକୁରେ ବିନ୍ଦୁ ପରିମାଣ ପାନିଓ ଯଥନ ଆର ଥାକେ ନା ଆର ଜଳାଶୟ ଯଥନ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମଯ ହୁଏ ଯାଏ ଏମନ ସମୟେ ମାନୁଷେର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଗୃହୀତ ହୁଏ । ଆଜ୍ଞାହୁ ଭୂମିକେ ଏର ମୃତ୍ୟୁର ପର ପୁନର୍ଜୀବିତ କରେନ । ତଥନ ତୁମି ଦେଖବେ ଦେଶ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ହୁଏ ଉଠିଛେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରାରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରେ ତଥନ ନତୁନ କୁଁଡ଼ି ଗଜାଯ ଆର ଧରାପଢ଼େ ସବୁଜର ସମାରୋହ ଦେଖା ଯାଏ ଏବଂ ମାନୁଷ ବିପଦେର ପର ନିରାପତ୍ତା ଫିରେ ପାଏ ।

ଏଟିଇ ଚିରାଚରିତ ରୀତି ଓ ଆଦି ନିୟମ । କିନ୍ତୁ କୋନ କୋନ ସମୟ ପରିଷ୍ଠିତି ଆରା କଠିନରୂପ ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିୟମେର ସୀମା ଛାଡ଼ିଯେ ଯାଏ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ଵରୂପ କୋନ ବଚର ଏକଟି ଅଞ୍ଚଳ ଯଥନ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କବଲିତ ହୁଏ, ତୁମି ଦେଖବେ, ତଥନ ବୃଷ୍ଟି ତୋ ଦୂରେର କଥା ପାନିଶୂନ୍ୟ ମେଘ ଦେଖା ଯାଏ ନା । ବିନ୍ଦୁ ପରିମାଣ ପାନିଓ କୋଥାଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାକେ ନା । ଆର ଶୀତକାଳୀନ ଖାଦ୍ୟ ଭାଭାରା ଓ ଶଶ୍ୟଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ଯାଏ । ଦୀର୍ଘକାଳ ଅପେକ୍ଷା କରା ସନ୍ତୋଷ ଏକ ଫୋଟା ବୃଷ୍ଟିଓ ହୁଏ ନା । କାହାର ଖୋଦାର କ୍ରୋଧେର ଲକ୍ଷଣାବଲୀ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ଭାଯେ ମାନୁଷେର ଚେହାରା ବଦଳେ ଯାଏ, ଲୈରାଶ୍ୟ ଛେଯେ ଯାଏ ଏବଂ ମାନୁଷ ଦିଶେହାରା ହୁଏ ପଡ଼େ । ସବୁଜ-ସତେଜ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏମନ ଭୂମିତେ ପରିଣତ ହୁଏ ଯେଥାନେ ଖଡ଼କୁଟା ଆର ଧୂଲାବାଲି ଛାଡ଼ା ଆର କିଛୁଟ ଦେଖା ଯାଏ ନା । ଫଳ ତୋ ଦୂରେର କଥା, ଗାଛେ ଏକଟି ପାତାଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାକେ ନା । ମାନୁଷେର

মাবে চরম উৎকৃষ্টা বিরাজ করে। নৈরাশ্য ও অবলুপ্তির লক্ষণাবলী মানুষকে ধ্বংসের দ্বারপ্রাণ্তে উপনীত করে। তখন খোদার কৃপাদৃষ্টি তাদের ওপর পড়ে। খোদার দয়া তাদের আচল্ল করে এবং আল্লাহর নিদর্শন প্রকাশ পায়। বৃষ্টির সুবাদে তাদের জমি সুশোভিত হয় এবং ফল-ফলাদির প্রাচুর্যে তাদের চেহারা সতেজ হয়ে ওঠে। আল্লাহর অনুগ্রহে তারা প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়। এটি সেসব লোকের দৃষ্টান্ত যাদের জীবনে অষ্টতার মুগ নেমে আসে এবং বিভাস্তিকর অনেক উপকরণ দেখা দেয়, যার ফলে তারা প্রতাপশালী খোদার সঠিক পথ থেকে বিচ্ছুত হয়। তখন এক সুপ্রভাতে তাদের ওপর মূষলধারে তাঁর রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ধর্মকে পুনর্জীবিত করার জন্য একজন মুজাদ্দেদ আবির্ভূত হন। সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিরা কুধারণা পোষণ করতঃ আল্লাহর সমীপে বিভিন্ন অজুহাত পেশ করে। অন্যরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁকে বলে, আল্লাহ কিছুই নায়েল করেন নি, তুমি কেবল একজন মিথ্যাবাদী। তখন একাধারে প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে যার ফলে কুধারণার কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না। যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তারা অনুশোচনার সাথে সত্যের দিকে ফিরে আসে।

তবে দুর্ভাগারা ঐশ্বী রহমতের এ প্রবল বৃষ্টি থেকে বিদ্যুমাত্রও লাভবান হয় না বরং তারা বিদ্রোহ, অত্যাচার ও নিষ্পেষণের ক্ষেত্রে আরও ধৃষ্টিতা দেখায়। তারা আগের থেকেই অনাচারী। তারা ঐশ্বী-পনি দ্বারা অঙ্গলি ভরে না, পানও করে না, গোসল এবং ওজ্জও সারে না আর ক্ষেত্র সিঞ্চনও করে না। তারা এমন এক দুর্ভাগ্য জাতি যারা সত্যের প্রতি ঝঙ্কেপ করে না, কেননা তারা অন্ধ। এতে চিঞ্চালীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

মহান স্বষ্টা প্রেরীত রসূলগণের অপর একটি তুলনা চন্দ্র মাসের শেষ রাতগুলোর সাথে করা যায়। যারা গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন ও চিঞ্চালীল একথা তাদের অজানা নয়, সে রাতগুলো চরম অঙ্ককারাঘন ও তমসাচল্ল হয়ে থাকে যা শুরু পক্ষের পর বড় আপদ হিসেবে দেখা দেয়। অঙ্ককার যখন চরমে পৌছে, রাতের আকাশে যখন আর কোন আলো অবশিষ্ট থাকে না, তখন আল্লাহ পুঁজীভূত অঙ্ককারারাশিকে অপসারণের ইচ্ছা করেন যার ফলে মেঘাবৃত চাঁদ উদিত হয়। অবশ্য প্রথমে নতুন চাঁদ উদিত হয় যা ক্রমে ভীতিপ্রদ রাতকে নিরাপত্তা ও আলোয় ভরে দেয়। ধর্মীয় বিষয়েও তাঁর একই রীতি অব্যাহত আছে। দুর্ভাগদের জন্য পরিতাপ! বাহ্যিক তমসাচল্ল রাত দেখে বলে, সৃত্র নতুন চাঁদ উদিত হবে বরং অধীর আগ্রহে এর জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু ধর্মের অমাবস্যার যুগে অঙ্ককার চরমে পৌছলেও তারা নতুন চাঁদের অপেক্ষা করে না। আমি সত্য সত্যই বলছি এরা এক নির্বোধ জাতি, এদের কোন ঝুঁকি-বিবেকও নেই আর এদের দৃষ্টি-শক্তিও নেই।

মানব জাতির ক্ষেত্রে আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম এ সাক্ষ্যই বহন করে। আর এটি একটি প্রমাণিত বিষয়, আল্লাহ তাঁলা বিভিন্ন প্রকার সমস্যা ও অবক্ষয়ের মুখে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং যেক্ষেত্রে নিজ দুর্বল বান্দাদের সর্বাঙ্গসী দুর্ভিক্ষের সময়

ধূমসের মুখে ঠেলে না দেয়া আর জাগতিক ব্যবস্থাপনাকে ভেঙ্গে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করা প্রতাপশালী ও সমানিত খোদার চিরস্তন রীতি সেক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থাকে টুকরো-টুকরো করে কিভাবে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন যার ফলশ্রুতিস্বরূপ আগ্রার মৃত্যু ঘটে এবং জাহানামের স্থায়ী আগুন তার জন্য অবধারিত হয়ে যায়? অধিকস্ত পবিত্র কুরআনে দৃষ্টিপাত করলে তাকে আমরা একথার সমর্থন দেখতে পাই। আল্লাহ বলেন

فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

(সূরা ইনশিরাহ : ৬-৭)

(অর্থাৎ : কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য, নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই আছে স্বাচ্ছন্দ্য।)

এতে নিঃসন্দেহে প্রত্যেক পবিত্র ব্যক্তির জন্য শুভ সংবাদ রয়েছে এবং এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে, এক যুগে মানুষ কষ্ট ও দুর্দশার সমুখীন হলে অন্য যুগে সুখ ও সমৃদ্ধির ভাগী হয়। ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়ে সমস্যা উত্তরণের পর তারা স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখে থাকে। সত্যানুসন্ধানীদের জন্য একইভাবে অন্য একটি আয়তে বলা হয়েছে

إِنَّا نَحْنُ نَرْكِنُ لِذِكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

(সূরা : হিজর-১০)

(অনুবাদ : নিশ্চই আমরা এই সমানিত যিক্র (অর্থাৎ কুরআন) অবর্তীণ করেছি এবং নিশ্চই আমরা এর সুরক্ষাকারী।)

চিন্তা-ভাবনা করতে চাইলে এ আয়তে গভীরভাবে মনোনিবেশ কর। বুদ্ধিমানরা জানেন, এটি বিশ্বজগত যুগে মোজাদ্দেদ প্রেরণের প্রতি একটি ইঙ্গিত বহন করছে। তত্ত্বজ্ঞানী ও চিন্তাশীলদের একথা অজানা নয়, অশান্তি বিস্তারের যুগে কুরআনী শিক্ষার যদি রক্ষণাবেক্ষণ না করা হয় এবং নৈরাজ্যের প্রবল শৈত্য প্রবাহের সময় মানব হৃদয়ে যদি কুরআনী শিক্ষার মূল আদর্শকে প্রোত্থিত রাখার ব্যবস্থা না হয় তাহলে কুরআনের রক্ষণাবেক্ষণের কোন অর্থ নেই।

কলুষমুক্ত, প্রখরেন্দ্রীয় এবং প্রভু-প্রতিপালক কর্তৃক পবিত্রাত্মার ফুৎকারে জেয়াতিমৰ্ভিত ব্যক্তি ছাড়া মানব হৃদয়ে কুরআনকে প্রতিষ্ঠিত করা সন্তুষ্ট নয়। অতএব তিনিই মাহনী, যিনি বিশ্বজগতের প্রভুর পক্ষ থেকে পথ প্রদর্শন করবেন। তিনি তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে মানুষকে এমন এক আধ্যাত্মিক ভোজ-সভায় আমন্ত্রণ জানাবেন যাতে নিমজ্ঞিতদের জন্য মুক্তি নিহিত থাকবে। এর তুলনা এমন একটি পাত্রের সাথে করা যায় যাতে সুপেয় দুধ ও ভূনা মাংসের বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সামগ্ৰী রয়েছে বা তা শীতকালীন অগ্নির ন্যায় যা শীতকাতৰ ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে প্রিয় বস্তু বা যা ইক্সুগুড়ের মিষ্টি ও স্বচ্ছ মধুপূর্ণ পশ্চিমা কোন রেকাবী তুল্য। যে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে সে অবশ্যই বিবিধ স্থাদের মিষ্টি থেতে পাবে আর যে অবজ্ঞা করবে সে ধরা পড়বে এবং

ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তার মুক্তির আর কোন পথ অবশিষ্ট থাকবে না। শত অজুহাত দেখালেও সে আগনে নিক্ষিণি হবে। অতএব সাব্যস্ত হলো, মাহুদীদের সময় ধর্মের জন্য স্মৃত্বরূপ। তাঁদের জ্যোতি শয়তানের আবির্ভাবের সময় প্রকাশ পায় আর বহু লোককে চন্দ্র পরিমন্ডলের মত আলোকিত করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভট্ট এবং ভট্টকারী লোকদের আধিপত্যের যুগে মাহুদীরা আগমন করেন। তাঁদেরকে এ নাম দেয়ার পিছনে রহস্য হলো, মহিমা ও সম্মানের অধিকারী খোদা অবাধ্য ও অশ্঵ীকারকারী লোকদের মাঝ থেকে তাঁদেরকে পবিত্র করেন এবং নিজ পবিত্র হস্তে তাঁদেরকে অঙ্ককার থেকে আলোর দিকে, মিথ্যা থেকে পরিপূর্ণ সত্যের দিকে পরিচালিত করেন। তিনি তাঁদেরকে নবীদের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী করেন ও নিজ সন্নিধান থেকে অনেক বড় দানে ভূষিত করেন। তাঁদের চিটা-চেতনাকে সূক্ষ্মতা দান করেন এবং নিজ পক্ষ থেকে জ্ঞান দান করেন আর এমন পথ প্রদর্শন করেন যা নিজ শক্তিতে অর্জন করা সম্ভব নয়। তিনি তাঁদেরকে এমন সব পথের দিশা দেন, আল্লাহ না দেখালে নিজ যোগ্যতার বলে বা দেখা তাঁদের জন্য সম্ভব হতো না। এ কারণেই তাঁদের নাম মাহুদী রাখা হয়েছে। বিদ্রোহের বিষাক্ত বায়ু প্রবাহের যুগে শেষ যুগের ইমাম, প্রতিশ্রূত মাহুদীর আগমনের কথা। তোমার জানা উচিত, ‘মাহুদী’ শব্দের মাঝে মানব জাতির পথভ্রষ্টতার যুগের দিকে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে।

হোয়াতের সাথে সম্পর্কযুক্ত ‘মাহুদী’ শব্দ দ্বারা আল্লাহ যেন এমন এক যুগের দিকে ইঙ্গিত করছেন যখন ঈমানের কোন জ্যোতি অবশিষ্ট থাকবে না, মানব হৃদয় তুচ্ছ জগতের মোহে ছুটে এবং রহমান খোদার পথ পরিত্যাগ করবে। মানুষের ওপর শিরক, অবাধ্যতা, অন্যায় এবং বিভিন্ন প্রকার নৈরাজ্যের কালযুগ নেমে আসবে। মানবকল্যাণে সাধিত কাজ বা ব্যক্তিগত স্বার্থে কৃত কর্মে কোন বরকত থাকবে না। মানুষ ধর্মত্যাগ ও অজ্ঞতার পথ বেছে নেবে। একদিকে অজ্ঞতা ও অঙ্কন্তের ব্যাধি বাঢ়বে, অপরদিকে জঙ্গল ও অনাবাদ ভূমিতে ভ্রমণের আগ্রহও দেখা যাবে। তারা সঠিক ও সোজা পথকে উপেক্ষা করে অবাধ্যতা ও নৈরাজ্যের আশ্রয় নেবে। দুর্ভাগ্যের পঙ্গপাল মানব বৃক্ষে হামলা করবে যার ফলে কোন ফল বা শাখার কোন কোমলতা অবশিষ্ট থাকবে না। আজ তুমি দেখছো, এ যুগে সাধুতা বলতে কিছু নেই, ঈমান ও আমল হারিয়ে গেছে, ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে চলে গেছে। আল্লাহ এহেন সংকটের সময় পুনরায় তাঁর চিরস্তন প্রতিশ্রূতি স্মরণ করেন। তিনি চতুর্দিক থেকে ধর্মের দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করেন এবং অশাস্ত্রি ভয়াবহ আগন নির্বাপিত করার প্রতি দৃষ্টি দেন। আদম সৃষ্টির ন্যায় তিনি ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্যে এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেন যাঁর মাঝে তিনি সত্যের প্রেরণা পুরোপুরি সঞ্চার করেন। তাঁর সৃষ্টি যেহেতু ইবনে মরিয়ম সৃষ্টির মত তাই খ্রীস্টানদের মুখ বন্ধ করার নিরিখে তাঁর নাম ‘ইসা’ রাখেন অপরদিকে তিনি তাঁকে বিশ্বস্ত ‘মাহুদী’ নাম দেন। কেননা তিনি পথভ্রষ্ট মুসলমানদের পথের দিশা প্রদানের জন্য তাঁর প্রভূর পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা পেয়েছেন। অঙ্ককারে নিমজ্জিত লোকদের উদ্ধারের স্বার্থে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যেন তিনি তাঁদেরকে বিশ্ব-প্রতিপালকের পথে পরিচালিত

করতে পারেন। এটি সেই সত্য যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহে লিখে। আল্লাহ্ সম্যক অবগত কিন্তু তোমরা জানে না। মানুষকে তাঁর সঠিক পথের দিকে ডাকার জন্য তিনি তাঁর অনুগত দাসদের একজনকে আধ্যাত্মিক জীবন দান করেছেন। অতএব গ্রহণ করা বা না করা তোমাদের ইচ্ছা। তাঁর যা করার ছিল তিনি তা-ই করেছেন। তোমরা খুব বেশি হাসছো, কাঁদছো না। তোমরা তাকাও ঠিকই কিন্তু দেখ না।

হে মানুষ! তোমরা কুপ্রবৃত্তির দাসত্বে বেশি বাঢ়াবাঢ়ি করো না। সেই আল্লাহকে ভয় কর যাঁর কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করছো না অথচ ইতোপূর্বে তোমরা তাঁর অপেক্ষায় ছিলে? আকাশ সাক্ষ্য দিয়েছে কিন্তু তোমরা ঝুঞ্চেপ করছো না আর ধরাপৃষ্ঠও সরব কিন্তু তোমরা ভাবছো না! তারা বলে, ‘আমরা ‘আসারে’ (এমন হাদীস যা সাহাবীর বরাত ছাড়া বর্ণনা করেন) যা পড়েছি এর বাইরে কোন কিছু গ্রহণ করবো না। যদিও তাদের ‘আসার’ বিকৃত বা মানুষের বানানে! হে মানুষ! তোমরা সর্বত্র দৃষ্টিপাত কর এবং ধূজ্বালকে বর্জন কর আর যা স্পষ্ট ও নিশ্চিত তা গ্রহণ কর। হে মুস্তাকীগণ! সন্দেহের অনুসরণ করো না। আল্লাহ্ আমাদের যাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত কে অবজ্ঞা করো না।

হে মুসলমানগণ! অশুভ পরিণতির পথ বেছে নিও না। হে পুণ্যবানদের উত্তরসূরীগণ! তোমরা ইবলীসের হাতের বন্ধকী সেজো না। তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেন পবিত্রতা অবলম্বন করছো না? দেখ, খোদা বিভিন্নভাবে বান্দার নিকটে আসেন আর তাঁর অনুগ্রহ বহুবৃদ্ধি। তাঁর সবচেয়ে মহান নৈকট্যের সময় যখন আসে তখন মানুষ জাগ্রত হয়। অবাধ্যরা ছাড়া বাকি সবাই তাঁর আবির্ভাবের সময় সচেতন হয়ে যায়। তত্ত্বজ্ঞানীরা ভালভাবে জানেন, খোদার প্রত্যেক অবতরণের একটি উদ্দেশ্য ও একটি উপলক্ষ্য থাকে। খোদার সবচেয়ে মহান বিকাশ বিদ্রোহীদের ছড়ানো অগ্নি নির্বাপণের লক্ষ্যে মানুষের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা সহকারে ঘটে থাকে। কিন্তু যারা মুর্তি পূজ্য রাত তারা তাঁকে অৰ্পীকার করে, গালি দেয় এবং কাফের আখ্যায়িত করে। এ যে এক স্বর্গীয় কল্যাণধারা তারা তা জানে না। যারা ভ্রষ্ট, অজ্ঞ ও সন্দেহবাদীদের কথাকে ঘৃণা করে তাদের জন্য তা নিশ্চিত নিরাময়ের কারণ। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যুগের রোগ-ব্যাধির নিরিখে তাঁদেরকে জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেকের প্রদান করেন, যার মাধ্যমে তারা প্রশান্তি লাভ করেন। সে জ্ঞান ও অস্ত্রাঙ্গ যেন একান্ত মৌলায়েম ও সতেজ ফল এবং বহুমান ঝর্ণা যা থেকে তাঁরা আহার ও পান করেন।

সারকথা হলো, মাহদী হলেন পাপের বন্যার মুখে সংশোধনকারী সংক্ষারক আর সর্বশক্তি ও নিষ্ঠা উজাড় করা মানবকুল প্রভুর শিক্ষার প্রচারক। তাঁকে প্রতিশ্রূত মাহদী, যুগ ইমাম এবং বিশ্ব জগতের প্রভু আল্লাহর ‘খলীফা’ নাম দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রকাশ্য রহস্য যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন তা হলো, শেষ যুগে ইসলামের ওপর নানা বিপদাপদ নেমে আসবে এবং এক নৈরাজ্যবাদী জাতির উত্তর হবে যারা প্রত্যেক উঁচুহান থেকে ধেয়ে আসবে। তিনি তাঁর উত্তি ‘প্রত্যেক উঁচু স্থান’ দ্বারা এ কথার

দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তারা সব উর্বর ও পতিত ভূমির অধিপতি হবে এবং সব দেশ ও শহরকে পরিবেষ্টন করবে। তারা পুণ্যবান এবং পাপীদের সব গোত্রের মাঝে সর্বত্র এক সর্বগ্রাসী কদাচার ছড়াবে। মানুষকে এরা বিভিন্ন ছল-চাতুরী এবং ধ্বংসাত্মক প্রতারণার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করবে। বিভিন্ন প্রকারের মিথ্যা রটনা এবং অপবাদ আরোপের মাধ্যমে ইসলামের চেহারায় কলঙ্ক লেপন করবে। সব দিক থেকে উপর্যুপরি অঙ্ককার প্রকাশ পাবে। এর ফলশ্রুতিতে ইসলাম ধ্বংসের দ্বার প্রাপ্তে উপনীত হবে। ভট্টাতা, মিথ্যা এবং প্রতারণা বৃদ্ধি পাবে, ঈমান হারিয়ে যাবে, শুধু বড় বড় দাবী এবং বাহ্যিক চাকচিক্য বাকী রয়ে যাবে। এক পর্যায়ে সোজা রাস্তা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাবে আর সন্তান রাজপথ অজানা অচেনা লাগবে। তারা সঠিক পথ অবলম্বন করবে না, তাদের পা পিছলে যাবে এবং কুপবৃত্তি তাদের উপর রাজত্ব করবে। মুঘলমানদের মাঝে অনেক মতভেদ ও শক্রতা বিরাজ করবে এবং এরা পঙ্গপালের ন্যায় বিক্ষিণ্ণ হয়ে পড়বে। এদের মাঝে ঈমানের কোন জ্যোতি ও তত্ত্বজ্ঞানের কোন লক্ষণ অবশিষ্ট থাকবে না বরং এদের অধিকাংশ পশ্চবৎ বা নেকড়ে ও সাপের মত হয়ে যাবে যারা ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন। এ সবকিছু ইয়া'জুজ মা'জুজের প্রভাবে হবে। মানুষ পক্ষাঘাত কবলিত অঙ্গের মত বরং একেবারে মরার মত হয়ে যাবে।

অধুনা কালে, মৃত্যু ও ভৃষ্টার সম্মুখ যখন উত্তাল, মানুষ উম্মাদের ন্যায় যখন তুচ্ছ পৃথিবীর পিছনে ছুটছে এবং মহা প্রতাপের অধিকারী প্রভুর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, এহেন পরিস্থিতিতে কোন বাহ্যিক শিক্ষা না থাকা সন্ত্রেও আল্লাহ তাঁর পরম শক্তিমত্তা ও রূবিয়তের (অর্থাৎ লালন পালনের বৈশিষ্ট্য) গুণে আদম সৃষ্টির আদলে এক অনুগত দাস সৃষ্টি করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর নাম রেখেছেন আদম। অতএব আল্লাহ তাঁ'লা আদম সৃষ্টি করে তাঁকে ঐশ্বী বৈশিষ্ট্যবালীর জ্ঞান দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। তাঁকে মাহ্মদী নিযুক্ত করেছেন এবং তাঁকে ভালমন্দের প্রথর বিচারশক্তি দান করেছেন।

ঠিক এভাবে অতি স্পষ্টভাবে তাকে ঈসা ইবনে মরিয়ম আখ্যা দিয়েছেন, কেননা তার সৃষ্টি এবং তার আবির্ভাব মসীহীর মত আর তার গোপন রহস্যেও মসীহীর রহস্যবৃত্ত বৈশিষ্টের ন্যায় রহস্যময়। আবির্ভাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে তারা উভয়েই সমান। তাদের উভয়ের যুগে ব্যাধি ও সংশোধন-প্রক্রিয়ার মাঝে সামঞ্জস্য এবং ধর্ম-শক্রদের হৃদয়ের সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং মাহ্মদীর যুগের সবচেয়ে বড় লক্ষণ হলো, ইয়া'জুজ-মা'জুজ সৃষ্টি মহা অঙ্ককার, তারা পৃথিবীতে যখন চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করবে আর জাগতিক উন্নতির শিখরে থাকবে এবং সব উচ্চতাকে পদানত করবে*। চিন্তাশীল জাতির জন্য 'মাহ্মদী' নামের মাঝে এ নৈরাজ্যের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা

* টাকা: মুসলিম শরীফে হ্যুর (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হাদীস অনুসারে এগুলো শেষ যুগ এবং কিয়ামত নিকটবর্তী হ্বার নিশ্চিত লক্ষণ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামত তখন হবে যখন 'রোমানরা' সব মানুষের তুলনায় সংখ্যায় অধিক হবে। পড়ালেখার সাথে যাদের সম্পর্ক আছে আর যারা জ্ঞানী ও হাদীস বিশারদ, তাদের মতে এটি একটি শীর্কৃত বিষয়, রোমান বলতে তিনি গ্রীষ্মাস্টান বুঝিয়েছেন।

‘মাহদী’ নাম বলে দিচ্ছে, এ নামের অধিকারী ব্যক্তি ভট্ট জাতির মধ্য থেকে আবির্ভূত হবেন। আল্লাহ তাঁকে হেদয়াত দান করবেন এবং তাকে তিনি অবাধ্য জাতির কবল থেকে মুক্ত করবেন। এ নামটি যে অস্তর্নিহিত ভাবের দিক থেকে সংক্ষেপে যুগের সমূদয় বিশ্বজগতের প্রতি ইঙ্গিত করে আর অন্ধকার যুগ, অত্যাচারের সময় ও বিপদ অবর্তীর্ণ হবার মুহূর্তের কথা উল্লেখ করে, এতে কোন সন্দেহ নেই। একই সাথে তা যুগের বিভিন্ন ভয়ভীতি, বিপদ-আপদ এবং দুর্বলদের সাহায্যের ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান খোদার অসাধারণ ও আচর্যজনক শক্তিমন্তার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে আর সুনিশ্চিত যুক্তির ভিত্তিতে স্পষ্ট করে যে, মাহদী ঠিক এমন ধর্মসাত্ত্বক ফিলনাপূর্ণ সময়ে ও ভয়াবহ অন্ধকার যুগে আবির্ভূত হবেন যখন ভট্টতা অনেক বেড়ে যাবে, বাগড়া-বিবাদ বৃদ্ধি পাবে, পুণ্যকর্ম হারিয়ে যাবে, শুধু বড় বড় কথা আর বুলি বাকী থাকবে। এহেন অরাজক পরিস্থিতি, সুব্যবস্থাপক প্রভূর কাছে কাউকে মাহদী নিযুক্ত করার দাবী রাখে আর একই সাথে অন্ধকার দূর্বীভূত করতে ও পথকে সুস্পষ্ট করার নিমিত্তে প্রভূর সমীপে আলো অবর্তীর্ণ করার আকৃতি জানায়।

তখন পূর্ণ শক্তির আধার, প্রতিপালক-প্রভূর ইচ্ছায় তমসাচ্ছন্ন রাতে ফিরিশ্রী ও ঝুঁহল কুদুসের আগমন হয়। এক ব্যক্তিকে মাহদী নিযুক্ত করা হয়, তার ওপর ঝুঁহল কুদুস অবর্তীর্ণ করা হয়, তার হৃদয় ও দৃষ্টিকে জ্যোতিমন্তিত করা হয় এবং অনুগ্রহ স্বরূপ তাকে নেতৃত্ব ও সম্মান প্রদান করা হয়। অলংকার হিসেবে তাকে খোদাভীতি প্রদান করা হয় এবং তিনি আল্লাহর সাহায্যপ্রাণ বান্দাদের অঙ্গভূত হন। ঔন্ধত্য যখন চরমে পৌছে তখনই ঐশ্বী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং সাহায্য দানের সময় হয়ে থাকে। আল্লাহ যদি পুণ্যবানদের মাধ্যমে পাপকে দূর না করতেন তাহলে পৃথিবী বিশ্বজগতের ভরে যেতো, সফলতার দ্বার রক্ষ হয়ে যেতো এবং সব মানুষ ধর্মস হয়ে যেতো।

এ কারণে খোদার স্থায়ী নিয়ম হলো, তিনি সবসময় তমসাচ্ছন্ন রাতের পর চন্দ্র উদিত করেন। সব কষ্টের সাথে তিনি একটি স্বাচ্ছন্দ্য আর প্রত্যেক অন্ধকারের সাথে একটি আলো রেখেছেন। অতএব এ রীতি সম্পর্কে চিন্তা কর যেন তোমার লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। অবশ্যই এতে বিচক্ষণ লোকদের জন্য নির্দেশন রয়েছে। স্পষ্ট হওয়া উচিত, ঔন্ধত্যের প্রকার ও প্রকৃতির দিক থেকে এ যুগের অন্ধকার সর্বকালের অন্ধকারকে ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের সামনে ভীতিপ্রদ লক্ষণাবলী এবং হৃদক্রিয়া শুল্কারী অশাস্তি প্রকাশ পেয়েছে। কাফেরেরা সবগুলো উঁচু স্থান থেকে প্রাণহারী নেকড়ের ন্যায় ক্ষিপ্তার সাথে আক্রমণ করেছে। অতএব মুসলমানদের সাহায্যপ্রাণি, দুর্বলদের দৃঢ়তা লাভ করার এবং দাঙ্গালের চক্রান্ত দুর্বল হবার যুগ এসে গেছে। বল, পৃথিবী কি অন্যায়ে তরে যায় নি? মানুষের বিবেক-বৃদ্ধি কি লোপ পায় নি? মানুষ কি অনেক মিথ্যা প্রতিমা গড়ে তুলে নি? অবিশ্বাস কি ছেয়ে যায় নি? অথচ সর্বত্র তারই জয়জয়কার! লজ্জাবোধ কমে গেছে যে কারণে তারা ডাহা মিথ্যাকে আকর্ষণীয়ভাবে আর বাতেলকে সাজিয়ে উপস্থাপন করেছে। সর্বশক্তি নিয়োজিত করে তারা হামলা করেছে আর এমন কোন

ষড়যন্ত্র নেই যা তারা করে নি। পাপাচারীরা নিজেদের ঐকমত্য গড়ে তুলেছে। মদ ও পানির মত তারা একে অন্যের সঙ্গে জড়িত। অজ্ঞদের দল দাঙ্গালের পদাক অনুসরণ করছে। যে তাদের অপকীর্তিকে গ্রহণ ও সমর্থন করে সে তাদের দৃষ্টিতে বিশেষ লোকদের মাঝে বিশিষ্ট হবার পদমর্যাদা পায়। আল্লাহর কসম! তাদের নোংরায়ী ভয়াবহ, তাদের নমনীয়তা অনেক বড় একটি ষড়যন্ত্র বরং তা তাদের প্রতারণার একটি মাধ্যম এবং সৃষ্টিকে কাবু করার নিমিত্তে একটি দড়ি সদৃশ যা তারা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বা পাঁক দিয়ে বুনেছে।

তোমরা আক্ষেপের সাথে তাদের প্রতারণা প্রত্যক্ষ করবে। তারা এমন এক জাতি যাদের জিহ্বা, চোখ, নাক, কান, হাত, কাঁধ, পা এবং নিতম্ব থেকে অজ্ঞ ধারায় ছল-চাতুর্গী প্রকাশ পাচ্ছে। আমি তাদের দেহের প্রতিটি অঙ্গকে ছলনায় লিঙ্গ দেখছি। যুগ নষ্ট হয়ে গেছে, অবাধ্যতা ও অন্যায় সর্বত্র হৈয়ে গেছে। বহু শহর ও জনপদে শ্রীস্ট মতবাদ ছড়িয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করা যেতে পারে। মানুষ সূর্য ও আলোকে অবজ্ঞা করে অঙ্কারায়ন রাতে প্রবেশ করছে এবং জেনে-শুনে কৃপ্রবৃত্তির আশা মেটানোর জন্য দ্বিমানকে নষ্ট করছে। আমি পাত্রীদেরকে এমন এক ব্যক্তির মত দেখতে পাচ্ছি যার নাগালের মধ্যে অনেক শিকার চলে এসেছে বা যার শিকার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমি তাদেরকে বিভিন্ন ছল-চাতুর্গীর মাধ্যমে নিজ শিকারে রত দেখতে পাচ্ছি।

তাদের একটি প্রতারণা হলো, তারা কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বর্ধিত শ্রেণীর মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে আর সুবিধা-বিধিতদেরকে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। তারা বৎশ পরাম্পরায় ভূষিতদের শিকলাবন্ধ করার উদ্দেশ্যে টোপ দেয়, তাদের জন্য সব ধরণের সুযোগ সুবিধা ধার্য করে, অনঙ্গের তাদেরকে ধ্বংসের গর্তে নিক্ষেপ করে। তারা এক জুলাত আগুন। তাদের ধর্মে দীক্ষিত হবার শর্তে ভাঙ্গা হাড় জোড়া দেয়া, বন্দীদের মুক্ত করা আর দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তারা খুবই তৎপর। প্রতারিত করার মানসে এবং নিজেদের মত দৃঢ়ত্বকারী বালানোর উদ্দেশ্যে তারা তাদের নারীদের প্রতি ও অপরাধের বিলাসিতার প্রতি মানুষকে আকর্ষণ করে। তাদের কাছে যে ইঞ্জীল পঠিত হয় মানুষ এর আকর্ষণে যায় না বরং বিয়ের সুবাদে লক্ষ ঘোতুক বা সহজলভ্য সম্পদের লোভে যায় আর লুটেরাদের মত তা কুক্ষিগত করে। তারা ইঞ্জীল ও দয়ালু খোদার সন্তুষ্টির জন্য শ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয় না বরং তারা জাগতিক ভোগবিলাসিতা ও সম্পদশালী হবার উদ্দেশ্যে শ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হতে আগ্রহী। এভাবে পাত্রীরা ভুষিতার প্রচার করছে, ভুষিতার জালকে সর্বত্র প্রসারিত করছে এবং সব দিক থেকে এতে প্রবেশ করার পথ খোলা রেখেছে। তারা উভয় প্রকার গহ্বরের ক্ষুধা নিবারণের নিমিত্তে উপকরণ প্রস্তুত করে ক্ষুধার্তদের আমন্ত্রণ জানায়। সুতরাং যখনই কারো বিয়ের সুযোগ আসে বা তাকে নগদ অর্থ দেয়া হয় এবং তারা যদি তাকে জীবিকার অভাব থেকে মুক্তি দিয়ে দেয় তাহলে তাদেরকেই সে সবকিছু মনে করে।

তাদের ফাঁদ এবং প্রতারণার জাল এমনই। একারণেই এক শ্রেণীর অলস মানুষ যারা পানাহার আর আমোদ-প্রমোদ ছাড়া কিছু বুঝে না তাদের দ্বারে ধর্ণা দেয়। মদ পান, সুন্দরী রমণী আর সুস্থাদু খাবার ছাড়া অন্য কোন দিকে তাদের কোন আকর্ষণ নেই। অতএব তারা আয়তলোচন নারীর সামৃদ্ধ্য ও আর্থিক প্রাচুর্যের মাঝে বিলাসিতাপূর্ণ জীবন যাপন করে। এক কথায় প্রিস্টান পান্ত্রীরা সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টার কোন ভূটি করে না আর তাদেরকে পুরস্কৃত করে যারা পশ্চ-পর্যায়ের মানুষ। তাদেরকে অবিরত দিতেই থাকে এবং সম্মানের বিরল আসনে তাদেরকে আসীন করে। তুমি তাদেরকে ইহজগতিক অস্থায়ী ধনসম্পদের প্রতি এমনভাবে আসক্ত দেখতে পাবে যেন তারা পান্ত্রীদের অধীনস্থ উট বা ভেড়ার এক বিরাট পাল। অতএব সাব্যস্ত হলো, এরাই প্রতিশ্রূত দাঙ্গাল। সুতরাং এই পরিত্যাজ্যকে তোমার সন্তুর অঙ্গীকার করা উচিত। নিচয় এ দিনগুলো চরম অন্ধকারের যুগ যা কিয়ামতসম দৃশ্যের অবতারণা করছে। নিচয় আমরা ফিতনার এ কালো রাত্তিতে প্রবেশ করেছি আর হিতাহিত কান্ত-জ্ঞানহীন অবস্থায় এ বন্যায় হাবুড়ুর খাচ্ছি। আমাদের অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছানোর পথে এমন কিছু রাস্তা আছে যাতে অভিষ্ঠ পথপ্রদর্শকও হারিয়ে যায় আর দক্ষ মানুষও দিশা হারিয়ে ফেলে। এ কঠিন দিন আমাদেরকে ভীত ও অস্ত করে রেখেছে। আমাদের যা আশঙ্কা হিল আমরা তা-ই হতে দেখেছি। ভীত-সন্ত্বষ্ট হদয়ে সাহস যোগানো আর ক্লান্তপরিশ্রান্ত দুর্বল উটকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের বিশ্বপ্রতিপালক-প্রভু ছাড়া আর কেউ নেই।

মানুষ ধরংসের দ্বারপ্রাণ্তে উপনীত আর দৃঢ়িখ ও আক্ষেপে তাদের মন ভারাক্রান্ত। তারা অতীতের সব সমস্যা এবং অত্যাসন্ন সব বিপদগদকে ভুলে বসে আছে। তারা বৃষ্টিবাহী সুবাতাসের আশা করে ঠিকই কিন্তু নোংরা বিশুষ্মলা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। অতএব এর চেয়ে বড় আর কোন বিপদকে দাঙ্গাল আখ্যায়িত করা যেতে পারে? লক্ষণাবলী প্রকাশ পেয়ে গেছে আর বিপদাবলীও স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমরা সেই গাধা দেখেছি যার ওপর তর করে তারা বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে আর সে গাধা নিজ খুরের জোরে অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দেয়। দৃষ্টিবান মানুষ জানেন, সে বছরের পথ মাসে আর মাসের পথ একদিনে বা দু'দিনে অতিক্রম করে যা ভ্রমণকারীদেরকে আশ্চর্যাপ্নিত করে। এটি দ্রুত বেগে পথ অতিক্রমকারী একটি বাহন যার সাথে কোন যান বা অন্য কোন বাহন প্রতিযোগিতা করতে পারে না। এর জন্য রাস্তাঘাটের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে আর তার আবির্ভাবের মাধ্যমে সময়ের ব্যবধান করে গেছে। গর্ভবতী উটনীকে নিষ্কর্ম্ম ছেড়ে দেয়া হয়েছে। পুস্তকাদি অজস্র ধারায় প্রকাশিত হয়েছে*। পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ

* টাকা: তোমার জানা উচিত, তুরআন শরীফ ভবিষ্যতবাণী ও মহান ঘটনাবলীর আগাম সংবাদে পরিপূর্ণ যা মানুষকে প্রশান্তি ও দৃঢ় বিখাসের পানে পরিচালিত করে। এর মূল্যবান বাহন সব যুগে খোদার পথের পথিকদের আমন্ত্রণ জানায় আর এর ছেট একটি অংশও সব যুগে স্ফুর্ধার্তদের অস্তিক স্ফুর্ধ নিবারণের জন্য যথেষ্ট। এ এক পরিত্র বৃক্ষ যা সব ঝুতুতে ফল দেয় আর সে ফল সদা ফল সংগ্রহকারীদের নাগালের মধ্যে থাকে। এমন কোন যুগ নেই যে যুগে এটি ফলশূন্য থাকে। আঙ্গুরলতা যা ধেজুর বৃক্ষের ন্যায় এটা কখনও ফলশূন্য থাকে না বরং সব বিষয়ে

করা হয়েছে। সমুদ্রগুলোকে মিলিত করা হয়েছে এবং দূর-দূরান্তের মানুষের মেলামেশা আরঙ্গ হয়েছে। ধরাপৃষ্ঠকে যেন গুটিয়ে নেয়া হয়েছে আর এর প্রাণ্টগুলো যেন কাছে এসে গেছে। উট পরিত্যাক হয়েছে। একে দ্রুতগতির বাহন হিসেবে আর ব্যবহার করা হয় না। এটা দাজ্জালের সৃষ্টি হলেও আল্লাহ্ তাঁ'লা একে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সাঃ)-কে কাজে নিয়োজিত করেছেন আর এতে আপত্তির কিছু নেই। এ ধরনের বাহনগুলো দীর্ঘকাল থেকে চলছে। এগুলো ছাড়া অন্য কোন বাহন নেই। এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অনেক নির্দর্শন রয়েছে।

অতএব প্রমাণিত হলো, এটিই মাহ্দী ও যুগ মসীহুর আবির্ভাবের সময়, কেননা অষ্টতা সর্বত্র ছেয়ে গেছে এবং পৃথিবী অশাস্তিতে ভরে গেছে। বিভিন্ন প্রকার নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিয়েছে আর বিশ্বজ্ঞালাপরায়ণদের হট্টগোল অনেক বেড়ে গেছে। কুরআনে শেষ যুগের যেসব লক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এর প্রত্যেকটি চক্ষুমানদের জন্য প্রকাশিত হয়েছে।

যারা আরব বা পাশ্চাত্যের কোন দেশ থেকে মাহ্দীর আগমনের অপেক্ষা করছে তারা মন্তব্ধ ভুল করছে। তাদের চিন্তা সঠিক নয়, কেননা আরব দেশগুলো এমন যাকে আল্লাহ্ তাঁ'লা অশাস্তি, নৈরাজ্য ও যুগ-কাফেরদের সৃষ্টি সব বিশ্বজ্ঞালা থেকে নিরাপদ রেখেছেন। যে দেশে অষ্টতার বড় বয়ে যাচ্ছে সে দেশ ছাড়া অন্য কোথাও মাহ্দীর

সদা এর ফল স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে আর সব ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধা নিবারণ করে। এর সবচেয়ে বড় নির্দর্শন হলো মানবসত্ত্বারের জন্য কল্যাণকর বা ক্ষতিকর হতে পারে এমন কোন বিষয়কে এটি বাদ দেয়না। সত্যিকার অর্থে এতে বর্ণিত বিষয়গুলো অসাধারণ গুরুত্ব রাখে। দ্বিতীয়স্তরপ, আল্লাহ্ তাঁ'লা বলেন

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ امْرٍ حَكِيمٌ

সর্বজ্ঞানী খোদার পক্ষ থেকে এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে, লাইলাতুল কদরে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় তা সব মহিমা ও প্রতাপের অধিকারী খোদার গৃহ কুরআনে সিদ্ধিত আছে, কেননা তা লাইলাতুল কদরে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ সহকারে নামেল হয়েছে। মহাজ্ঞানী প্রভুর ইচ্ছায় এর মাধ্যমে রাতকে কল্যাণমতিত করা হয়েছে। অতএব এ রাতের যেসব আশ্চর্জনক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এর সরকিছুই এ কল্যাণগম্য কিংতু সূরা অবতরণের সুবাদে। সূত্রাং কুরআন এ বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে বড় ধারক ও বাহক। কেননা এটি এমন কল্যাণের প্রথম উৎসস্তু এর মাধ্যমেই রাতকে বিশ্ব জগতের প্রভুর পক্ষ থেকে কল্যাণমতিত করা হয়েছে, যে কারণে কুরআন নিজেকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যমতিত করে যা লাইলাতুল কদরে দেখা যায়; বরং লাইলাতুল কদর শশীকলাসম আর কুরআন পূর্ণস্তুল্য। এ সম্মান মুসলিমানদের জন্য কৃতজ্ঞতা ও গর্বের বিষয়।

আমি বহুবার মনোনিবেশ করেছি আর কুরআনকে সমুদ্রের ন্যায় বিশাল পেয়েছি। আল্লাহ্ তাঁ'লা বিভিন্নভাবে একে মাহাত্ম্য প্রদান করেছেন। বিরোধীদের কি হয়েছে যে তারা কুরআনকে সম্মান দিতে চায় না বরং এর মাহাত্ম্যকে চরম ধৃষ্টতার সাথে অধীক্ষার করে আর এর স্থলে এমন হাদীসের ওপর নির্ভর করে যা বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকেও নির্ভরযোগ্য নয়! তারা সন্দেহপূর্ণ কিছু কথার জন্য যাঁটি সত্য কথাকে পরিভ্যাগ করে আর বিশ্ব-প্রতিপালককে ভয় করে না। তাদেরকে যখন বলা হয়, এমন গ্রন্থের সিদ্ধান্তকে মেনে নাও যাকে আমরা ও তোমরা সমান দৃষ্টিতে দেখি, যেমন তোমরা অক্ষকার থেকে মুক্তি পেতে পারো আর তোমাদের চোখ খুলে। তারা বলে, আমরা পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে যা শুনেছি তা আমাদের জন্য যথেষ্ট; যদিও তাদের পিতৃপুরুষ ধর্মের নিগঁতু সতোর কোন জননৈ রাখতো না।

আমি সত্যিকার অর্থেই কুরআন সম্পর্কে ভেবেছি আর এতে প্রয়োজনীয় সব বিষয়ের উল্লেখ দেখতে পেয়েছি। সব বড় ও ছোট বিষয় এ সুস্পষ্ট কিংতু বেটার উল্লেখিত আছে। এতে বর্ণিত সর্বিষ্যদ্বাণীগুলোর একটি হলো, এটি শেষ

আগমনের আশা করা যেতে পারে না। মহাপ্রতাপাদ্ধিত খোদার স্থিতি এভাবেই চলে আসছে। আমরা জানি, ভারতবর্ষ বিভিন্ন প্রকার নৈরাজ্যের জন্য বিশেষভুল রাখে।

এখনে ধর্মত্যাগের দ্বার খুলে গেছে, সব ধরনের অনাচার, কদাচার, অন্যায় ও মিথ্যার বিস্তার ঘটেছে। সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই, এ দেশই মহা সম্মানিত ও শক্তিশালী খোদার সাহায্য লাভের এবং তাঁর পক্ষ থেকে মাহ্নীর আগমনের একান্ত মুখাপেক্ষী। আল্লাহর কসম! ভারতে যেরূপ বিশ্বজ্ঞলা দেখছি এর উদাহরণ আমরা অন্য কোথাও দেখতে পাই না। আর স্বীকৃতানন্দের সৃষ্টি এই নৈরাজ্যের মত অন্য কোন পরীক্ষার সম্মুখীনও আমরা হই নি। সহীহ হাদীসে আছে, দাজ্জাল প্রাচ্যের দেশ থেকে আবির্ভূত হবে। আর কুরআনও স্পষ্ট লক্ষণাবলীর আলোকে সে দিকে ইঙ্গিত করে। সুতরাং আমাদের জন্য এসব প্রমাণিত ও স্পষ্ট লক্ষণাবলীর আলোকে সিদ্ধান্ত নেয়া আবশ্যিক আর আমরা অস্বীকারকারীদের না মানার প্রতি জরুরী করি না।

যারা মক্কা বা মদীনায় মাহ্নীর আগমনের অপেক্ষা করে তারা স্পষ্ট ভাস্তিতে নিপত্তি। এমনটি হওয়া অসম্ভব। কেননা আল্লাহ তাঁ'লা স্বয়ং তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়ায় এ কল্যাণমণ্ডিত ভূমির নিরাপত্তা বিধান করেছেন। দাজ্জালের ত্রাস সেখানে প্রবেশ করবে না। সেখানকার অধিবাসীরা এ ফিতনার গন্ধও পাবে না। সুতরাং যে দেশে দাজ্জাল আবির্ভূত হয় সে দেশের অধিবাসীরাই সর্বশক্তির আধার খোদার দয়ার অধিক যোগ্য। আর যার অবতরণের কথা তাঁর স্বর্গীয় জ্যোতির সাথে সেভাবে প্রেরিত হওয়া

যুগে পুনৰ্কান্দির ব্যাপক প্রকাশের সংবাদ দিয়েছে আর বিষয়টি এযুগে ঠিক এভাবেই প্রতীয়মান হয়েছে। এ যুগে এমন কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যা হারিয়ে শিয়েছিল ব্রহ্ম করবন্ধু ছিল, কিন্তু এর আধিক্য এখন দর্শকদের আচর্যাদ্বীপ করে। প্রকাশনা ও ছাপার সব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। এ কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করতেই হবে। এ বিষয়ে তোমার যদি সন্দেহ থাকে তাহলে পূর্ববর্তীদের ইতিহাস থেকে এর কোন উদাহরণ উপস্থাপন কর।

সর্বজ্ঞানী ও কাহার খোদা-প্রদত্ত সংবাদগুলোর একাশে হলো, গর্ভবতী উত্তের বেকার হওয়া, সমুদ্র বিদ্যুৎ হওয়া এবং বিভিন্ন দেশের নিলিপি হওয়া। অতএব যেতাবে তিনি সংবাদ দিয়েছেন সেভাবেই তা পূর্ণতা লাভ করেছে। সুতরাং মহা কল্যাণের অধিকারী সে সঙ্গ, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য সম্পর্কে সম্মত অবগত। তিনি এমন এক বিশ্বাসী জাতির সংবাদ দিয়েছেন যারা সব সীমা লঙ্ঘন করবে এবং চরম উচ্ছিত্য প্রদর্শন করবে। তারা পৃথিবীতে ধর্মসামাজিক নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে। সুতরাং আমরা এমন জাতিকে স্বচক্ষে দেখেছি। আমরা দেখেছি, তাদের সীমালঙ্ঘন ও প্রাধান্য পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে সর্বত্র বিস্তৃত লাভ করেছে। আকাশসমৃহ তাদের অনাচারে বিদীর্ঘ হতে চায়। তারা মিথ্যার মাধ্যমে সত্যকে ঘোলাটে করেছে আসলে এরাই দাজ্জাল জাতি। এরা মানুষকে বিভাগ করার মানসে কোমল স্বরে কথা বলা, প্রলোভন দিয়ে এবং ঝোঁ গ্রহে অবৈধ প্রক্ষেপণকে ফাঁস হিসেবে অবলম্বন করেছে। প্রতারকের ন্যায় মানবজাতির একটি বিবাট অংশকে এরা এ ত্রিভূবাদের মাধ্যমে ধ্বনি করেছে। যে ব্যক্তি এদের নোত্বা ধরবলে পথ অনুসরণ করবে তার জন্য এ ত্রিভূবাদের অনুসরণ আবশ্যিক। এরা কিছু মানুষকে প্রতারণামূলক নমনীয়তার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রলোভন দিয়ে ধর্মস করে আর অন্য কিছু মানুষকে ধর্মস করে এশী গ্রহে অন্যান্য হস্তক্ষেপের মাধ্যমে, যা আলোর শক্তি। এভাবে জেনেভানে এরা সৃষ্টিকে পথভ্রষ্ট করে। পিতা, পুত্র ও পুরিত আত্মার দুর্বৈধ কথা এদের কোন কাজে লাগে নি। এটি একটি কথার কথা মাত্র। কিন্তু এ ত্রিভূবাদ (অর্থাৎ কৃতিম নমনীয়তা, প্রলুক্করণ ও ঝোঁ কিতাবে পরিবর্তন) এদের কাজে লেগেছে। এর ফলে এরা নোংরা ও অপবিত্র শার্থসিদ্ধিতে সফল হয়েছে। আমি আশৰ্য হই, যেখনে এরা অহংকারের সাথে সব উচ্চতা অতিক্রম করেছে সেখানে এরা কিভাবে পরিত্ব আত্মার সাহায্য পেতে পারে? সব কিছুর জন্য একটি সময় নির্ধারিত আছে। সুতরাং যখন নির্ধারিত সময় আসবে যত্যন্ত্রকারীদের যত্যন্ত্র কোন কাজে লাগবে না আর সত্যবাদীদের মুখোযুধি হবারও এদের কোন শক্তি থাকবে না।

উচিত যেভাবে দাঙ্গাল পার্থির শক্তি নিয়ে শয়তানের মত আবির্ভূত হয়েছে। মাহনীর গুহায় লুকিয়ে থাকা সম্পর্কে যা বলা হয়, চক্ষুমানদের মতে এরও কোন ভিত্তি নেই। এটি এদের ঠিক তেমনই একটি কথা যেভাবে বলা হয়ে থাকে, ‘ঈসা মারা যান নি, তাঁকে সশরীরে আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর দাঙ্গালের আবির্ভাবের সময় তিনি আসবেন!’ অর্থচ কুরআন সুস্পষ্টভাবে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দেয়।

সত্যিকার অর্থে ঈসা ও ইমাম মোহাম্মদ (ইবনে হাসান আসকারী) উভয়ের দেহ বিছেদ ঘটেছে আর তাঁদের প্রভু তাঁদেরকে মৃত্যু দিয়েছেন এবং পুণ্যবানদের সাথে তাঁদেরকে মিলিত করেছেন। আল্লাহু কোন বান্দাকে অস্বাভাবিক বয়স দেন নি আর তাদের স্বাই নশ্বর ছিলেন। যেসব বর্ণনায় মসীহুর জীবিত থাকার উল্লেখ আছে, তা পড়ে তুমি অভিভূত হয়ো না। আর যেসব উক্তিতে ইমামের জীবিত থাকার কথা আছে সেগুলো স্পষ্ট হলেও এর প্রতি কর্ণপাত করো না। সেগুলো ঝুক কথা মাত্র। এতে বিচক্ষণ লোকদের জন্য ইশারা-ইঙ্গিতে বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এ রহস্য উম্মোচনকারী উক্তি এবং পর্দা অপসারণকারী শ্রেষ্ঠবাণী হলো, আল্লাহুর একটি আদি রীতি ও একটি চলমান নিয়ম রয়েছে। কখনও কখনও শক্রদের মুখ বক্ষ করতে, বক্ষদের শুভ সংবাদ দিতে আর আপন খোদাভীরুল বান্দাদেরকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে তিনি মৃত পুণ্যবানদের জীবিত আখ্যা দিয়ে থাকেন। যেভাবে আল্লাহু শহীদদের সম্পর্কে বলেন, ‘তোমরা তাদের মৃত বলবে না বরং তারা জীবিত’। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে, কাফেররা মুমিনদের হত্যা করে আনন্দিত হয় এবং তারা বলে, আমরা তাদের হত্যা করেছি আর আমরাই জয়যুক্ত হয়েছি। একইভাবে, বিশ্বপ্রতিপালকের পথে নিহত হওয়া সন্দেশে কিছু মুসলমান তাদের ভাই, বক্ষ, পিতা ও সন্তানদের মৃত্যুতে ব্যথিত হন। আল্লাহু শহীদদের জীবনের কথা উল্লেখ করে লাঞ্ছিত কাফেরদের মুখ বক্ষ করেন এবং দৃঢ়খ্যাত মুমিনদের শুভসংবাদ দেন, তাদের প্রিয়জন জীবিত, তাঁরা মারা যান নি আর মরতে পারেন না। তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে তিনি বলেন নি যে, তাদের জীবন আধ্যাত্মিক জীবন বা ইহলোকবাসীদের জীবনের মত নয়; বরং সে অজানা জীবনকে তাঁর

عند رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

ইন্দা রাবিহিম ইউরায়াকুন (আলে ইমরান: ১৭০) (অর্থঃ তাঁদেরকে তাঁদের প্রভুর সম্পর্কে রিয়কদেয়া বা) উক্তির মাধ্যমে সুনিশ্চিত জীবন আখ্যা দেন এবং কাফেরদের দাবী খতন করেন।

ঈসা মারা যান নি এ কথা শুনে তোমার আশ্চর্য হবার কি আছে? এ ধরনের কথা সেসব লোকদের জন্যও ব্যবহার হয়েছে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন। এটি সর্বসম্মত বিষয় যে তারা [অর্থাৎ শহীদরা- অনুবাদক] মারা গেছেন, রক্ত ঝারিয়ে তাঁদের হত্যা করা হয়েছে আর তারা নিঃশব্দেহে মাটিতে সমাহিত আছেন। মহাসম্মানিত খোদার গ্রন্থে যে

শহীদদের জীবনের কথা উল্লেখ আছে তা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়, অথচ তাঁদের মৃত্যুর ঘটনা যে সঠিক সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং ঈসার জীবনের এমন বাড়তি কি প্রের্তৃ বা বিশেষত্ব আছে? অধিকস্তু কুরআনও তাঁকে মৃত আধ্যা দিচ্ছে! অতএব ভেবে দেখ, কেননা বিচার দিবসে সব বিশ্বাসঘাতকতা ও কপটতা সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে। সেদিন মিথ্যাবাদীরা তাদের হঠকারিতা, অবজ্ঞা ও উপেক্ষার জন্য অনুশোচনা করবে। কিন্তু সময় পেরিয়ে যাবার পর অনুভূত হয়ে লাভ নেই। আল্লাহর আগুন সেদিন মিথ্যাবাদীদের হাদয়ে আঘাত হানবে। সুতরাং মিথ্যাবাদীদের জন্য ধৰ্মস, যারা সীমালঞ্চন করা থেকে বিরত হয় না, বরং তারা প্রতিদিন প্রতিনিয়তই সীমালঞ্চন করছে। তুমি যদি যাচাই বাছাই না করে অঙ্গের মত সমস্ত দুর্বল কান-কথার অনুসরণ করতে থাকো তাহলে তোমার বিশ্বাসঘাতকতাকে প্রমাণ করার জন্য এটিই যথেষ্ট। একই সাথে একথা সাব্যস্ত হবে, তুমি অঙ্গতা থেকে নিজের হৃদয়কে পবিত্র কর না, কৃত্বস্তির পূজারী ও ফিতনাপ্রিয় লোকদের ন্যায় বাহ্যিক চাকচিকেয়র অনুসারী এবং পবিত্র সোকদের ন্যায় তুমি সুগন্ধির সম্মান কর না।

তুমি জানো মৃতের জন্য ‘আহহিয়া’ আর জীবিত ব্যক্তির জন্য ‘আমওয়াত’ শব্দের ব্যবহার কুরআনের সূরা এবং দ্যুর্ঘাতান আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। যারা কুরআনের জ্ঞান রাখে এবং কুরআনকে চিন্তাশীলদের মত পাঠ করে আর দরজা খোলার মানসে তাঁর (অর্থাৎ খোদার) দ্বারের কড়া নাড়ে এমন অনুসন্ধানীদের এটি অজানা নয়। সুতরাং সেই রাত যা এক শ্রেণীর আলেমের জন্য তমসাচ্ছ্রম, তা তোমার জন্য এ সমুজ্জ্বল সত্যের মাধ্যমে আলোকিত হবে। পরিতাপ, যেসব আলেম প্রথমে সোজা-সরল পথে ছিল, তারা একপর্যায়ে বক্তব্য অবলম্বন করেছে!

তুমি হয়তো এ বর্ণনার পরে বলতে পারো, তত্ত্বজ্ঞানীদের মত ‘জীবনের’ স্বরূপ আমিও বুঝলাম কিন্তু ‘নুয়ুল’ বা ‘অবতরণ’ শব্দের এমন কি যুক্তিযুক্ত অর্থ আছে যা হৃদয়কে প্রশান্ত করতে পারে? তোমার জানা প্রয়োজন, এটি এমন একটি শব্দ কুরআনে যার বহুল ব্যবহার রয়েছে। প্রশংসিত খোদা কুরআনের বিভিন্নস্থানে উল্লেখ করেছেন, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বস্তু আকাশ থেকেই নাযেল হয়। প্রত্যেক বস্তু স্থীয় উৎকর্ষ মহিমাপূর্ণ খোদার নির্দেশে ওপর থেকেই প্রাণ হয়। তুমি সে বস্তুকে গ্রহণ করে যাকে উর্দ্ধোলোক প্রেরণ করে। আর প্রকৃতি সে রঙ ধারণ করে যা ওপর থেকে দেয়া হয় আর এভাবেই কোন আত্মাকে সৌভাগ্যবান বা দুর্ভাগ্য ও সত্যবিচ্ছুত সাব্যস্ত করা হয়। পুণ্যবান ও পাপী উভয় শ্রেণীর মাঝে কিছু সংখ্যক মানুষ কিছু সংখ্যক মানুষের সাথে সাদৃশ্য রাখে আর প্রতিনিয়ত তাদের সামঞ্জস্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তাদেরকে একই জিনিষ মনে হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরের এটিই চলমান রীতি। আর তাঁর নিজ উক্তি ‘তাশাবাহাত কুলুবলুম’-এর মাধ্যমে মহাসম্মানিত ও প্রতাপাপ্রিত খোদা সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। সুতরাং যাকে চিন্তাশক্তি দেয়া হয়েছে তার ভেবে দেখা উচিত।

কখনো কখনো সর্বমহান ও সর্বশক্তিমান খোদার ইচ্ছায় এ সাদৃশ্যের সাথে আরো একটি বিষয় যোগ হয়। তা হলো, অনেক সময় কোন নবীর উম্মত মারাত্মকভাবে বিগড়ে যায় এবং ধর্ম ত্যাগের পথ বেছে নেয়। আল্লাহু তা'লার প্রজ্ঞ তাদেরকে শান্তি দিতে বা ধর্মস্বরূপ করতে চায় না বরং তাদেরকে সত্যের প্রতি আহ্বান করতে ও তাদের প্রতি করুণা বর্ণণ করতে চায়, কেননা তিনি পরম দয়ালু খোদা। তখন আল্লাহু তা'লা সে মৃত নবীর চোখ খুলে দেন যাকে সে জাতির প্রতি ইতোপূর্বে প্রেরণ করা হয়েছিল। ঘূম থেকে জাগ্রত ব্যক্তির ন্যায় তিনি তাদের দিকে তাকান। তিনি তাদের মাঝে অন্যায়, মারাত্মক বিশৃঙ্খলা, সীমালংঘন, ধর্মস্বরূপ ভ্রষ্টতা লক্ষ্য করেন। এবং তাদের হৃদয় অত্যাচার, মিথ্যা এবং ব্যাধি ও অপকর্মে তরে গেছে বলে প্রত্যক্ষ করেন। ফলে তাঁর চিন্ত ব্যাকুল হয়ে যায়, হৃদয় উদ্বেলিত হয় এবং তাঁর আত্মা বিচলিত ও অস্থির হয়ে যায়। সৎস্মোধনের উদ্দেশ্যে এবং যুক্তির মাধ্যমে জাতির মুখ বক্ষ করার জন্য তাঁর পৃথিবীতে আসতে ইচ্ছা হয় কিন্তু আসার কোন উপায় থাকে না। তখন ঐশ্বী পরিকল্পনা তাঁর অনুকূলে কাজ করে আর তাঁকে সফলকাম লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহু তাঁর একজন মসীল বা প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করেন, যার হৃদয় তাঁর হৃদয়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, যার বৈশিষ্ট্যের সাথে তাঁর মূল বৈশিষ্ট্যের মিল থাকে। যাঁর মসীল বা প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করা হয় তাঁর ইচ্ছা ও চাওয়া এ মসীলের উপর নায়েল হয়। এ ব্যবস্থার কারণে যাঁর মসীল বা প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করা হয় তিনি আনন্দিত হন আর মনে করেন, তিনি যেন নিজেই এসেছেন।

তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তিনি নিজেই জাতির মাঝে আবির্ভূত হয়েছেন এবং লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছেন। তাঁর আর কোন দুঃখ থাকে না এবং তিনি আনন্দিত হন।

এটিই ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের রহস্য যে সম্পর্কে তারা মতভেদে করে। আল্লাহু তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন, তারা এ রহস্যকে বুঝে না আর জানতেও চায় না। যে ব্যক্তি বিদ্বেষের কলুষমুক্ত এবং অনুসন্ধানের জ্যোতিতে আলোকিত তার এ রহস্য সম্পর্কে কোন সন্দেহ অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। সে সন্দেহশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এরা এমন এক শ্রেণীর মানুষ যাঁরা ইতেকাল করেছেন, গত হয়েছেন এবং অতীত হয়েছেন। সুতরাং তাঁরা আর পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না। নিজেদের প্রথম মৃত্যুর পর তাঁরা আর কখনও মরবেন না। তুমি কিতাব ও সুন্নতকে এ ব্যাখ্যার স্বপক্ষে সাক্ষী হিসেবে দেখতে পাবে যদি তোমার সত্যানুসন্ধান, গভীর অভিনিবেশ ও ন্যায়পরায়নের ন্যায় পক্ষপাতমুক্ত ইনসাফের দৃষ্টি থাকে।

আল্লাহর মনোনীত নবী (সাঃ)-এর বক্তব্য কিছু ‘আসারে’ উল্লেখ আছে। তিনি বলেছেন: পৃথিবীর বয়সের যদি একটি দিনও অবশিষ্ট থাকে আল্লাহু তা'লা সেদিনকে দীর্ঘায়িত করবেন আর আমার অনুসারীদের বা আমার আহুলে বাইতের মধ্য থেকে একজনকে আবির্ভূত করবেন, যাকে আমার নাম দেয়া হবে। তাঁর পিতার নাম আমার পিতার নাম হবে। আরু দাউদ এ হাদীসটি সংকলন করেছেন। তিনি মুহাদ্দেসদের ইমাম

ছিলেন। তাঁর উক্তি “মিহী” (আমার অনুসারীদের মধ্য থেকে) এবং “তাঁর নাম আমার নাম”-এর মাঝে আমরা যে কথা লিখেছি এর দিকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। তুমি যদি চাও, তোমার সামনে সে প্রচল্লিত রহস্য উন্মোচিত হোক তা হলে অত্যাচারীদের মত চোখ বন্ধ করে চলে যেও না। যে আলোর সঙ্গানে আছে তাঁর মত চিন্তা করো। দু’জনের নামের মিল সম্পর্কে স্মরণ রেখো, তা আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য প্রকাশক, দৈহিক বা নশ্বর কোন সামঞ্জস্য নয়। দেখ! আল্লাহর খাতায় প্রত্যেক ব্যক্তির একটি নাম থাকে। সে ততক্ষণ মারা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নামের রহস্য অর্থাৎ সে ভাল কি মন্দ কি ভ্রষ্ট তা স্পষ্ট হয়ে না যায়। অনেক সময় নামের বাহ্যিক মিলও থাকতে পারে যেমন মুহাম্মদ ও আহমদ। কিন্তু আমরা যা বুঝেছি তা বেশি সঠিক এবং সুবিদিত, কেননা এই যে মিল তা দু’নামের আধ্যাত্মিক মিল যা দৃষ্টিসম্পর্ক তত্ত্বজ্ঞানীদের অজানা নয়। এ সম্পর্কে আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তা আমি আমার বই ‘বারাহীন’-এ উল্লেখ করেছি। আর তা হলো, আমাকে উদ্দেশ্য করে আমার প্রভুর এ সম্মোধন যে, “ইয়া আহমদু ইউতিমু ইসমুকা ওয়া লা ইউতিমু ইসমি” (হে আহমদ! তোমার নাম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে কিন্তু আমার নাম কখনও ফুরাবে না)। সুতরাং এটিই সে নাম যা আধ্যাত্মিক জগতের লোকদের দেয়া হয়ে থাকে, এর প্রতি তাঁর উক্তি

وَعَلِمَ آدَمَ الْأَسْنَاءَ كُلَّهَا

‘ওয়া আল্লামা আদামাল আসমাআ কুলাহা’তে ইঙ্গিত রয়েছে; অর্থাৎ তাঁকে সব বন্ধনের তত্ত্ব শিখিয়েছেন এবং বিশ্বজগৎ সদৃশ ক্ষুদ্রে বিশ্ব বানিয়েছেন।

মহানবী (সাঃ)-এর হাদীসে যে দু’জনের পিতার নামের সামঞ্জস্যের কথা রয়েছে তা আসলে খাতামান্ নবীঈন (সাঃ)-এর দু’টো নিগঢ় রহস্যের সাথে সামঞ্জস্যের প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত। আমাদের নবী (সাঃ)-এর পিতা ঐশী জ্যোতি গ্রহণের সব সামর্থ্য রাখতেন, কিন্তু তিনি এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। আমাদের নবী (সাঃ)-এর জ্যোতি তাঁর প্রকৃতিতে তরঙ্গায়িত ছিল, কিন্তু তাঁর অবয়বে তা প্রকাশ পায় নি। এ রহস্যের শেষে আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি অবশ্য অজানা লোকের মতই চলে গেছেন। প্রতিশ্রূত মাহুদীর পিতার মহানবী (সাঃ)-এর পিতার সাথে এটিই সামঞ্জস্য। সুতরাং তুমি তড়িঘড়ি করে অবজ্ঞাকারীদের মত আচরণ করো না।

আমি মনে করি, নবী (সাঃ)-এর আহলে বাইতের মধ্য থেকে কোন ইমামের প্রতি মহা সম্মানিত খোদার পক্ষ থেকে ইলহাম হয়েছিল, ইমাম মোহাম্মদ গুহায় আত্মগোপন করেছেন এবং শেষ যুগে অবিশ্বাসীদের বধ করা এবং উম্মত ও ধর্মের নামকে সম্মুল্লত করার জন্য তিনি পুনরায় আবির্ভূত হবেন। এ ধারণাটি মসীহুর আকাশে আরোহণ এবং ভয়াবহ অশান্তির যুগে তাঁর অবতরণের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে রহস্য যা এ বিশ্বের স্বরূপকে স্পষ্ট করবে তা হলো, এ শব্দগুলো এবং অনুরূপ শব্দ রূপক অর্থে ইলহাম প্রাঙ্গনের ভাষায় সব সময় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এগুলো সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ।

সেই কবর যা এ পৃথিবী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পুণ্যবানদের ঠাই হবে সেটাকে গুহা হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকৃতি ও গুণের দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন ব্যক্তির আগমনকে স্বয়ং গুহায় লুকায়িত ইমামের আগমন আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সবকিছু রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এ ধরনের বাগধারা আল্লাহর বাণীতে বহুল ব্যবহৃত ও সুপরিচিত বিষয়। এটা তত্ত্বজ্ঞানীদের অজানা নয়।

তুমি কি জানো না কিভাবে আল্লাহ তালা খাতামান নবীঈন (সাঃ)-এর যুগের ইহুদীদের ভর্তসনা করেছেন এবং তাদের সমোধন করে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْشَمْ تَنْظُرُونَ
وَإِذْ وَاعْدَنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَخْدَثْنَاهُ الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْشَمْ طَالِمُونَ
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعْلَكُمْ تَهْتَدُونَ
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ إِنِّي كُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِأَنَّهُ أَخَذَ كُمُ الْعَجْلَ فَتُوْبُوا
إِلَى بَارِئِكُمْ فَأَفْتَلُوْا أَنفُسَكُمْ دَلِيلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ قَاتَبَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ
هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ
وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَى لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهُ جَهَرًا فَأَخْدَثْنَاهُ الصَّاعِدَةَ
وَأَنْشَمْ تَنْظُرُونَ
ثُمَّ بَعْثَنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ
وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلَوِيْ
كَلَوْا مِنْ طَيَّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمْوْنَا وَلِكُنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

(সূরা বাকারাঃ : ৫১-৫৮)

কুরআন শরীফে একথাই বর্ণিত হয়েছে আর আল্লাহর কিতাব ‘কুরকানে’ তোমরা তা পাঠ কর। কিন্তু এর যদি আক্ষরিক অর্থ করা হয় তাহলে তা আসল ঘটনার পরিপন্থী দেখাবে। এটি এমন একটি বিষয় যে সম্পর্কে কোন মতান্তর নেই। আল্লাহ তালা আমাদের নবী (সাঃ)-এর সমসাময়িক ইহুদীদের জন্য কোন সমুদ্রকে বিভক্ত করেন নি, সেসব দুর্ভুতকারীদের সামনে ফেরুআউনের লোকজনকে নিয়মিতও করেন নি আর এমন বিপদের সময় এরা সেখানে আদৌ উপস্থিত ছিল না। বাচুরকে এরা উপাস্য

হিসেবে অবলম্বন করে নি আর এরা সে যুগে উপস্থিতই ছিল না । অধিকন্তে এরা এ কথাও
বলে নি,

يَا مُوسَى لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَى الَّهَ جَهَنَّمَ

ইয়া মুসা লান নু'মিনা লাকা হাত্তা নারাল্লাহা জাহরাহ অর্থাৎ আমরা আল্লাহকে
প্রকাশ্যে না দেখা পর্যন্ত তোমার প্রতি আদৌ ঈমান আনবো না । বরং মুসার যুগে এদের
কোন চিহ্ন বা কোন উল্লেখই ছিল না বরং এদের কোন অস্তিত্বই ছিল না । অতএব
বিদ্যুতের গর্জন তাদেরকে কোন অর্থে ধৃত করলো? মৃত্যুর পর তারা কিভাবে উথিত
হলো? কিভাবে তারা সম্মুদ্র দ্বিখণ্ডিত করলো? আর মেঘমালা দিয়ে আল্লাহ কিভাবে
তাদের উপর ছায়া করলেন? তারা কখন ‘মাল্লা’ ও ‘সাল্লওয়া’ খেলো এবং তাদেরকে
কোন অর্থে সমস্যা থেকে মুক্তি দিলেন? কেননা, তাদের কোন অস্তিত্বই তখন ছিল না
বরং তারা বহু শতাব্দী পর সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে জন্ম নিয়েছে ।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرًا أَخْرَى

আল্লাহ তাল্লা এক ব্যক্তির অপরাধের জন্য অন্য ব্যক্তিকে শান্তি দেন না । তিনি
সবচেয়ে বড় সুবিচারক । সুতরাং এর অন্তর্নিহিত রহস্য হলো, মত ও পথের সাদৃশ্যের
কারণে আল্লাহতালা এদেরকে এদের পিতৃপুরুষের স্থলাভিষিক্ত করেছেন আর এদেরকে
এদের পূর্ববর্তীদের নামে নামকরণ করেছেন এবং এদেরকে তাদের বৈশিষ্ট্যের
উত্তরাধিকারী করেছেন । বিশ্বপ্রতিপালকের রীতি এটিই ।

তুমি যদি অজ্ঞদের মত ঈসার অবতরণের অর্থ তাঁর আক্ষরিক অর্থে আসা কর,
তাহলে বিষয়টা তোমার জন্য কঠিন হয়ে যাবে এবং তুমি পথ নির্ধারণে বড় ভুল করবে ।
কেননা কুরআনের আয়াত থেকে ঈসার মৃত্যু প্রমাণিত আর বিশ্ব-রসূল (সাঃ)-এর
তফসীরের আলোকে ‘তাওয়াফ্ফীর’ অর্থ সুস্পষ্ট । এখানে একথার অন্য ব্যাখ্যার কোন
অবকাশ নেই । অতএব খাতামান নবীস্তে (সাঃ) ‘ন্যূল’ শব্দের এমন কোন অর্থ করেন
নি যা নিশ্চিত বা একমাত্র অর্থ সাব্যস্ত হতে পারে, বরং কুরআনে ও শ্রেষ্ঠ রসূলের
‘আসারে’ তা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । সুতরাং এটি ‘তাওয়াফ্ফী’ শব্দের বিপক্ষে
কিভাবে যেতে পারে? কেননা এর অর্থ নবী (সাঃ) ও ইবনে আবাসের উক্তির আলোকে
স্পষ্ট হয়ে গেছে আর তা মৃত্যু দেয়া ছাড়া অন্য কিছু নয় । মু'মেনদের দৃষ্টিতে এ অর্থে
সন্দেহের কোন অবকাশ নেই । মুতাশাবেহাত (এমন সব আয়াত যেগুলোর অর্থ ব্যাখ্যা
সাপেক্ষ-অনুবাদক) এবং মুহকামাত (তথা সুস্পষ্ট আয়াত) কি সমান হতে পারে?
কখনো নয়, এগুলো সমান হতেই পারে না । যার হৃদয়ে ব্যাধি আছে এবং যে পরিত্রাতা
অর্জন করে নি সে ছাড়া অন্য কেউ ‘মুতাশাবেহাতের’ অঙ্ক অনুকরণ করে না । সুতরাং
‘তাওয়াফ্ফী’ একটি দ্ব্যর্থহীন শব্দ যার অর্থ সুস্পষ্ট ও সুবিদিত আর তা মৃত্যু দেয়া ছাড়া
অন্য কিছু নয় । পক্ষান্তরে, ‘ন্যূল’ শব্দটি মুতাশাবেহ বা দ্ব্যর্থবোধক ।

মহানবী (সা:) -এর ব্যাখ্যা করা আবশ্যিক মনে করেন নি বরং মুসাফেরদের জন্যও তিনি এটা ব্যবহার করেছেন। তবুও যদি মহানবী (সা:) -এর হাদীসে শেষ যুগের মুজাদ্দের স্টোর নামে উল্লেখ তোমার বুঝতে অসুবিধা হয় আর সাধারণ অর্থে ব্যবহার হবার কারণে তোমার মনে সন্দেহ জাগে তাহলে তোমার জানা উচিত, বড় বড় আলেমদের মতে প্রকৃতপক্ষে হাদীসে ‘ঈসা’ শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সহীহ বুখারী যে হাদীস উল্লেখ করেছে এবং আল্লামা যমখুশারী সে হাদীসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ “প্রত্যেক আদম সন্তানকে তার জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে শুধু মরিয়ম ও তাঁর পুত্র ঈসা ছাড়া”-এটা তোমার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। এটি

إِنْ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

(সূরা হিজর ৪ ৪৩)

(অনুবাদ : হে শয়তান! আমার প্রকৃত বান্দাদের ওপর তোমার কর্তৃত্ব থাকবে না।)

এই বাহ্যত আয়াত এবং অন্যান্য আয়াতের বিরোধী। তদনুযায়ী, যমখুশারী বলেন, এ হাদীসে ব্যবহৃত ‘ঈসা ও তাঁর মা’ শব্দের অর্থ হলো, প্রত্যেক তাকওয়াশীল যারা এ-দুইয়ের গুণে গুণান্বিত এবং যারা মুত্তাকী ও খোদাভীরু।

মজার বিষয় হলো, প্রত্যেক খোদাভীরুকে তিনি ঈসা নাম দিয়েছেন! এ সন্তোষে অস্থীকারকারীদের অবজ্ঞা দেখ! তুমি বল, ‘এ হাদীসের সাক্ষী শুধু একজন, একাধিক পুরুষ বা মহিলা সাক্ষী থাকা আবশ্যিক’ তাহলে শুন! অবশ্য তুমি শুনতে চাও বলে মনে হয় না। তুমি পুণ্যবান আলেম, ইমাম, মুহাদ্দেস, কামেল ফকীহ আবদুর রউফ মন্তোভি (রাহেমহাল্লাহ) কৃত ‘জামেউস সগীরে’র ব্যাখ্যা ‘আত্তাইসীর’ পড়। তিনি উল্লেখিত গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বলেন, এ হাদীসটিতে ঈসা ও তাঁর মা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো, ‘তারা উভয়েই এবং যারা তাঁদের গুণে গুণান্বিত’। সুতরাং তুমি গভীর দৃষ্টিতে দেখ, এ দু’টো সাধারণ নামের অর্থকে কত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তোমার কী হয়েছে, পবেষকদের কথা গ্রহণ করতে তোমার বাধা কোথায়?

তুমি শুনে থাকবে, ইমাম মালেক, ইবনে কাইয়েম, ইবনে তাইমিয়া ইমাম বোখারী এবং উম্মতের অগণিত বড় বড় ইমাম ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ঈসার মৃত্যুতে বিশ্বাসী ছিলেন, আর একই সাথে তাঁরা ঈসার অবতরণেও বিশ্বাস করতেন যার সংবাদ মহানবী (সা:) দিয়েছিলেন। কেউই এ দু’টো বিষয়কে অস্থীকার করেন নি, কোন উচ্চবাচ্য করেন নি বরং তাঁরা এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্বজগতের প্রভু খোদার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁরা এ নিয়ে বিতভায় লিঙ্ঘ হন নি, কিন্তু এরপর এমন কিছু অযোগ্য উন্নরসূরী ও অন্ত:সারশূণ্য হৃদয়ের মানুষ স্থলাভিষিক্ত হয় যারা বক্র ও অঙ্গ:সারশূণ্য প্রজন্ম, যারা না জেনে ঝগড়া করে, ভেদাভেদ সৃষ্টি করে, শান্তির পথ অবলম্বন না করে খোদার মুমিন বান্দাদের কাফের আখ্যা দেয়।

সুতরাং এখানে সারকথা হলো, আল্লাহ্ তাঁর আদি জ্ঞানের ভিত্তিতে জানতেন, শেষ যুগে শ্রীস্টান জাতি সত্য ধর্মের সঠিক পথের বিরোধিতা করবে এবং সম্মানিত প্রভুর

পথে বাঁধা সৃষ্টি করবে ও প্রকাশ্য মিথ্যাচার করবে। একই সাথে তিনি এটিও জানতেন, সে যুগে মুসলমানরা কুরআনের সুমহান শিক্ষাকে পরিত্যাগ করবে এবং তারা এমন সব বিপ্রাঙ্গিকর বিদ্যার অনুসরণ করবে যা কুরআন থেকে প্রমাণিত নয়। ধর্মের জন্য সহায়ক এবং মু'মিনদের ঈমানী পোষাকের সৌন্দর্য বর্ধনকারী বিষয়াবলীকে তারা পরিত্যাগ করবে। তারা বিদ্যাত, কুপ্রবৃত্তি ও দুর্জ্ঞতিপরায়ণতার ধৰ্মসাহায়ক গর্তে পতিত হবে। নিষ্ঠা, বিশ্বস্তা ও ধর্ম বলতে তাদের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তখন অনুগ্রহ ও করুণার নিদর্শনস্বরূপ তিনি এ যুগে দু'শ্রেণীর সীমালঙ্ঘনকারীদের সংশোধন ও মিথ্যাবাদীদের মুখ বঙ্গ করার জন্য এক ব্যক্তিকে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনার দাবী ছিল, প্রেরিত ব্যক্তির নাম ক্রীস্টানদের সংশোধনের নিরিখে 'ঈসা' আর মুসলমানদের তরবিয়তের নিরিখে 'আহমদ' রাখা, এবং তাঁকে উভয় দলের রীতি-নীতি ও পথঘাট ভালভাবে অবগত করা। অতএব তিনি তাঁকে উল্লেখিত দু'টো উপাধি দিয়েছেন এবং উভয় পানীয় থেকে পান করিয়েছেন আর তাঁকে মু'মিনদের দুঃখ বিমোচনকারী ও ক্রীস্টানদের সৃষ্টি নৈরাজ্য নির্মূলকারী নিযুক্ত করেছেন। অতএব খোদার দৃষ্টিতে একদিকে তিনি ঈসা এবং অপরদিকে আহমদ। সুতরাং তুমি বৈমাত্রে ভাইয়ের মত আচরণ পরিহার কর আর বিরোধিতা ও অন্যায়ের পথ এড়িয়ে চল, সত্যকে গ্রহণ কর আর কৃপণদের মত হয়ো না। নবী (সাঃ) যেখানে তাকে মসীহের গুণে শুণাশ্বিত আখ্যা দিয়েছেন বরং তাঁকে ঈসা নাম দিয়েছেন সেখানে তাকে তাঁর নিজ মহান সন্তান গুণে শুণাশ্বিত আখ্যায়িত করেছেন এবং মুস্তাফা সদ্গু 'আহমদ' নামে অভিহিত করেছেন। তোমার জানা উচিত, তিনি যে এ দু'টো নাম পেয়েছেন তা তাঁর দু'টো সম্প্রদায়ের প্রতি আন্তরিক সমবেদনাপূর্ণ দৃষ্টির কারণে।

সুতরাং ক্রীস্টান সম্প্রদায়ের সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি দেয়া ও বন্দীর প্রতি সহমর্মীতার ন্যায় তাদের খাতিরে ব্যথিত হবার কারণে স্বর্গের অধিপতি তাঁকে ঈসা নাম দিয়েছেন। অনন্তপ্রভাবে নবী (সাঃ)-এর উম্মতের জন্য তাঁর গভীর হীতাকাঙ্ক্ষিতার কারণে তাঁকে আহমদ নাম দিয়েছেন। তাদের ভয়াবহ মতভেদ এবং ঘৃণ্য জীবন দেখে তাঁর মর্মপীড়া আরও বেড়ে যায়। সুতরাং তোমার জেনে রাখা উচিত, প্রতিশ্রূত ঈসাই আহমদ আর প্রতিশ্রূত আহমদই ঈসা। এ সমজ্জ্বল রহস্যকে অবজ্ঞা করো না। তুমি কি অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা আর ক্রীস্টানদের হাতে যা ঘটেছে তা দেখছো না? তুমি কি দেখছো না, আমাদের জাতি ধর্মীয় সংস্কার ও ধর্মীয় শিক্ষাকে কল্যাণিত করেছে? শয়তানের পদাক অনুসরণ করতে করতে তাদের অধিকাংশের জ্ঞান জেনাকীর আলোর ন্যায় ক্ষীণ এবং তাদের আলেমরা মরহুমির মরীচিকাতুল্য হয়ে গেছে। দুর্জ্ঞির অনুসরণ তাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং মানব স্বভাব বিরুদ্ধ সব অপকর্ম এক পর্যায়ে তাদের জন্য স্বভাবসিদ্ধ বাসনার রূপ নিয়েছে আর তারা নাছেড় বান্দার ন্যায় জাগতিকতার প্রতি আসক্ত হয়েছে।

প্রতিপক্ষ আপন আত্মীয় হলেও এরা পরম্পর বিচ্ছুর ন্যায় ছল ফোঁটায়, সত্য বলা ও আন্তরিক ভালবাসা বলতে এদের মধ্যে কিছু নেই। এরা পুণ্যের স্থানে পাপকে

অবলম্বন করে এবং ভাইদের দোষ অনুসঙ্গানে লিখ থাকে। সঙ্গি স্থাপন ও বিশ্বাসীদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা এরা ভূলে বসেছে, এরা ভাইদের ওপর শক্তির ন্যায় আক্রমণ করে আর ভালবাসার বক্ষলকে ছিন্ন করে। এরা নিষ্ঠাকে জলাঞ্জলি দিয়েছে, নিজেদের মাঝে অবাধ্যতা ও শক্তি ছাড়ায় এবং এরা হোঁচ্ট খেতে ও অপরাদ আরোপে অভ্যন্ত। প্রীতি-ভালবাসার প্রেরণা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গেছে আর কপটতা ও বিবাদ-বিসম্বাদের প্রসার ঘটেছে। বড় মন আর স্বচ্ছ হৃদয় বলতে কিছুই নেই। ঈমানে অনেক গৌঁজামিল চুকে গেছে। এরা তাকওয়া ও খোদাভীতির গতি ত্যাগ করেছে। এরা নিজ ভাই এবং মুমিন নর-নারীর অধিকার প্রদান করা ভূলে গেছে। অবাধ্যতাকে এরা পরিহার করে না এবং অন্যের অধিকার নিশ্চিত করে না। এদের অধিকাংশ দুর্ভুতি ও নিষিক্ষ কর্ম করা ছাড়া অন্য কিছু বুঝে না। যুগ বদলে গেছে, তাকওয়া-খোদাভীতি ও রোয়া-নামায বলতে কিছু নেই। এরা জাগতিকতাকে পরকালের ওপর এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে মহা সম্মানিত প্রভুর ওপর প্রাধান্য দেয়। আমি এদেরকে ইহজগতের পিছনে উন্নাদপ্রায় ছুটতে দেখছি কিন্তু পরকালের বিষয়ে এরা উদাসীন। এরা সঠিক পথকে লক্ষ্য হিসেবে অবলম্বন করে না। বিশ্বস্ততা লোপ পেয়েছে, লজ্জাবোধ হারিয়ে গেছে, খোদাভীতি কাকে বলে এরা তা জানে না। আমি এমন সব চেহারা দেখতে পাই যাতে ধোঁকা ও প্রতারণার লক্ষণাবলী স্পষ্ট। এরা অঙ্ককার রাতকে ভালবাসে কিন্তু চতুর্দশী চন্দ্রে থু থু ফেলে। এরা কুরআন পড়ে কিন্তু রহমান খোদাকে পরিত্যাগ করে।

এদের প্রতিবেশী এদের পক্ষ থেকে অত্যাচার এবং এদের সমপর্যায়ের লোকেরা এদের পক্ষ থেকে হীনতা ছাড়া আর কোন কিছুই দেখে না। দুর্বলদের ধৰ্মস করে এদের মন ভরে না বরং এরা আরও বেশি কিছু করতে চায়। মিথ্যবাদী, পরনিন্দুক, প্রতারক, পরচর্চাকারী, অত্যাচারী, প্রতারণার মাধ্যমে হত্যাকারী, ব্যভিচারী, পাপাচারী, মদখোর, পাপিষ্ঠ, বিশ্বাসঘাতক, বিদ্রোহী, বন্তবাদী মানুষ এবং ঘৃষ্ণুখোরদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। হৃদয় ও প্রকৃতি কঠোর হয়ে গেছে। এরা খোদাকে ভয় করে না আর মৃত্যুকে স্মরণ করে না। এরা পশুর মত খায় আর ইসলাম কি তা জানে না। ইহজগতের কামনা-বাসনা এদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অতএব এদের গতি ও হিতি এরই জন্য। এ নিয়েই তারা যুমায় এবং জাগ্রত হয়। এদের ধর্মান্তর ব্যক্তির সম্পদের মাঝে ভূবে আছে। তারা চতুর্স্পদ জন্মের মত খায় অপর দিকে সমস্যা কবলিত মানুষ দারিদ্র্য বা খণ্ডের দায়ে জর্জরিত হয়ে অশ্র বিসর্জন করে। সুতরাং আমাদের অভিযোগ আমরা কেবল সম্মানিত আল্লাহর সমীক্ষে উপস্থাপন করছি, কেননা একমাত্র সাহায্যকারী প্রভুর সাহায্য ছাড়া আমাদের আর কোন শক্তি ও সামর্থ্য নেই।

কোন গণনা ও হিসেবে তুমি প্রিস্টানদের অনাচারকে আয়ত্ত করতে পারবে না -এর একটি দিক আমি প্রাথমিক পৃষ্ঠাগুলোতে উল্লেখ করেছি। পরিত্র খোদা যখন দেখলেন, ভিতরে-বাইরে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ছেয়ে গেছে তখন তাঁর প্রজ্ঞা ও দয়া এমন এক ব্যক্তির

মাধ্যমে যুগের বিশ্বজ্ঞলা দূরীভূত করার সিদ্ধান্ত নিল যার দু'টো রূপ ছিল। এক রূপ হলো ঈসার রঙে রঙিন আর অপরটি হলো হযরত আহমদ মুস্তাফার পদাঙ্গ অনুসরণে বিলীন। এ ব্যক্তি এ দু' ধরনের শুণাবলী ধারণের জন্য নিবেদিত ছিল এ কারণে তাঁকে এ দু'টো নাম দেয়া হয়। সুতরাং এ সূক্ষ্ম তত্ত্বকে গ্রহণ কর আর আধ্যাত্মিকতার বিরোধিতা করো না। শুনা মাত্রই যারা অস্বীকার করে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। পবিত্র কা'বার প্রভুর কসম! এটিই সত্য কথা আর শিয়া ও সুন্নিয়া যা দাবী করে তা মিথ্যা। আমার বিরক্তে তড়িঘড়ি করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ো না। আল্লাহর কাছে পথের দিশা চাও এবং সত্যসন্ধানী হৃদয় নিয়ে আমার কাছে এসো। তুমি যদি উপেক্ষা কর আর আমার কথা গ্রহণ না কর তাহলে,

تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ
فَتَجْعَلُ لِعْنَةً اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

(অনুবাদ: এসো, আমরা /আমাদের সন্তানদের ডাকি আর তোমরা সন্তানদেরকে ডাকো, আমরা আমাদের স্ত্রীলোকদের ডাকি এবং তোমরা তোমাদের স্ত্রীলোকদের ডাকো ...) (সূরা আলে ইমরান ৬২.)

এটি সেই সত্য যা আল্লাহ তাঁর মহান অনুগ্রহ ও চিরবিদান্যতার নির্দর্শনস্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ করেছেন। ঈসা (আঃ)-কে মৃত্যু দেয়া হয়েছে, আর আল্লাহ জানেন তিনি মৃত। তোমাদের ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান আসকারী যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছো তিনিও মৃত এবং ইমাম কায়েমও মৃত। আমার প্রতি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে ইলাহাম করা হয়েছে, আমি প্রতিশ্রূত 'মসীহ' এবং সৌভাগ্যবান 'আহমদ'। তোমরা কি আশ্রয় হচ্ছো? আল্লাহর রীতি বা বিধান সম্পর্কে ভাবছো না? তোমরা অস্বীকার করছো? তোমাদের কি ভয় বলতে কিছু নেই? সত্য প্রকাশ পেয়ে গেছে, এরপরও তোমরা অবজ্ঞা করছো!

সময় এসে গেছে অথচ তোমরা দূরে বসে আছো। আজ পর্যন্ত বলবৎ আল্লাহ তাঁ'লার চিরস্তন, চলমান ও স্থায়ী রীতি যাকে কোন অজ্ঞ বা জ্ঞানী ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না, তা হলো, তিনি ভবিষ্যত্বান্তে অনেক সময় এক বস্তু বা ব্যক্তির উল্লেখ করেন, কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্ন বস্তু বা ভিন্ন কোন ব্যক্তি হয়ে থাকে। প্রায়শই আমরা স্বপ্নে কোন স্থান থেকে কোন ব্যক্তিকে আসতে দেখি কিন্তু যাকে আমরা দেখি সে আসে না বরং বাস্তবে এমন কেউ আসে যে কোন কোন বৈশিষ্ট্যে বা কোন দোষ ও গুণে তার সাথে সামঝস্য রাখে। আমি তোমাকে একটি অস্তুত ঘটনা এবং একটি আশ্চর্যজনক বিষয় শুনাচ্ছি। বশীর নামে আমার বড় আদরের এক ছেলে ছিল। দুধ খাওয়ার বয়সে আল্লাহ তাকে মৃত্যু দেন। যারা তাকওয়া ও খোদাভীতির পক্ষা অবলম্বন করে আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি তাদের চিরসাথী। আমার প্রতি ওহী হলো, আমরা তোমার প্রতি

অনুগ্রহস্বরূপ তাকে ফেরত পাঠাবো, একইভাবে তার মা-ও স্বপ্নে দেখেছেন, বশীর ফিরে এসেছে আর বলছে, আমি আপনাকে আঁকড়ে ধরে রাখবো আর হঠাতে করে ছেড়ে চলে যাবো না। এরপর আল্লাহ্ আমাকে আর এক পুত্রসন্তান দান করলেন আর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। তখন আমি বুবলাম, সর্বজ্ঞানী খোদা সত্য বলেছেন, সে-ই বশীর এবং তার নামানুসারে আমি এর নাম রাখলাম আর আমি এর মাঝে পূর্ববর্তী সন্তানের অবয়ব দেখতে পেলাম। সুতরাঃ আল্লাহর যে রীতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত তা হলো তিনি দু'ব্যক্তিকে একই নামের অংশীদার করে থাকেন। কাউকে অপর কারও নাম দেয়ার বিষয়টি এমন একটি রহস্য যার পিছনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। তত্ত্বজ্ঞানীদের দ্বায় ছাড়া অন্যরা তা বুঝতে পারে না।

আমার পরম প্রিয় ও সবচেয়ে নিষ্ঠাবান এক বক্তু আছেন, যিনি শ্রেষ্ঠ একজন আল্লামা, গভীর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, পবিত্র কুরআনের সূক্ষ্ম রহস্যাবলী সমষ্টে জ্ঞাত আলেম, চিকিৎসা শাস্ত্র ও ধর্মীয় জ্ঞানে বৃৎপত্তির অধিকারী, তাঁর গুণ অনুসারে তাঁর নাম হলো মৌলভী হাকিম নূরউদ্দীন। কিছুদিন হলো, সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান খোদার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁর একমাত্র আদরের পুত্র যার নাম মুহাম্মদ আহমদ সম্প্রতি হামে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং প্রজ্ঞা, কুদরত ও দয়ার আধার প্রভুর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট ছিলেন। তার ইস্তেকালের পর সে রাতেই এক ব্যক্তি সেই শিশুকে স্বপ্নে দেখে। সে যেন বলছিল, এ বিরহে দুঃখিত হবেন না। আমি প্রয়োজনের তাগিদে যাচ্ছি শীত্রেই আপনাদের কাছে ফিরে আসবো। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে তাঁকে আরেকটি পুত্র সন্তান দেয়া হবে এবং দ্বিতীয় পুত্র প্রয়াত সন্তানের সাথে সাদৃশ্য রাখবে। আল্লাহ্ তাঁলা সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রষ্ঠার কাজ সম্পর্কে বুঝে না।

এ সম্পর্কে এমন অনেক ঘটনাবলী ও অনেক বড় বড় সাক্ষ্য রয়েছে কিন্তু দীর্ঘসূত্রিতার ভয়ে আমরা এর উল্লেখ পরিহার করছি। স্বপ্নের তা'বীরের বইতে এমন অনেক ঘটনা লেখা আছে। তোমার সন্দেহ থাকলে সে বইগুলো পড়ে দেখতে পারো। সন্দেহের অবকাশ থাকবেই বা কেন, এমন নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা সব যুগেই দেখা যায়। তুমি নিজেও হয়তো এমন আশ্চর্যজনক বিষয়ের সাক্ষ্য দিতে পারো। এক মৃত ব্যক্তিকে যখন কেউ স্বপ্নে দেখে বা ইলাহামে যদি তার সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়, আর মৃত ব্যক্তি বলে, আমি পৃথিবীতে ফিরে আসবো এবং নিকট আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবো, তুমি এর কি অর্থ করবে? তুমি কি তখন বিশ্বাস করবে, সে সত্যি বাহ্যিক অর্থেই ফিরে আসবে? নাকি আধ্যাত্মিক জগতের লোকদের দৃষ্টিতে তাঁর কথার অন্য কোন ব্যাখ্যা আছে? তুমি যদি এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারো, তাহলে এর সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ আরেকটি বিষয়ে তুমি কেন অনুরূপ অর্থ কর না? হে উদাসীন শ্রেণী! তোমরা কি আল্লাহর নিয়মের মাঝে ব্যতিক্রম দেখাতে চাও? অতএব চিন্তা করে দেখ। তবে তুমি চিন্তা-ভাবনা কর বলে আমার মনে হয় না। অবশ্য পথভ্রষ্টদের হেদায়াত দাতা আমার প্রভু পথ দেখাতে চাইলে সে কথা ভিন্ন।

মসীহ ও মাহনীর আবির্ভাবের লক্ষণাবলী যে প্রকাশ পেয়েছে তা তুমি জানো। নৈরাজ্য বাড়তে বাড়তে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বজগতে দেখে গেছে বরং তা ফুসে উঠে উত্তাল রূপ ধারণ করেছে। অলিতে-গলিতে এবং বাজারে-বন্দরে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সাঃ)-কে গালি দেয়। উম্মত মৃতপ্রায়। চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং এর বিদায়ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং তোমরা এ অপদস্থ ধর্মের প্রতি করুণা কর, কেননা বিদায় ঘন্টা বেজে উঠেছে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি। তোমরা কি এ বিশ্বজগত পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছে না? ঈমানের আধ্যাত্মিক পানীয়কে কি জাগতিক ধন-সম্পদের বিনিময়ে পরিত্যাগ করা হচ্ছে না? আল্লাহ তালার খাতিরে সাক্ষ্য দাও, হ্যাঁ সাক্ষ্য দাও, একথা সত্য নাকি মিথ্যা? আমরা খ্রীস্টানদের ষড়যন্ত্রের চেয়ে বড় কোন চক্রান্ত দেখি নি। আমরা তাদের হাতে বন্দীর মত অসহায়। তারা দুর্জ্ঞতির আশ্রয় নিলে ইবলীসকেও হার মানায়। দৃঢ়-কষ্ট ও নৈরাশ্য সর্বত্র দেখে গেছে আর মানুষের হাদয় পাষাণ হয়ে গেছে। তারা কুমক্ষণাদাতার কুমক্ষণার অনুসরণ করছে আর তাকওয়া ও খোদাইতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বরং তারা এ রীতির বিরোধিতা করে হৈন-পতিত বস্তু সদৃশ হয়ে গেছে। আমি যা দেখেছি এবং গভীর অনুসন্ধানের পর যা প্রকাশিত হয়েছে এর খুব কমই বর্ণনা করেছি। আল্লাহর কসম! সমস্যা চরম পর্যায়ে উপনীত। এ উম্মতের মাঝে শুধু বাহ্যিকতা আর বড় বড় দাবী রয়ে গেছে। অঙ্ককার একে ধিরে ফেলেছে এবং আলো হারিয়ে গেছে। বন্য পশু আমাদের ক্ষেতকে পদতলে পিট করেছে। এর পানি বা চারণভূমির কিছুই অবশিষ্ট নেই। নৈরাজ্যের উপরে পড়া বন্যায় মানুষ ধ্বনিসের দ্বারপ্রাণে পৌছে গেছে। সুতরাং আমার প্রভূর পক্ষ থেকে আমাকে একটা নৌকা দেয়া হয়েছে আর আল্লাহর নামেই এর যাত্রা এবং স্থিতি।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলছি। আল্লাহ তালা এ যুগে খ্রীস্টানদের ভ্রষ্টাকে বিভিন্ন প্রকার ঔদ্ধত্যের আকারে প্রকাশ পেতে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন, তারা নিজেরা পথভৰ্ত হয়েছে, একই সাথে সৃষ্টির একটি বিরাট অংশকেও পথভৰ্ত করেছে আর তারা অনেক বড় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে এবং চরম অরাজকতা ও ধর্মহীনতার প্রসার ঘটাচ্ছে। তারা সমুজ্জ্বল ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছে আর পাপ ও লাগামহীন কুপৰূপির দুয়ার খুলে দিয়েছে। এ ভয়াবহ নৈরাজ্যের সময় মহিমাবিত খোদার আত্মাভিমান নিজ মহিমা প্রদর্শন করেছে। এর পাশাপাশি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিশ্বজগতে চরম রূপ ধারণ করেছিল। এরা মতভেদের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের (সাঃ) ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। এদের একে অন্যের বিরুদ্ধে দুর্জ্ঞতকারীর মত আক্রমণ করেছে। আল্লাহ তালা আমাকে এদের মতভেদ দূর করার জন্য মনোনীত করেছেন এবং আমাকে ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্যে মীমাংসাকারী ও সুবিচারক নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে আমি মু'মিনদের জন্য আগত সেই 'ইমাম' আর আমিই খ্রীস্টান ও তাদের লালনকারীদের জন্য অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনকারী সেই 'মসীহ'।

যেভাবে আমার যুগে নৈরাজ্যের দু'টো আংন প্রকাশিত হয়েছে ঠিক সেভাবে আমার প্রভুও আমার মাঝে দু'টো নামের সমাহার ঘটিয়েছেন। দু'জগতের স্রষ্টা আল্লাহর কসম! এটিই সত্য। আমি তাঁর কল্যাণের জ্যোতিকে প্রসারিত করতে এসেছি। আমার প্রভু আমাকে তাঁর নির্ধারিত সময়ে বেছে নিয়েছেন। আমি মহাসম্মানিত খোদার অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। আর আমার পক্ষে দয়ালু খোদার ইচ্ছার বিরোধিতা করা অসম্ভব। আমি গোসলদাতার হাতে শুধু এক মরা লাশের মত। সর্বশক্তিমান খোদা আমায় যেভাবে চালান আমি প্রতি নিয়ত সেভাবে চলি। আমি মুসলমানদের সীমাহীন বিদা'তের সময় এবং শ্রীস্টানদের সৃষ্টি নৈরাজ্যের যুগে এসেছি। তোমার যদি সদেহ থাকে, তাহলে দক্ষ গবেষকের ন্যায় আমাদের স্বজ্ঞাতি যেসব বিদা'তে নিয়মিত তা এবং ত্রুণি পূজারীদের অজ্ঞতাপূর্ণ বথাবার্তার দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত কর। তুমি কি ক্রমাগত বিশ্বজ্ঞলা দেখতে পাচ্ছে না? বিগত শতাব্দীগুলোতে তুমি কি এর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাও? তোমার কী হয়েছে? তুমি বুদ্ধিমানদের মত কেন চিন্তা কর না এবং সুবিচারকদের দৃষ্টিতে কেন দেখ না? নিশ্চয় প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে আল্লাহ তা'লা ধর্মের সংস্কারক প্রেরণ করেন। যেক্ষেত্রে সাহায্যকারী খোদার রীতি এভাবেই কার্যকর সেক্ষেত্রে তুমি কিভাবে ভাবতে পারো, আল্লাহ এ বাড়ের সময় তত্ত্বজ্ঞানীদের কাউকে পাঠান নি? সত্য কথা হলো, অপরাধীদের শাস্তিদাতা আল্লাহকে তুমি ভয় কর না।

শতাব্দীর প্রথম ১১ বছর (বর্তমানে পরবর্তী শতাব্দীরও ২৯ বছর -অনুবাদক) কেটে গেছে কিন্তু তুমি লক্ষ্য কর নি। চন্দ্র-সূর্যে গ্রহণও লেগেছে কিন্তু তুমি বিবেক খাটোও নি। নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু তুমি শিক্ষা নাও নি। লক্ষণাবলী স্পষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তুমি সেদিকে ঝঙ্কেপ কর নি। তুমি কি ঘুমাচ্ছে নাকি জেনেশুনে উপেক্ষা করছো? খোদা আমার ধ্যান-ধারণা অনুসারে কেন কাজ করলেন না -এই কি তোমার বক্তব্য? তোমার পূর্বে অতীত ইহুদীরাও একই দাবী করতো। তারা সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল এবং সব উপাস্যদের উপাস্য খোদা তা'লার বক্তু মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি কেবল এ কারণে ঈমান আনে নি কেননা তারা মনে করতো, প্রতিশ্রুত খাতামান নবীঙ্গন আমাদের মধ্য থেকে আসবেন, আমাদের নবী দাউদের সাথে এমনই প্রতিশ্রুতি ছিল। তারা বলে, এলিয় বা ইলিয়াস আকাশ থেকে আসার পরই কেবল দুসা আসবে। সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা কর, আর দুসা সম্পর্কে ভাবো যিনি রসূলদেরই একজন। আল্লাহ তাদের হৃদয়ে যোহর মেরে দিয়েছেন তারা সত্যকে বুঝে নি আর চিন্তা করেও দেখে নি। তাদের হৃদয় কঠোর হয়ে গেছে, তারা বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বলে। ফলশ্রুতিস্বরূপ তারা বানর ও শূকরসদৃশ হয়ে গেছে। সত্যবাদীদের প্রত্যাখ্যান করলে পরিণতি এমনই হয়। তারা স্বজ্ঞাতির পভিত, নিজ গভীর নেতা, ফকীহ, মুহাদেস এবং মুফাস্সেরদের শিরোমণি ছিল। তাদের অধিকাংশ সন্ন্যাসী ছিল। কিন্তু তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করলো তখন আল্লাহও তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। তাদের পাভিত্য এবং প্রতিষ্ঠিত নিয়মে ফাটল সৃষ্টি করা তাদের কোন কাজে লাগে নি। তারা এক অবাধ্য জাতি।

আল্লাহর প্রাপ্য অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ত্রুটি করো না । তোমাদের মধ্যে ন্যূনতা ও সহনশীলতা থাকা বাঞ্ছনীয় । যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পিছনে ছুটো না । বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করো না । পৃথিবীতে বিশ্বজগতে ছড়িয়ে বেড়িও না এবং অশাস্তি সৃষ্টি করো না । তোমরা মুস্তাকী হয়ে থাকলে আল্লাহকে ডয় কর । একজনের নামে অপর একজনের নাম রাখার রীতির কথা তোমরা শুনেছো । তোমাদের কাছে যার প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত নেই এমন সব ধারণার জন্য আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত নিয়মকে পরিত্যাগ করো না । তোমরা যদি নাছোড়বাদ্দা হও আর তা (অর্থাৎ অলীক ধারণা) পরিত্যাগ করতে না পারো তাহলে এর কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাগন কর, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো । তোমরা এর দৃষ্টান্ত কখনো উপস্থাপন করতে পারবে না । অতএব সর্বশক্তিমান প্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিঙ্গ হয়ো না । নিয়মাত এসে যাবার পর একে প্রত্যাখ্যান করো না । অনুগ্রহ বৰ্ষিত হ্বার পর একে ধাক্কা দিয়ে দূরে ঠেলে দিও না । আর দেখা মাত্রই যারা অবজ্ঞা প্রদর্শন করে তুমি তাদের মত হয়ো না ।

আমার ব্যপারে যদি তোমার সদেহ থাকে আর আমার পূর্ণচলনের জ্যোতি তোমার চোখে না পড়ে এবং তুমি যদি এ ধারণা কর যে, ফিনার সর্বগ্রাসী অগ্নি নির্বাপণের জন্য প্রতিশ্রূত মসীহ বনী ফাতেমার বংশ থেকে আসবেন, অন্য জাতির মধ্য থেকে নয়, তাহলে জেনে রেখো, এটি ভিত্তিহীন একটি ধারণা আর একটি তীর ফলাবিহীন । এ বিষয়ে যে মতভেদ রয়েছে তত্ত্বজ্ঞানী ও অভিজ্ঞ মুহাদেসসগণের এটি অজানা নয় । কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, নির্দশনের মদদপুষ্ট মাহ্নী হবেন আববাসের বংশোদ্ধৃত । আর কোন কোন রেওয়ায়াতে লেখা আছে, আল্লাহ মিল্লা অর্থাৎ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের বংশোদ্ধৃত হবেন । আর কোন কোন বর্ণনানুযায়ী তিনি হাসান হোসাইনের বংশধর হবেন । সুতরাং এ বিষয়ে মতভিন্নতা দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের কাছে অজানা কোন বিষয় নয় । এ ছাড়া রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্পষ্টভাবে বলেছেন, সালমান মিল্লা আহলিল বাইতে [অর্থাৎ সালমান (রাঃ) আমাদেরই একজন এবং তিনি আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত] অথচ তিনি বাহ্যত: আহলে বাইতভূক্ত ছিলেন না, তিনি ছিলেন পারস্যবাসীদের একজন । তোমার স্মরণ থাকা উচিত, জাতি-গোষ্ঠীর বিষয়টি এমন যার স্বরূপ সর্বজ্ঞানী খোদা ছাড়া আর কেউ জানে না । এছাড়া হ্যরত ফাতেমা সম্পর্কে আমি যে স্মপ্তের কথা লিখেছি, তা হ্যরত ফাতেমার সাথে আমার গভীর সংশ্লিষ্টতার সাক্ষ্য বহন করে । আল্লাহ তালাই সবকিছুর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত । কিন্তু তাহিমীরে হ্যরত আবু হুরায়রার পক্ষ থেকে বর্ণিত আছে, পারস্যবাসীদের মধ্য থেকে যে-ই ইসলাম গ্রহণ করে সেই কোরাইশী । আর আমার প্রভুর দেয়া সংবাদ অনুসারে আমি পারস্য বংশীয় । সুতরাং এ বিষয়ে চিন্তা কর আর বিদ্বেষীদের ন্যায় তড়িঘড়ি কিছু করে বসো না । এছাড়া পরিষ্কার নীতি ও সবচেয়ে দৃঢ় পঞ্চ হলো, লক্ষণাবলী বিশেষণ করা এবং সুস্পষ্ট কথাকে সন্দেহযুক্ত বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দেয়া । তুমি যদি এ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে চাও তাহলে তোমাকে যুক্তির আলোকে চিন্তা করতে হবে । আল্লাহ তোমাকে সুস্পষ্ট সত্যের পানে পরিচালিত করুন । বিষয়টি হলো, কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত ও নির্ভরযোগ্য

হাদীস এ বিষয়ে একমত । সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রজ্ঞা ও রহমতের নির্দর্শনস্বরূপ এ উম্মতের যুগকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন । আর সব আলেম নিঃসন্দেহে এটা স্থাকার করবেন । প্রথম যুগ হলো প্রথম তিন শতাব্দীর প্রথমাংশ অর্থাৎ মহানবী (সাঃ)-এর যুগের প্রথম ভাগ । আর দ্বিতীয় যুগ হলো বিদা'তের সূচনা থেকে আরম্ভ করে সে সময় পর্যন্ত যখন বিদা'ত অনেক বিস্তৃত হয়েছে । আর তৃতীয় যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের যুগের সাথে সাদৃশপূর্ণ যুগ যা পুনরায় নবুওয়তের যুগে ফিরে এসেছে এবং যা ঘৃণ্য বিদা'ত ও বিকৃত রীতিনীতি থেকে মুক্ত হয়ে খাতামান্ন নবীসন্দেহের যুগসদৃশ হয়েছে । বিশ্ব-রসূল (সাঃ) একে শেষ যুগ আখ্যায়িত করেছেন, কেননা এটি দু'যুগের শেষ যুগ । আল্লাহ্ আখেরী যুগের লোকদের সেভাবে প্রশংসা করেছেন যেভাবে প্রথম যুগের লোকদের প্রশংসা করেছে । তিনি বলেন

ٌلٰهٗ مِنَ الْأُولَئِينَ ۝ وَمِنْ لَٰهٗ مِنَ الْآخْرِينَ ۝

(সূরা ওয়াকেয়া : ৪০-৪১)

অর্থাৎ প্রত্যেক জামাতের একজন নেতা হবেন যে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই । এতে খাতামুল আইমা বা সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম-এর দিকে ইশারা রয়েছে । তিনি হলেন প্রতিশ্রুত মাহ্দী, যিনি মহাসম্মানিত খোদার উক্তি

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يُلْحَقُوا بِهِمْ

(সূরা জুমুআ : ৪)

অনুসারে সাহাবাদের সাথে একীভূত করেছেন । রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ‘আখারীন’ বলতে কি বুঝায় তা জিজ্ঞেস করা হলে মহানবী (সাঃ) হ্যবরত সালমানের কাঁধে একান্ত প্রিয় বঙ্কু ও প্রেমাস্পদের ন্যায় হাত রাখেন এবং বলেন, ঈমান যদি সূরাইয়া নক্ষত্রেও চলে যায়, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায়, পারস্য বংশীয় এক ব্যক্তি তা পৃথিবীতে নিয়ে আসবেন । এটি সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের পক্ষ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইমামের দিকে ইঙ্গিত । অর্থাৎ শেষ যুগে যে ইমাম আসবেন তিনি পৃথিবীতে ঈমানের আলো ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন । আর রহমান আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি পারস্য বংশীয় হবেন । সুতরাং চিঞ্চ কর ও ভেবে দেখ । এটি এমন উচ্চ মানের একটি হাদীস যে পর্যায়ে অন্য কোন হাদীস পৌছতে পারে না । সহীহ বুখারীতে ইমাম বুখারী এটা অতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন । যখন প্রমাণ হয়ে গেল, শেষ যুগে আগত ইমাম পারস্যবংশীয় হবেন অন্য কোন জাতি থেকে হবেন না, তাই অন্য কোন ব্যক্তির এখানে পা রাখার সুযোগ নেই । এটি সেই খোদার সিদ্ধান্ত যিনি অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের অধিপতি । সুতরাং আল্লাহ্ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেয়ো না এবং সীমালজ্ঞনকারীর মতো বিতভায় লিঙ্গ হয়ো না । ওয়া আখেরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রবিল আল্লামীন ।

আবুবকর, ওমর ফারুক ও অন্যান্য সাহাবিদের (রাঃ) প্রশংসায়

কাসিদা

আত্মসংবরণ কর, সাহাবিদের ব্যঙ্গ করো না আর আল্লাহকে ভয় কর ।

মিথ্যাবাদীর পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, দেখে-শুনে কথা বল । ভষ্টা ও দুর্দশার পথ বেছে নিও না ।

এমন লোকদেরকে অভিশাপ দিও না যারা সুর্যের মত আলোকজ্বল ছিলেন ।

তাঁরা খোদা-প্রেমিক, সুতরাং তাঁদের সীমানায় প্রবেশ করার ব্যপারে সাবধান! ধৃষ্টা দেখিয়ে তাঁদের সম্মানে আঘাত হানবে না ।

তাঁরা আল্লাহর জামাত ও তাঁর ধর্মের সুরক্ষাকারী ।

তাঁদেরকে কষ্ট দেয়া সেই প্রভুকে কষ্ট দেয়ার নামান্তর যিনি তাঁদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন ।

তাঁরা খোদার ধর্মের তরে আস্তরিকতা ও আনুগত্যের প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে বেরিয়েছেন ।

সব ভস্মকারী বা ধ্বংসাত্মক নির্যাতনের মুখোয়ুষ্টী হবার জন্য তাঁরা বেরিয়েছেন ।

প্রেমের উপত্যকা তাঁদের হৃদয়-সমুদ্রকে পরিব্রত করেছে ।

সুতরাং এ পরিব্রতা অর্জনের পর ফেনা ও খড়-কুটোর গুরুত্বই বা কি?

তাঁরা আল্লাহর নবীর কাছে নিষ্ঠার সাথে এসেছেন আর জ্যোতির্মাণিত হয়েছেন ।

তাঁদের মাঝে অন্ধকারের কোন পক্ষিলতা অবশিষ্ট ছিল না ।

উৎসাহ-উদ্দীপনার বাহনে আনুগত্যের প্রেরণা নিয়ে তাঁরা তাঁর কাছে উড়ে গেছেন ।

তাঁরা মহা সম্মানিত নবী (সাঃ)-এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমৃদ্ধ হয়ে গেছেন ।

আমরা এবং তোমরা আজ সুখের উদ্যানে বিচরণ করছি ।

কিন্তু তাঁরা হাশরতুল্য মৃত্যুপুরীতে উপস্থিত হয়েছিলেন ।

তাঁরা স্বদেশের ভালবাসাকে শুধু আল্লাহর জন্য ত্যাগ করেছেন ।

রম্জুন (সাঃ)-এর কাছে তাঁরা এমন প্রেমিক হিসেবে এসেছিলেন যারা সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু তাঁকে বেছে নিয়েছেন ।

দুর্বলতা সন্ত্রেণ তাঁরা সত্যের বলে বলীয়ান হয়ে আক্রমণ করতেন ।

আহত অবস্থায় তাঁরা বীরত্বের সাথে ধারালো তরবারী চালনা করতেন ।

তুমি কি নবী (সাঃ)-এর খলীফাদেরকে ধৃষ্টার সাথে কাফের আখ্যা দিচ্ছা?

তুমি কি তাঁকে অভিসম্পাত করছো যে পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় আলোকিত?

খিলাফতের বিষয়টি যদি তোমার ভাল না লাগে,

তাহলে সেই সর্বাধিপতির সাথে যুদ্ধ কর, যিনি তাঁদেরকে ক্রেতার ন্যায় বেছে বেছে গ্রহণ করেছেন ।

তাঁর নির্দেশে যা ঘটার ছিল তা ঘটে গেছে ।

সুতরাং অবধারিত বিষয় প্রকাশিত হবার পর কান্নাকাটি করো না ।
সর্বজনী খোদা ভুলবশত কাউকে খীঁফা নিযুক্ত করেন নি ।

বিশ্ব-জগতের প্রভু এমন নন যিনি বৃক্ষের ন্যায় বুদ্ধি হারাবেন॥
প্রতিশ্রূত খিলাফতের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে ।

আর এতে চিঞ্চাশীল বিবেকের জন্য অনেক নির্দশন রয়েছে ।
নিশ্চয় আমি সিদ্ধীক (রাঃ)-কে প্রভাতের দেদীপ্যমান সূর্যের ন্যায় মনে করি ।

বিচক্ষণদের দৃষ্টিতে তিনি অতি প্রশংসনীয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন ।
তিনি মুন্তাফা (সাঃ)-এর ছায়াস্বরূপ ছিলেন ।

মুন্তাফা (সাঃ)-এর ইশারা পেতেই তিনি বীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে যেতেন ।
তুচ্ছ কিছু সামগ্রী ছাড়া তিনি নিজ গৃহের সব সম্পদ ধর্মের খাতিরে উৎসর্গ করেছেন ।
আমাদের নবী (সাঃ) যখন তাঁকে সঙ্গ দেয়ার আহ্বান জানালেন,
পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে তিনি মৃত্যুর জন্য সাগ্রহে এগিয়ে গেলেন ।

তাঁর অনুপম গুণাবলী সমালোচনার উক্তি ।

তুমি অন্যায়ের ব্যাপারে যদি সংকল্পবদ্ধ হও তাহলে নির্লজ্জের মত দোষারোপ কর ।
নিজ ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তিনি কৃপৃবৃত্তিকে পদদলিত করেছেন ।
ত্যাগের সব রাজপথ অতিক্রম করে তিনি আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর সান্নিধ্যে এসেছেন ।
হে হেদায়াত সন্ধানী! আল্লাহর কিতাবকে কিছুটা গ্রাহ্য কর ।

চিরসত্য পৃত-পৰিত্র গুণাবলী তোমার অবলম্বন করা উচিত ।
আল্লাহর কসম! আমি সাহাবিদের কাউকে আরু বকরের মত সুরভিত দেখি না ।

সব সাহাবি তাঁর মাহাত্যগুণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে নির্বাচন করেছেন ।

নিশ্চয় সব নদীর তুলনায় সমন্ব্যের প্রাধান্য রয়েছে ।

মহান তত্ত্বাবধায়ক প্রভু সিদ্ধীকের প্রশংসা করেন ।

সুতরাং হে হতভাগা! তুমি দোষারোপ করলেও তোমার গুরুত্বই বা কি?

দীপ্ত দিবাকরের ন্যায় তাঁর রেখে যাওয়া পুণ্য বিরাজ করছে আর তাঁর এ পরিত্র
বৈশিষ্ট্যের প্রমাণস্বরূপ নির্দশনের ঝর্ণাও বহমান ।

নিজ কষ্টের সময় তিনি ধর্ম-সেবায় সাগ্রহে সাথে এগিয়ে এসেছেন ।

খোদার সাহায্যপ্রাপ্ত রসূলের খাতিরে তিনিই প্রথমে গুহায় প্রবেশ করেন ।

তাঁর প্রভুর দৃষ্টিতে তিনি মহান পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত, বিশ্বস্ত ও দুনিয়াবিমুখ ছিলেন ।

সব অপলাপকারীর বাজে আলাপ থেকে তিনি সত্য ধর্মের মুক্তিদাতা ছিলেন এবং এমন
অরাজকতা থেকে ধর্মের পরিত্রাতা ছিলেন যা ধর্মের জন্য হৃষিকের কারণ ছিল ।

আর পর্বতসম ধ্বংসাত্মক সংকট থেকে তিনি ইসলামের পরিত্রাতা ছিলেন ।

এ ব্যক্তি যদি মুনাফেক হয়ে থাকেন তাহলে নবী মুন্তাফা (সাঃ)-এর সাহায্যকারী কে ছিল?
যে-ব্যক্তি সবচেয়ে বড় কাফের এবং প্রষ্ঠাতায় নিমজ্জিত তার কথায় তুমি কি তত্ত্বাবধায়ক
খোদার নিষ্ঠাবান বন্ধুকে কাফের জ্ঞান করছো?

তাঁর হৃদয় নবীদের হৃদয়-সদৃশ ছিল ।

তাঁর সৎসাহস ছিল সিংহের ন্যায় আক্রমণমুখী ।

তাঁর স্বভাব চরিত্রে আমি খোদার অবয়বের জ্যোতি দেখি, যেন তিনি উজ্জ্বল সূর্যের অংশ ।

মহা পবিত্র প্রভুর দরবারে তাঁর একটি অসাধারণ পদমর্যাদা রয়েছে ।

অতএব এমন মুখের জন্য ধ্বংস অবধারিত যার ভাষা খঙ্গের ন্যায় ধারালো ।

অগণিত চন্দ্রালোকের সমষ্টি যেমন উজ্জ্বল হয়ে থাকে তাঁর কীর্তি ও তেমন দেদীপ্যমান ।

তাঁর অবদান বাগান থেকে সংগৃহিত ফলের ন্যায় পরিমাণে অজস্র ।

বাগানের সতেজতার শুভসংবাদদাতা হিসেবে তিনি এসেছেন ।।

সুতরাং আল্লাহু তাল্লা এমন সতেজতা দানকারী ও শুভসংবাদ দাতার মঙ্গল করুণ ।

হ্যরত ফারাক (রাঃ) সব পদক্ষেপে তাঁর সাথে সাদৃশ্য রাখতেন ।

তিনি সুপরিকল্পনাকারী বাদশার ন্যায় মানুষের ওপর রাজত্ব করেছেন ।

তিনি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করেছেন ।

যার ফলে খিলাফতের সম্মান ও অপার মহিমা প্রকাশিত হয়েছে, অতএব ভেবে দেখ ।

তিনি (যুক্তে লিঙ্গ) কাফেরদের হত্যার মাধ্যমে ধরাপৃষ্ঠকে রঞ্জিত করেছেন ।

তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা কত বিশ্ময়কর ছিল ।

তাঁর যুগে স্থান তারকাও উজ্জ্বল সূর্যে পরিণত হয়েছে ।

সুতরাং কত প্রশংসনীয় তিনি নিজে ও তাঁর পবিত্র যুগ ।

তিনি প্রত্যেক যুক্তে কাফের বাদশাহদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ।

সব অহংকারী প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি ধ্বংস করেছেন ।

তিনি তাঁর শক্তিশালী হাতে সুমহান নিদর্শন দেখিয়েছেন ।

সুতরাং বিরল গুণবলীর অধিকারী এ বিজয়ী সুপুরুষকে সাধুবাদ ও শুভেচ্ছা ।

তিনি মানুষের জোড়া তালি দেয়া কম্বল পরিহিত ইমাম ছিলেন ।

ধূলিমলিন কাপড় পরিহিত একটি দেশের বাদশাহ ছিলেন ।

তাঁকে ঐশ্বী জ্যোতি দেয়া হয়েছে যার ফলে তিনি মুহাদ্দাস হ্বার সম্মান লাভ করেছেন ।

রহমান খোদা তাঁর সাথে মনোনীত ব্যক্তির মত কথা বলেছেন ।

তার গুণবলীর বর্ণনায় অনেক বই-পুস্তক পরিপূর্ণ ।

তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব পূর্ণ চন্দ্রের মত সমধিক উজ্জ্বল ।

সুতরাং কত মহান তিনি নিজে এবং তাঁর চেষ্টা-প্রচেষ্টা ।

মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্মের জন্য তিনি দুর্ভেদ্য শিরত্বাগ ছিলেন ।

তাঁর সময়ে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অশ্বারোহী বাহিনী হ্রাস্টান দেশসমূহে বীর বিজয়ে আস সৃষ্টি করেছে ।

মুসলিম সেনাদল পারস্য সন্ত্রাটের দাপটকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে ।

তাদের কান্নানিক চিত্র ছাড়া এখন আর কিছু বাকী নেই ।

দাপটের দিক থেকে তিনি ছিলেন তাঁর যুগের সোলায়মান ।

শক্রদের মাঝ থেকে জিন্নকে তাঁর জন্য কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে ।

আমি তাঁর পদমর্যাদার মহিমা দেখেছি এবং তা বর্ণনা করেছি ।

আমি সৃষ্টির প্রশংসা কেবল কোন শুণ থাকলেই করে থাকি ।

আমি সে মানুষ নই যে উপদেশ দানকালে সৃষ্টিকে ভয় করে ।

একজন সতর্ককারীর কথায় অবশ্য কিছু তিক্ততা থেকেই থাকে ।

বাহ্যিক দিক থেকে যখন আমার কথা কোমলতার সীমা ছাড়িয়ে গেল,

এবং এর সৃষ্টতা যখন গভীর কৃপ সদৃশ হয়ে গেলো,

তাদের সবাই তখন ফতোয়া দিল, তোমার বিশ্বাসহীনতা সাব্যস্ত হয়ে গেছে ।

তোমাকে হত্যা করা কাফের আখ্যাদানকারীর জন্য একটি পুণ্য কর্ম ।

নিশ্চয় শয়তান তাদের সন্দেহকে তাদের দৃষ্টিতে মনোরম করে দেখিয়েছে ।

সুতরাং তারা হীন প্রষ্ঠাতার খাতিরে পুণ্যকে পরিত্যাগ করেছে ।

নিশ্চয় কাহার খোদা তাদের হাদয়ের চেহারাকে বিকৃত করে দিয়েছেন ।

কুপ্রবৃত্তির দাসত্বে তাদের চিত্তাশীল হৃদয় লোপ পেয়েছে ।

তাদের প্রকৃতিতে পরিত্রাতার নাম-গন্ধও বাকী নেই ।

সুতরাং তাদেরকে সব পুণ্যবান ও সম্মানিত লোকদের পালি দিতে দাও ।

আমার পূর্বে আমার নেতা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথীদেরও কাফের আখ্য দেয়া হয়েছে ।

সব বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে ইতোপূর্বে তোমার কাছে এমন খবর নিশ্চয় এসেছে ।

আমায় কষ্ট দেয়াকে তারা কাপুরুষতার কারণে গোপন করে ।

আমি তাদের মাঝে এমন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দেখি না যে মুখোযুধি হতে পারে ।

আমার ভয়ে তারা শিয়ালের মত পালায় ।

তারা আমার তরবারী, বর্ণা ও খণ্ডকে ভয় করে ।

তাদের মাঝে এমনও আছে যারা শক্রতার কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লোভ রাখে ।

তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃঢ় এক বাহিনী নিয়োজিত, সতরাং তারা কিভাবে আমার মোকাবেলা করবে?

তাদের জ্যোতি বিদ্বেষের কারণে ঢাকা পড়ে আছে ।

আমি তাদেরকে ধূলা-আচ্ছাদিত শুক গোবরের মত দেখছি ।

আমরা তাদের এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি ।

আমরা তাদেরকে যেন গভীর কবরে পুঁতে ফেলেছি ।

আল্লাহর কসম! আমরা তাদের দুষ্কৃতিকে ভয় করি না ।

আমরা আমাদের মূল্যবান সম্পদ সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভুর ঘরে স্থানান্তর করেছি ।

সৃষ্টার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সৃষ্টির আদৌ কোন ভয় আমার নেই ।

তারা আমায় ভয় দেখিয়েছে কিন্তু আল্লাহ আমার আশ্রয় এবং নিরাপত্তাস্থল ।

মুহাইমেন তত্ত্ববধায়ক খোদা আমার সব রসহ্য জানেন।

সুতরাং হে প্রতিদ্বন্দী ও কাফের প্রতিপন্নকারী! আমাকে আর আমার প্রভুকে ছেড়ে দাও।

আমি যদি প্রতারক ও মিথ্যাবাদী হতাম, তাহলে এমন জাতির শক্রতা অবশ্যই আমার
ক্ষতি করতো, যারা সব ধরনের খণ্ডের নিয়ে আক্রমণে উদ্যত।

মুহাইমেন খোদার কসম! আমি কাফের নই। তত্ত্ববধায়ক খোদা আমার সব গোপন
রহস্য জানেন।

আমার প্রভু সাক্ষী, আমি মিথ্যাবাদী নই,

আমার কল্পনায় যা-ই বিরাজ করে তিনি এর সবই জানেন।

আমাকে নিশ্চিত তত্ত্বজ্ঞান দেয়া হয়েছে যা তারা জানে না।

মানুষের ধারণা তাদের জ্ঞান মাফিকই হয়ে থাকে।

প্রতারকের মত তারা তাঁর সম্পর্কে যে বিভ্রান্তিপূর্ণ কথা রটনা করেছে আরশের অধিপতি
এর উর্ধ্বে।

আমি হেদায়াতের অনুসারী একজন মুসলমান। সুতরাং হে সরব ব্যক্তি! কামনা-বাসনার
অধীনে তড়িঘড়ি কিছু করে বসো না, কিছুটা চিন্তা কর।

কিন্তু আমার জ্ঞানের সার বিষয় প্রবাশ পেয়ে গেছে।

কেননা এর পিছনে রহস্য উমোচনকারী একটি হাত কার্যকর।

যে বিরোধী হিসেবে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

আমার প্রভু আমার সাথে আছেন। আর আল্লাহু আমার বক্তু যিনি আমাকে প্রাধান্য
দিয়েছেন।

প্রথমদিকে ভষ্টদের জয়জয়কার, কিন্তু পরিণাম ভাল হয় ভাগ্যবানদের।

তুমি জ্ঞানী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে আশ্চর্য না হয়ে বরং আমার কথার সত্যায়ন
করতে।

তুমি আমার কাছে হিসাব গ্রহণকারী প্রভুর ভয় সহকারে আসলে তুমি তাঁর প্রভৃত কল্যাণ
লাভ করতে।

শুন, আল্লাহর দিকে বিনত হবার ও সত্য অনুসন্ধানের সময়কে বৃথা নষ্ট করো না।

হে চিন্তা-চেতনাশূন্য ব্যক্তি! তোমার সত্য গ্রহণে অনীহা একটি প্রাণবিনাশী বিষ।

তোমার দেহ লেলিহানস অগ্নিশিখা সহ্য করার আশ্চর্যজনক শক্তি রাখে, - তোমার এই
দারী থাকলে তুমি অনুশীলনশৰূপ প্রজ্জ্বলিত আঙুনে নিজেকে দক্ষ করে
দেখাও।

তোমার কী হয়েছে যে, তুমি অন্ত হ্রদয়ে চিকিৎসকের সন্ধান কর না।

অথচ তুমি শূলরোগের ন্যায় কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত।

সুতরাং হে বিদ্যের ক্ষেত্রে সীমালঞ্চনকারী!

আল্লাহকে ভয় কর এবং হীতাকাঙ্ক্ষীর সুপরামর্শের উপহার গ্রহণ কর।

সে দিনের আগুনকে ভয় কর যার শাস্তিকে কোন জ্ঞানীর অহংকার বা কোন গোত্রের
লোকদের পারম্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রতিহত করতে পারবে না ।
শক্রের সীমাইন অত্যাচারে আমরা বিরক্ত হয়ে গেছি ।
অত্যাচারের রাত অতি দীর্ঘ হয়ে গেছে, হে প্রভু! সাহায্য কর ।

তুমি রহীম, মেহশীল ও দয়ালু ।
তোমার বান্দাদের ধৰ্মসাত্ত্বক বিপদ থেকে মুক্তি দাও ।
তুমি অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ভুল-ভোগ্তা ও সীমালজ্জন দেখেছো, অতএব ক্ষমা কর,
সাহায্য কর আর শক্তি যোগাও ।

তুমি মহাসম্মানের অধিকারী সন্তা, সর্বোত্তম আচরণকারী প্রভু ।
সুতরাং দাসদের মনোনীত করার পর প্রত্যাখ্যান করো না ।
আমরা তোমার নিকট মৃতের ন্যায় এসেছি সুতরাং আমাদের সব নিজীব সঙ্গে প্রাণ
সঞ্চার কর ।

আমরা তোমার কাছে ক্ষমার আকুতি করছি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ।
হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে কার দ্বারে পাঠাবে?
তুমি কি আমায় ক্ষতিকর শক্রের হাতে ছেড়ে দেবে?
প্রভু! তোমার খাতিরে আমার প্রাণ নিবেদিত । তুমিই আমার জীবনের চুড়ান্ত লক্ষ্য ।
সুতরাং তোমার অনুগ্রহসহ এসো আর শুভ সংবাদ দাও ।

তুমি কি আমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো? আর কি স্নেহের সাথে কথা বলবে
না?
অথচ সমস্যায় পতিত হবার পূর্বে তুমি আমাকে সুসংবাদ দিতে!
এক নিমেষের জন্যও তোমার ভালবাসায় ভাটা পড়ার কথা আমি ভাবতে পারি না ।
কেননা তোমার আকূল ভালবাসা আমার হৃদয়কে পরিবেষ্টন করে রেখেছে ।
আমি সব সৌভাগ্য আনুগত্যের মাঝে দেখেছি । সুতরাং অন্যদেরকেও এমন নিষ্ঠাবান
হবার সৌভাগ্য দাও এবং সবকিছু সহজ কর ।

প্রভু তোমার সম্মানের দোহাই! তোমার অনুগত দাসকে দয়ার চাদরে আবৃত কর ।
তোমার নগন্য দাসের সাহায্যে ছুটে এসো, যাকে কাফের আখ্যা দেয়া হয়েছে ।
ইতোপূর্বে তুমি আমার দোয়া গ্রহণ করতে ।
তুমি যে সর্বক্ষেত্রে আমার বর্ম ও আশ্রয় ছিলে ।
হে প্রভু! আমার আকুতি শুন, হে প্রভু! আমায় সাহায্য কর ।
স্নেহের নির্দর্শনস্বরূপ আমাকে আমার লক্ষ্য অর্জনে সফলতার সংবাদ দাও এবং আমাকে
সময়ের পূর্বেই তা অবহিত কর ।

হে আমার আশ্রয়, হে আমার গন্তব্য, আমাকে তোমার জ্যোতিতে আলোকিত কর।
আমরা সর্বগুণী অঙ্গকার থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।
হে প্রভু! যে ন্যায় ও মীমাংসার শক্তি ও বিশ্বজ্ঞানাপরায়ণ তাকে ধৃত কর।
তার ওপর যথাযথ শাস্তি অবতীর্ণ কর এবং তাকে ধ্বংস কর।
হে আমার প্রভু! তোমার চিরস্তন রীতি অনুযায়ী আমার প্রতি স্থায়ী মমতা প্রদর্শন কর।
আমি যদি কোন প্রতিশ্রূতি ভুলে যাই তাহলে আমাকে স্মরণ করাও।
তুমি বড় দয়ালু প্রভু, বড় বদান্তার অধিকারী।
সুতরাং তুমি তোমার দাসদের কাছ থেকে লাঞ্ছনার দিনকে দ্রুত কর।
আমি ভীতিপূর্ণ তমসাছন্দ্র রাত প্রত্যক্ষ করছি।
অতএব তুমি তাকে কল্পণে তরে দাও আর আমাদেরকে উজ্জল দিনের শুভসংবাদ
দাও।
হে আমার মহাসমানিত খোদা! আমার ব্যাকুলতাকে দূর কর আর আমাকে মুক্তি দাও।
হে আমার প্রভু! আমার শক্তিকে টুকরা টুকরা করে দাও আর ধূলিস্যাং কর।
আমার গোপন বিষয় তোমার অজানা নয়,
আমার সুষ্ঠু বিষয় এবং আমার অন্তরের অস্তিত্বের স্বাক্ষর সবই তুমি জানো।
তোমার সুপেয় পানীয় কাঞ্চিত, সুতরাং এর বর্ণ প্রবাহিত কর।
তোমার মহিমা কীর্তণ আমার জীবনের উদ্দেশ্য, তাই সাহায্য কর আর তা প্রকাশ কর।
আমরা তোমাকে পরম দয়ালু হিসেবে পেয়েছি আমাদের আর চিন্তা কিসের!
তোমার মহান জ্যোতির দোহাই! আমাদেরকে অঙ্গকার যুগের অমঙ্গল থেকে রক্ষা কর।
আমাদের শেষ কথা হলো, সব প্রশংসা মহাসমানিত প্রভুর যিনি সর্বশক্তিমান ও
স্বাচ্ছন্দ্যদাতা।

ওসীয়ুত

এটি সর্বজনবিদিত বিষয়, কেউ সমালোচনা করলে এর উত্তরে সমালোচনা এবং
প্রশংসা করলে এর প্রতিদানে প্রশংসা করা আবশ্যিক হয়ে যায়। আপনি যদি কাউকে
বলেন, আপনার পিতা একজন ভদ্র ও পুণ্যবান মানুষ, উত্তরে সে কখনো, আপনার
পিতাকে একজন অভদ্র-পাপিষ্ঠ মানুষ বলবে না। বরং সে আপনাকে তাঁর উত্তম কথার
মাধ্যমেই সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে এবং আপনার পিতার সেভাবে প্রশংসা করবে,
যেভাবে আপনি তাঁর পিতার প্রশংসা করেছেন বরং আরো স্পষ্ট এবং আরো
জোরালোভাবে করবে। আর আপনি যদি তাঁর পিতাকে গালি দেন, তাহলে সে সেভাবেই
কথা বলবে যেভাবে আপনি বলেছেন। একইভাবে যারা হ্যারত আবু বকর সিদ্ধীক ও
উমর ফারামককে গালি দেয়, প্রকারান্তরে তারা আলীকে গালি দেয়, তাঁকে কষ্ট দেয় এবং
তাঁর প্রাপ্য অধিকারকে পদদলিত করে। আপনি যদি বলেন, আবু বকর কাফের, তাহলে
এমন কথা বলে আপনি সিদ্ধীকপ্রেমীদের উত্তেজিত করেন। তারা একথা বলে ফেলতে
পারে, আলী বড় কাফের। সুতরাং আপনার আচরণের মাধ্যমে আপনি আবু বকরকে নয়

বরং আলীকে গালি দিলেন আর সীমালজ্বন করলেন। আপনার পিতাকে গালি দিতে পারে এ ভয়ে আপনি অন্যের পিতাকে গালি দেয়া থেকে বিরত থাকেন। ঠিক একই কারণে আপনার সাথে যে শক্রতা রাখে তার মাকেও আপনি গালি দেন না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আপনি নবীপরিবারের সমানের প্রতি ভক্ষেপ করেন না আর তাদেরকে এর ক্ষতিকর দিকগুলো থেকে রক্ষার কোন চেষ্টা করেন না। শিয়া হবার দাবী এবং আহলে বাইতের জন্য ভালবাসার বড় বড় বুলি আওড়ানো সহ্রেও এর যে কুফল প্রকাশ পেতে পারে সে সম্পর্কে আপনি উদাসীন। সুতরাং হে রসূলপরিবার ও পাঁচ পবিত্র সন্তার শক্র এবং মুনাফেকদের রঙে রঙিন ব্যক্তি! তাঁদেরকে গালমন্দ করার সব পাপ আপনার কাঁধে বর্তাবে।

আমরা বলেছি, হযরত আবু বকর অতি বিরল গুণের অধিকারী একজন খোদা-প্রেমিক মানুষ ছিলেন, যিনি অঙ্ককার ছেয়ে যাবার পর ইসলামের দিগন্তকে পুনরায় জ্যোতিতে ভরে দিয়েছেন। তিনি ইসলামের জন্য এক সুদৃঢ় দেয়ালসম ছিলেন। যে (রাষ্ট্রদ্বৰ্হী হয়ে) ইসলামকে পরিভ্যাগ করেছে তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন আর যে সত্যকে অঙ্গীকার করেছে তিনি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। যে ইসলামে প্রবেশ করেছে তিনি তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি অসাধারণ কষ্ট সহ্য করেছেন এবং সৃষ্টি-জগতকে তিনি দুর্প্রাপ্য রত্ন দান করেছেন। এক পবিত্র দৃঢ়তার সাথে মরুবাসীদের শাসন করেছেন। তিনি সেই বলগাহীন উটকে (অর্থাৎ বিশৃঙ্খল আরবকে) চারণ ভূমিতে চরতে ও বসতে শিখিয়েছেন আর রাস্তার অনুসন্ধান ও যুদ্ধের ময়দানে কর্তৃত্বকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। কোন সমস্যার মুখে বা কোন যুদ্ধে তিনি ভয় পান নি অথচ চতুর্দিক থেকে নৈরাশ্যজনক অবস্থা তাঁকে ঘিরে ফেলেছিল। প্রত্যেক প্রতিপক্ষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তিনি বের হয়েছিলেন। কাপুরুষ ও জরাগ্রস্তের ন্যায় কোনো দুশ্চিন্তা তাঁকে পরাভূত করতে পারে নি। সব নৈরাজ্য ও সমস্যার সময় প্রমাণিত হয়েছে, তিনি ছিলেন পাহাড়ের চেয়েও দৃঢ়তর। যারা মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করেছে তাদের সবাইকে তিনি ধ্বংস করেছেন। মহান আল্লাহ'র খাতিরে সব সম্পর্ককে তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। ইসলামের পবিত্র নামকে সমুদ্রত করা আর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সাঃ)-এর আনুগত্যের মাঝেই ছিল তাঁর সব আনন্দ। সাবধান, নিজ ইমানের সুরক্ষা কর আর বাজে অভ্যাস পরিভ্যাগ কর। আমি একথাগুলো প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে বা পুর্বপুরুষদের অঙ্ক অনুকরণে বলি নি। বরং যখন থেকে আমার পা হাঁটতে আর আমার কলম লিখতে শিখেছে তখন থেকে গবেষণাকে মূল ব্রত আর গভীর চিন্তা-ভাবনাকে লক্ষ্য হিসেবে অবলম্বন করা আমার কাছে পছন্দনীয় হয়ে উঠেছে। সবকথার মূল রহস্য উদ্ঘাটন এবং আলেমদেরকে প্রশ্ন করা আমার রীতি ছিল। তদনুযায়ী আমি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে একান্ত সত্যবাদী হিসেবে দেখতে পেয়েছি আর একথা আমার কাছে নিশ্চিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। আমি যখন তাঁকে ইমামদের নেতা, ধর্ম ও উম্মতের সূর্যস্বরূপ দেখতে পেলাম তখন দৃঢ়ভাবে তাঁর আঁচল

আঁকড়ে ধরলাম আর তাঁর নিরাপত্তার ঢায়ায় আশ্রয় নিলাম । পুণ্যবানদের ভালবাসার দোহাই দিয়ে আমি আমার প্রভূর কাছে রহমত ভিক্ষা চেয়েছি । তদনুযায়ী তিনি আমার প্রতি দয়া করেছেন, আমাকে আশ্রয় প্রদান করেছেন এবং আমাকে সাহায্য ও লালন-পালন করে সম্মানিত লোকদের অঙ্গৰ্জু করেছেন । দয়া পরবশ হয়ে আমাকে এ শতাব্দির মুজাদিদ ও প্রতিক্রিত মসীহ নিযুক্ত করেছেন । তিনি আমাকে তাঁর সাথে বাক্যালাপের সম্মানে ভূষিত করেছেন । আমার দুঃখ দূর করেছেন আর আমাকে তা দিয়েছেন যা সমসাময়িক পথিকীর অন্য কাউকে দেয়া হয় নি । এ সবকিছু হয়েছে সেই উস্মী নবী (সাঃ) এবং সেসব নৈকট্যপ্রাণদের ভালবাসার কারণে । হে আমার আল্লাহ, তুমি কল্যাণ এবং শান্তি অবতীর্ণ করো তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, মানবকূল শিরোমণি খাতামুল আমিয়া মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি । আল্লাহর কসম, দু'টি পবিত্র গৃহে ও দু'টি পবিত্র কবরে হ্যরত আবু বকর রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন । কবর বলতে প্রধানত আমি সে গুহা বুুুুাছি যেখানে তাঁরা চরম উৎকঠার সময়ে লাশের ন্যায় আত্মগোপন করেছিলেন এবং সে কবর যা মদীনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কবরের সাথে সন্নিবেশিত রয়েছে । সুতরাঙ তুমি যদি চিন্তাশীল হয়ে থাকো তাহলে আবু বকরের মর্যাদাকে বুুোৱা চেষ্টা কর । আল্লাহ তাঁলা পবিত্র কুরআনে তাঁর ও তাঁর খিলাফতের প্রশংসা করেছেন এবং সর্বোত্তম ভাষায় তাঁকে সাধুবাদ জানিয়েছেন । তিনি যে খোদার প্রিয়ভাজন এবং পছন্দনীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন-এতে কোন সন্দেহ নেই ।

তাঁর মর্যাদাকে রঞ্জ ব্যক্তি ছাড়া আর কে খাটো করে দেখতে পাবে? তাঁর খিলাফতের মাধ্যমে ইসলামের চেহারায় লেপনকৃত সব কালিমা দূর হয়েছে । তাঁর স্নেহ ও ভালবাসার মাধ্যমে মুসলমানদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে । সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সাঃ)-এর বক্তু সন্দীক যদি না হতেন তাহলে ইসলামের স্তম্ভ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল । ইসলামকে তিনি বার্ধক্য পীড়িত, দুর্বল ও বেদনা-বিহুল এবং জীৰ্ণ-শীর্ণ অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি তখন দক্ষ লোকদের ন্যায় এর সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য বহালের উদ্দেশ্যে উঠে পড়ে লেগে যান । ইসলামের হারানো ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে তিনি সেই ব্যক্তির মত হয়ে যান যার সবকিছু লুটে নেয়া হয় আর সে হারানো সম্পদের খোঁজে জঙ্গলে দূর-বহুদূর চলে যায় । এক পর্যায়ে ইসলাম তার বাহ্যিক ভারসাম্য, চেহারার সৌন্দর্য ও সজেজতা এবং নিজ সুপেয় পানির সুমিষ্টতা ফিরে পেয়েছে । এ সবকিছু হয়েছে সবচেয়ে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত এ বান্দার মাধ্যমে । নিজ প্রাণের প্রতি চরম অত্যাচার করে তিনি এ পরিবর্তন এনেছেন । দয়ালু খোদার সন্তুষ্টি ছাড়া তিনি অন্য কোন প্রতিদান কামনা করেন নি । দিবারাত্রি তাঁর একাজেই কেটে গেছে । তিনি নিজীব হাড়ে প্রাণসঞ্চারী আর বিপদাবলীকে প্রতিহতকারী এক মানুষ ছিলেন এবং ঘুমন্ত লোকদের তিনি জাগিয়ে তুলেছেন । ঐশী সাহায্য বলতে যা বুুোৱা এর পুরোটাই তাঁর ভাগ্যে জুটেছে । এটি খোদার অনুগ্রহ ও দয়ার কারণে হয়েছে । এখন আমরা খোদার ওপর ভরসা করে কিছু সাক্ষ্য উপস্থাপন করছি যেন তোমার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় যে তিনি কিভাবে প্রবল বাড়ের মত মৈরাজ্যকে আর জুলিয়ে ছাই করে দেয়ার মত সমস্যাবলীকে

নির্মূল করেছেন এবং যুক্তে বর্ণাবাজ ও তরবারি পরিচালনাকারীদের নিশ্চিহ্ন করেছেন। সুতরাং কর্মের আলোকেই তাঁর অভ্যন্তরীণ চিত্র স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর কর্মকান্ড তাঁর বৈশিষ্ট্যের স্বরূপকে প্রকাশ করেছে। সুতরাং আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম পূরকারে ভূষিত করেছেন, মুস্তাকীদের নেতা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে একত্র করেছেন আর এমন সব বঙ্গ দান করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং হে নেয়ামত ও পূরকারের মালিক! তুমি আমার এ প্রচেষ্টা গ্রহণ করো, কেননা তুমি পরম দয়ালু এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কৃপালু।

সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও মানবকুল ইমামে (সাঃ)-এর অন্তর্ধানের পর ধর্মত্যাগের অরাজকতা

রসূলে করীম (সাঃ)-এর তিরোধানের পর আরবের জাতি মুরতাদ হয়ে যায়। কোন ক্ষেত্রে পুরো এক গোত্র আর কোন কোন ক্ষেত্রে গোত্রের অংশ বিশেষ মুরতাদ হয়। একই সাথে কপটাতও মাথা চাড়া দেয়। ঝড়বৃষ্টিপূর্ণ রাতে বিক্ষিণ্ড-বিছিন্ন মেষপালের অবস্থা যেমন হয়, মুসলমানদের অবস্থাও জনবলের অভাব, শক্রের সংখ্যাধিক্য আর স্থীয় নবীকে হারানোর বেদনায় অনুরূপ হয়ে যায় (তারিখ ইবনে খবদুন, দ্বিতীয় খন্দ, পৃষ্ঠা ৬৫)।

তিনি (অর্থাৎ ইবনে খবদুন) আরো বলেন: আরবের সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণীর সব মানুষ মুরতাদ হয়ে যায়। 'তাঙ্গ' এবং 'বনী আসাদ' গোত্রে 'তোলায়হা'-র হাতে সমবেত হয়। গাতফান গোত্রও মুরতাদ হয়ে যায়। 'হাওয়ায়েন' গোত্রের লোকেরাও কিছু দিন পরিস্থিতি দেখার পর যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। 'বনী সোলাইম' এর বিশিষ্ট লোকেরা মুরতাদ হয়ে যায়। এক কথায় সর্বত্র, সব পর্যায়ের মানুষ মুরতাদ হয়ে যায় (পৃষ্ঠা: ৬৫)।

ইবনে আসির তার ইতিহাসে লিখেছেন, রসূলে করীম (সাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ যখন মকায় পৌঁছে তখন সেখানে রসূলুলাহুর যাকাত সংগ্রহকারী (আমেল) ছিলেন এতাব বিন উসায়েদ। তিনি সেখান থেকে পলায়ন করেন আর পুরো মক্কা প্রকল্পিত হয়ে ওঠে এবং মক্কাবাসীরা ধর্মত্যাগের দ্বারপ্রাণে এসে উপনীত হয় (ইবনে আসির, প্রথম খন্দ, পৃষ্ঠা ১৩৪)।

তিনি আরো বলেন, আরবের সব গোত্রের আপামর জনতা মুরতাদ হয়ে যায়, কপটতা প্রকাশ পায় আর ইহুদী-খ্রীস্টান মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ঝড়বৃষ্টিপূর্ণ রাতে বিক্ষিণ্ড মেষপালের অবস্থা যেমন হয়, মুসলমানদের অবস্থাও জনবলের অভাব, শক্রের সংখ্যাধিক্য আর স্থীয় নবীকে হারানোর বেদনায় অনুরূপ হয়ে যায়। জনতা আবু বকরের উদ্দেশ্যে বলে, এদের বিষয়টি অর্থাৎ উসামার বাহিনী তথা মুসলিম সৈন্য পাঠানোর বিষয়টি সম্পর্কে ভেবে দেখা দরকার, কেননা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, গোটা

আরব আপনার বিরুক্তে দাঁড়িয়ে গেছে। মুসলমানদের একটি জামাতকে এখন আপনার কাছ থেকে দূরে পাঠানো সমীচীন হবে না। আবু বকর বললেন, সে সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! হিংস্র পশু আমার লাশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে আমি যদি নিশ্চিতও হয়ে যাই তবুও আমি হ্যুর (সাঃ)-এর নির্দেশ অনুসারে ওসমার নেতৃত্বাধীন বাহিনীকে প্রেরণ করবোই। হ্যুর (সাঃ) যে সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন আমি তা পরিবর্তন করতে পারি না। হয়রত আবদুলাহ বিন মাসুদ (রাঃ) বলেন, আবু বকরের মাধ্যমে আল্লাহ যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন তাহলে মহানবী (সাঃ)-এর তিরোধানের পর আমরা ধ্বংসের দ্বারপ্রাণ্তে উপনীত হয়ে গিয়েছিলাম। যাকাতের উট পূর্ণবয়ক্ষ হোক বা দুধের বয়সের হোক আমরা এর জন্য যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমরা সব আরব গ্রামকে আয়তে আনার আর আম্ভু আল্লাহর ইবাদত করার ব্যপারে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলাম। (প্রাণক্ষণ্ট, পঃ : ১৪২)

নবগুরুত্বের মিথ্যা দাবীকারকের আবির্ভাব

ইয়েমেন-এ আসওয়াদ, ইয়ামামায় মুসায়লামা, বনী আসাদে তোলাইহা বিন খোয়াইলেদ মাথাচাড়া দেয় আর তাদের সবাই নবী হবার দাবী করে (ইবনে খলদুন, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ৬০)। বনী আক্ফানের সাজাহ বিনতে হারেস নবী হবার দাবী করে। এরপর একই পথ যারা অনুসরণ করে তারা হলো বনী তাগলবের হজাইল বিন ইমরান, নামেরের আকাবা বিন হেলাল, শিবানের সলীল বিন কায়েস এবং জেয়াদ ইবনে বেলাল। এদের সাথে যুক্ত হয়ে আরব উপদ্বীপের একটি বিশাল বাহিনী আবু বকরের বিরুক্তে যুদ্ধ করার মানসে মদীনা অভিযুক্ত যাত্রা করে (প্রাণক্ষণ্ট, পৃষ্ঠা ৬৫)।

নিজের স্থলে মহানবী (সাঃ) কর্তৃক নামাযে ইমামতির জন্য আবু বকরকে স্তুলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা

ইবনে খলদুন বলেন, “সর্বশেষ রোগে” হ্যুর (সাঃ)-এর কষ্ট বেড়ে গেলে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। তাঁর জ্বীগণ, আহলে বায়ত, আবরাস ও আলী একত্র হলেন। নামাযের সময় হলে তিনি (সাঃ) বলেন, “তোমরা আবু বকরকে নামায পড়াতে বল।” (দ্বিতীয় খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা)।

মহানবী (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে আবু বকরের পদবৰ্ণনা

ইবনে খলদুন আরো বলেন, “তিনটি বিষয়ে ওসীয়ত করার পর হ্যুর (সাঃ) বলেন, আবু বকরের দরজা ছাড়া মসজিদে প্রবেশের বাকি সব দরজা বন্ধ করে দাও। কেননা সাহাবিদের মাঝে আবু বকরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ কোন সাহাবী আছে বলে আমি মনে করি না।” (২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬২)।

হ্যুর (সাঃ)-এর জন্য আবু বকরের পরম ভালবাসা

ইবনে খল্দুন উল্লেখ করেন, “হ্যরত আবু বকর (রাঃ) হ্যুর (সাঃ)-এর মৃতদেহের কাছে এলেন এবং তাঁর পবিত্র চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে চুমু খেলেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত। আল্লাহু আপনার জন্য যে মৃত্যু লিখে রেখেছিলেন আপনি এর স্বাদ গ্রহণ করেছেন। তিনি এরপর আপনাকে আর কখনো মৃত্যু দিবেন না (পঃ ৬৩)। তাঁর প্রতি আল্লাহু তাঁ’লার সূক্ষ্ম অনুগ্রহরাজি ও রসূলুল্লাহর বিশেষ নৈকট্যের একটি বিষয় যার কথা ইবনে খল্দুন বিধৃত করেছেন তা হলো, তাঁকে (রাঃ) সেই খাটেই বহন করা হয়েছে যাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দেহ বহন করা হয়েছিল। তাঁর কবর সেভাবে বানানো হয়েছে যেভাবে মহানবী (সাঃ)-এর কবর বানানো হয়েছিল। তাঁর লাহদকে (কবরের তাক) হ্যুর (সাঃ)-এর লাহদের সাথে জুড়ে বানানো হয়েছে। আর তাঁর মস্তক হ্যুরের কাঁধের পাশে রাখা হয়েছে। তাঁর শেষ উক্তি ছিল: “আমাকে সমর্পিত অবস্থায় মৃত্যু দাও আর পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করো” (প্রাণক, পঃ ১৭৬)।

আল্লাহর নিদর্শনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) যা-ই সূচিত করেছেন তার সুরক্ষার ক্ষেত্রে আবু বকরের দৃঢ়তা সম্পর্কে জানার জন্য এখানে একটি চিঠি উদ্ধৃত করা আবশ্যিক। হ্যরত আবু বকর সিদ্ধীক আরবের বিভিন্ন মুরতাদ গোত্রের প্রতি এটা লিখে প্রেরণ করেছিলেন, এ সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তি যেন ঈমান ও অঙ্গৰ্ছিতে উন্নতি করতে পারে।

বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম

এতদ্বারা আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর খলীফা আবু বকরের পক্ষ থেকে সর্বসাধারণের যার কাছেই এ পত্র পৌছে তাকে জানানো যাচ্ছে, সে নিজে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত থাকুক বা না থাকুক, যে সঠিক পথের অনুসরণ করে আর সত্য গ্রহণের পর ভ্রষ্টতা ও অঙ্গত্বের দিকে ফিরে না যায় তার প্রতি শাস্তি বর্ষিত হোক। আমি তোমাদের সামনে সেই খোদার প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিছি, আল্লাহ ভিন্ন কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, আর মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বাদ্দা ও রসূল। তিনি যা নিয়ে এসেছেন আমরা তা গ্রহণ করি আর যে তা অৰ্থীকার করে আমরা তাকে কাফের আখ্যা দেই। আমরা তার বিরুদ্ধে জিহাদ করি। আল্লাহ তাঁ’লা নিজ সন্নিধান থেকে, যারা জীবিত তাদের সতর্ক করাতে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে শুভ সংবাদদাতা, সতর্ককারী, খোদার দিকে আহবানকারী ও দীক্ষিণান সূর্য হিসেবে মানবের প্রতি সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং যে সাড়া দিয়েছে আল্লাহ তাকে সত্যের পানে হেদায়াত দিয়েছেন। আর যে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেছে তার বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ততক্ষণ সংগ্রাম করেছেন যতক্ষণ সে স্বতঃকৃতভাবে বা বাধ্য হয়ে ইসলামের দিকে ফিরে না এসেছে। এরপর তিনি (সাঃ) ইস্তেকাল করেন। তিনি আল্লাহর ইচ্ছাকে পৃথিবীতে প্রবর্তন করেছেন এবং

উন্মত্তের হিতসাধনের জন্য সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব তিনি পুঝানুপুঝভাবে পালন করেছেন। আল্লাহ তা'লা তাঁর ও ইসলামের অনুসারীদের জন্য তাঁর নায়িলকৃত গ্রন্থে তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ۝
وَمَا جَعَلْنَا لَبْشَرًّا مِّنْ قَبْلِكَ الْحَلْدَةَ أَفَإِنْ مَتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ۝
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ
عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقِلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ
الشَّاكِرِينَ ۝

(যুমার: ৩১, আমীয়া: ৩৫, আলে ইমরান: ১৪৫)

যে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইবাদত করতো তার জানা উচিত, তিনি (সাঃ) মৃত্যু বরণ করেছেন আর যে এক-অঙ্গীয় আল্লাহর ইবাদত করে, আল্লাহ অবশ্যই তার অপেক্ষা করছেন, তিনি চিরঞ্জীব ও জীবনদাতা, চিরস্থায়ী ও স্থিতিদাতা। তিনি মরেন না আর তদ্দুও তাঁকে স্পর্শ করে না। তিনি নিজ ইচ্ছার বাস্তবায়ন করেন, শক্তিদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং তাদের কর্মফলও দিয়ে থাকেন। আমি তোমাদেরকে খোদার তাকওয়া অবলম্বন এবং তাঁর সন্নিধানে নিজেদের ভাগ্য ও অদ্বিতীয় সুনিশ্চিত করার তাকিদপূর্ণ পরামর্শ দিচ্ছি। এছাড়া তোমরা তোমাদের নবী (সাঃ) কর্তৃক আনিত হেদয়াতকে অবলম্বন কর এবং আল্লাহর ধর্মকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। কেননা, আল্লাহ যাকে হেদয়াত না দেন সে ভষ্ট, যাকে তিনি আরোগ্য না দেন সে অসুস্থ আর যাকে তিনি সাহায্য না করেন, সে পরিত্যক্ত। আর আল্লাহ যাকে হেদয়াত দেন সে-ই হেদয়াতপ্রাপ্ত আর যাকে তিনি ভষ্ট আখ্যা দেন সেই পথভষ্ট। আল্লাহ তা'লা বলেন,

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمَهْتَدِيٌ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا

(সূরা কাহাফ : ১৮)

এ পৃথিবীতে যতক্ষণ সে নিজের ভাস্তির জন্য অনুশোচনা না করবে ততদিন তার কোনো কর্ম তিনি গ্রহণ করবেন না, পরকালেও তার পক্ষে কোন সুপারিশ বা কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। আমার কাছে এ সংবাদ এসেছে, তোমাদের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ আর এ অনুশীলন ও আমলের পর আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত হয়েছে আর তাঁর নির্দেশ সম্পর্কে অজ্ঞতার শিকার হয়ে শয়তানের ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং নিজ ধর্মকে ছেড়ে দিয়েছে। আল্লাহ তা'লা বলেন, ওয়া ইয়া কুলনা লিলমালাইকাতে উসজুদু লেআদামা আমি তোমাদের প্রতি আনসার, মুহাজের ও যারা পুণ্যের ক্ষেত্রে তাদের পদাঙ্ক অনুসারী তাদের মধ্য থেকে ‘অমুক’ ব্যক্তিকে প্রেরণ করলাম এবং আমি

তাঁকে নির্দেশ দিয়েছি, সে যেন কারো সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ না করে, আর কাউকে হত্যা না করে যতক্ষণ তাকে আল্লাহর শিক্ষার দিকে ডাকার দায়িত্ব সমাধা না করে। যে তার ডাকে সাড়া দেবে, মেনে নেবে ও বৈরিতা থেকে বিরত থাকবে আর নেক করবে, তার পক্ষ থেকে সে যেন তা অবশ্যই গ্রহণ করে আর তাকে যেন সাহায্য করে। যে অস্থিকার করবে তার সম্পর্কে আমি আমার দৃতকে নির্দেশ দিয়েছি, সে যেন এ কারণে তার বিরক্তে যুদ্ধ করে। এদের যে ব্যক্তিকেই সে আয়নে পায় তাকে পুড়িয়ে ফেলা এবং হত্যা করার ব্যপারে যেন করণা না করে এবং তাদের মহিলা ও বাচ্চাদের যেন গ্রেফতার করা হয়। এক কথায় ইসলাম ছাড়া কারো কাছ থেকে যেন অন্য কিছু গ্রহণ না করা হয়। যে তা মেনে চলবে তার ভাল হবে। যে তাকে প্রত্যাখ্যান করবে সে আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারব না। আমি আমার দৃতকে নির্দেশ দিয়েছি, সে যেন প্রত্যেক সভায় তোমাদের সামনে আমার চিঠি পাঠ করে শুনায়। কাফের ও বিশ্বাসীর মাঝে প্রত্যেক সাব্যস্তকারী বিষয় হলো, আযান। মুসলমান যখন আযান দেয় তখন তোমরাও আযান দিও... তাহলে যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে যেও। তারা যদি আযান না দেয় তাহলে তাদের আক্রমণ কর। আর যদি তারা আযান দেয় তাহলে তাদেরকে তাদের দায়িত্ব পালন করতে বল। যদি তারা অমান্য করে তাহলে তাদের আক্রমণ কর। আর যদি তারা নিজ দায়িত্ব পালনে সম্মত হয় তাহলে তাদের পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করা হবে।

লেখকের কথা

নিচয় সাহাৰা সবাই সূর্যতুল্য।

তাঁৰা সৃষ্টিকে আপন জ্যোতিতে ভৱে দিয়েছেন।

তাঁৰা স্বজনদেৱ পরিত্যাগ কৰেছেন এবং পৰিবাৱ-পৰিজনেৱ ভালবাসা বিসৰ্জন দিয়েছেন।

আল্লাহৰ রসূলেৱ কাছে তাঁৰা ফকীৰ বেশে এসেছেন।

তাঁদেৱকে জবাই কৰা হয়েছে কিষ্ট সত্যনিষ্ঠার কারণে তাঁৰা মানুষকে ভয় কৱেন নি।

বৱং তাঁৰা সমস্যাৱ মুখে কেবল রহমান খোদাকেই প্ৰাধান্য দিয়েছেন।

নিষ্ঠার কারণে মাথাৱ ওপৰ নগল তৱৰাবী ঝুলন্ত থাকা সত্ৰেও তারা কলেমা শাহাদত পড়া থেকে বিৱত হন নি।

তাঁৰা নিষ্ঠার সাথে উন্মুক্ত জনসভাতেও একত্ৰিতাদেৱ সাক্ষ্য দিয়েছেন।

তাঁৰা আন্তৰিকতাৱ সাথে সব রণক্ষেত্ৰে উপস্থিত ছিলেন।

তাঁৰা সেসব যুদ্ধেৱ জন্য প্ৰস্তৱাকীৰ্ণ প্ৰাপ্তৱে স্বতঃকৃতভাৱে একত্ৰ হয়েছেন।

তাঁৰা পুণ্যবান ছিলেন এবং স্বীয় প্ৰভুৰ ভয় নিয়ে জীবন-যাপন কৱতেন।

তাঁর স্মরণে কেঁদে-কেঁদে তাঁরা রাত অতিবাহিত করতেন ।

তাঁরা এক সম্মানিত জাতি, আমরা তাদের কারো মধ্যে কোনো তারতম্য করি না ।

আর তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গস্বরূপ ছিলেন ।

তাঁদের সম্পর্কে মানুষের সমালোচনা সত্য নয় ।

বরং এসব এদের ঘৃণা-বিদ্যে যা নিচক কুপ্রবৃত্তির সৃষ্টি ।

আমি রসূল (সাঃ)-এর সাহাবাকে প্রভুর সন্ধিধানে স্থায়ী সম্মানের আসনে সমাসীন দেখি ।

তাঁরা অভিযানকালে ও বাড়িতে থাকাকালে সর্বাবস্থায় রসূলের আনুগত্য করেছেন ।

এবং নিজ বস্তুর পায়ের ধুলাসদৃশ হয়ে গেছেন ।

চরম ভট্টাত ও মারাত্মক বিশৃঙ্খলার সময় তাঁরা পরম বিশ্বস্ততার সাথে আমাদের নবীর সাহায্যকল্পে সোচার ছিলেন ।

তাঁরা আল্লাহর জন্য সব পরীক্ষাকে বরণ করেছেন ।

তাদেরকে যখন হত্যা বা দেশান্তরিত করা হয়েছে তখনও তাঁরা হেসেছেন ।

তাঁদের জ্যোতি যে কোনো সুবজ্ঞার বজ্ঞাতার জ্যোতি থেকে সমধিক উজ্জ্বল ।

প্রত্যেক বিদ্যৈর চেহারা তাঁদের মাধ্যমে কালিমা লিঙ্গ হয় ।

অতএব তুমি তাঁদের অবদান ও তাঁদের দৃঢ়চিত্তাকে দেখ ।

শক্রকে তাদের ক্রোধ ও আগুনের মাঝে ছেড়ে দাও ।

হে প্রভু! তুমি আমাদের প্রতি নবী (সাঃ)-এর সাহাবিদের কল্যাণে দয়া কর ।

আর আমাদের ক্ষমা কর, কেননা তুমিই সব নিয়ামতের অধিকারী আল্লাহ ।

আল্লাহ জানেন, আমার যদি শক্তি থাকতো আর আমি যদি না মরতাম

তাহলে শক্রদের মধ্যে সাহাবিদের প্রশংসায় গান গেয়ে বেড়াতাম ।

তুমি যদি তাঁদের অভিসম্পাত কর এবং হীনতার বশবত্তী হয়ে বিদ্রূপ কর,

তাহলে তুমি নিজেও এমন সব ঠাট্টার সম্মুখীন হবার অপেক্ষা কর ।

যে নবী (সাঃ)-এর সাহাবিদের গালি দেয় সে ধর্বসপ্রাণ ।

এটি সত্য কথা আর এর কিছুই গোপন নয় ।

সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে

একটি বিজ্ঞাপন

যারা শেখ মোহাম্মদ হসেইন সাহেব বাটালভীর পত্রিকা ‘ইশায়াতুস সুন্নাহ’ দেখেছেন অথবা তার বক্তব্য শুনেছেন বা তার চিঠি-পত্র পড়েছেন, তারা এ কথার সাক্ষ্য দিতে পারবেন, শেখ সাহেব এ অধম সম্পর্কে কী কী বলেছেন এবং কেমন অহমিকাপূর্ণ বাক্য ও অহংকারসূচক আজে-বাজে কথা তার মুখ দিয়ে বের হয়েছে। একদিকে তিনি এ অধমকে মিথ্যাবাদী ও প্রতারক আখ্যায়িত করেছেন আর অন্য দিকে দাপটের সাথে মরিয়া হয়ে দাবী করেছেন, “আমি (অর্থাৎ শেখ মোহাম্মদ হসেইন বাটালভী) প্রথম সারির মৌলভী এবং এ ব্যক্তি (অর্থাৎ মির্যা গোলাম আহমদ) একান্তই অজ্ঞ, মূর্খ এবং আরবী ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত”। এরূপ বাজে কথা বলার পিছনে সম্ভবত তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করা। ফলে একদিকে তারা শেখ বাটালভীকে শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানী ব্যক্তি বলে গ্রহণ করবে, আরবী ভাষার উচ্চ মানের বিশেষজ্ঞ হিসেবে মেনে নেবে, অন্যদিকে আমাকে ও আমার বক্তব্যকে সন্দেহাতীতভাবে অজ্ঞ মনে করবে। এর ফলাফল হিসেবে তারা ভাববে, অজ্ঞদের ওপর নির্ভর করা যায় না, যারা সত্যিকার অর্থেই শিক্ষিত মৌলভী কেবল তাদের সাক্ষ্যই নির্ভরযোগ্য। আমি এ দুর্ভাগ্যকে লাহোরের একটি বড় জনসভায় আমার এ ইলহামও শুনিয়েছিলাম, ‘ইনি মুহীনুম মান আরাদা এহানাতাকা’ অর্থাৎ আমি তাকে লাঞ্ছিত করবো যে তোমাকে অপমান করতে প্রয়াসী। কিন্তু বিদেশ বেশি থাকার কারণে, এ ইলহামের বাণী তার কান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি। এ অধম আরবীর একটি অক্ষরও জানে না একথা সে মানুষের মনে বদ্ধমূল করতে চেয়েছিল। কিন্তু খোদা তা’লা এটিকে তার জন্য আত্মাতী সাব্যস্ত করেছেন। এটি সেই ইলহাম যাতে জানানো হয়েছে, ‘আমি তাকে লাঞ্ছিত করবো যে তোমাকে অপমান করতে চাইবে’। সুবহানাল্লাহ! তিনি কত শক্তিশালী যিনি অসহায়দের নিরাপত্তিবিধায়ক কিন্তু এ সন্দেও মানুষ ভয় করে না। যে ব্যক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, সে অজ্ঞ এবং একটি ‘সীগা’ (বা আরবী পদ) সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞান নেই। মৌলভী হবার দাবিদার এমন সব কুফরী-ফতোয়াবাজদেরকে ঘ্যর্থহীন ভাষায় সে ব্যক্তিই বলছে, “আমার রাচিত তফসীরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারলে তফসীর লেখো এবং হাজার রূপী পুরক্ষার নাও। ‘নূরুল হক্ক’ পুস্তকের উত্তর দিতে চাইলে প্রথমে কারো কাছে পাঁচ হাজার রূপী জামানত রাখতে আমাকে বাধ্য কর।” কিন্তু কোনো মৌলভী এ কাজে এগোতে সাহস করে নি। এটি কি খোদা তা’লার নির্দশন নয়? এটিই কি সেই পার্ডিত্যের বলক যাকে পুঁজি করে আমাকে কাফের সাব্যস্ত করা হয়েছে? হে শেখ! ইলহামটি পূর্ণ হয়েছে কি হয় নি এবার চিন্তা করে বল। অগণিত মানুষ জানে, আমি এ মীমাংসার উদ্দেশ্যেই এবং এ মানসেই আরবী ভাষায় ‘কিরামাতুস সাদেকীন’ এবং এরপর ‘নূরুল হক্ক’ পুস্তি

কাও রচনা করেছি যেন শেখ বাটালভীর মৌলভীগিরি আর কুফরী ফতোয়া প্রদানকারীদের স্বরূপ সবার সামনে উমোচিত হয়। আমি প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দিয়ে বলেছিলাম, শেখ বাটালভী অথবা ফতোয়াবাজ মৌলভীদের কেউ যদি ‘কিরামাতুস সাদেকীন’ পুষ্টকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোনো পুস্তক রচনা করে তাহলে সে এক হাজার রূপী পুরক্ষার পাবে। আর ‘নূরুল হক্ক’-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি কোনো পুস্তিকা রচনা করে তাহলে তাকে পাঁচ হাজার রূপী পুরক্ষার দেয়া হবে। কিন্তু জবাবে তারা কিছু লিখতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা এ কাজের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলাম তা ছিল ১৮৯৪ সনের জুন মাসের শেষ দিন। এটা ইতোমধ্যেই অতিবাহিত হয়ে গেছে। শেখ সাহেবের এরূপ নীরবতার ফলে প্রমাণিত হলো, তিনিই আরবী ভাষার বিষয়ে অজ্ঞ ও অনবহিত। কেবল একটই নয়, বরং একথাও প্রমাণ হয়ে গেল, তিনি একজন প্রথম সারিয়ে মিথ্যাবাদী, মিথ্যাচারী ও নির্লজ্জ। কেননা তিনি মৌখিকভাবে এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে (আমার সম্পর্কে) স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, এই ব্যক্তি আরবী ভাষার জ্ঞানশূন্য ও অজ্ঞ অর্থাৎ আরবীর একটি শব্দও জানে না। সুতরাং এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়ে যখন তার জন্য নিজ জ্ঞানের বহর প্রকাশ করা একান্তই আবশ্যক ছিল, তা না করে কেন তিনি এমনভাবে নিশ্চৃপ হয়ে রইলেন যেন ইহজগতেই নেই! ভেবে দেখা উচিত, আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে তাকে বারবার আহ্বান করেছি। আর কতভাবে তার আআভিমানকে জ্ঞাত করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তিনি এদিকে ফিরেও তাকান নি। শেখ সাহেব আরবী বিশেষজ্ঞ কিনা আমরা কেবল তা মীমাংসার জন্য ‘নূরুল হক্ক’ পুস্তিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বলেছিলাম, শেখ সাহেব যদি তিনি মাসের মধ্যে এ ধরনের পুস্তক রচনা করে প্রকাশ করেন এবং সে পুস্তক প্রকৃতপক্ষেই যদি বাণিজ্যের সব শর্তের নিরিখে এবং সত্য ও প্রজ্ঞার মানদণ্ডে ‘নূরুল হক্ক’-এর সমপর্যায়ের সাব্যস্ত হয় তাহলে পুরক্ষারস্বরূপ নগদ তিনি হাজার রূপী তাকে প্রদান করা হবে। এছাড়া এতে আমার ইলহামকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্যও একটি সহজ ও পরিষ্কার উপায় তার হস্তগত হবে এবং সহস্র অভিসম্পাতের কালিমা থেকেও তিনি রক্ষা পাবেন। অন্যথায় তিনি কেবল পরাজিতই হবেন না বরং ইলহামের পূর্ণতার লক্ষ্যস্থল সাব্যস্ত হবেন। কিন্তু শেখ সাহেব এ বিষয়গুলোর কোনটির প্রতিই জঙ্গেপ করেন নি আর কোনো প্রকার আআভিমানও প্রদর্শন করেন নি। এর কারণ কী? কারণ একটাই- এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ ছিল শেখ সাহেবের সাধ্যের বাইরে। তাই তিনি অপারগ হয়ে নিজের লাঙ্ঘনাকে মেনে নিয়েছেন এবং এদিকে পা-ই বাড়ান নি। এটি “ইনি মুহীনুম মান আরাদা এহানাতাকা” -এ ইলহামেরই সত্যায়ন। শেখ সাহেব মিষ্টেরের উপর দাঁড়িয়ে শত শত ব্যক্তির সামনে বিভিন্ন উপলক্ষে বার বার এ অধম সম্বন্ধে বলেছেন, এ ব্যক্তি আরবী ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ এবং ধর্মীয়-জ্ঞান সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত এবং একজন অশিক্ষিত মিথ্যাবাদী ও দাঙ্জাল। তিনি এখানেই ক্ষান্ত হন নি বরং এ বিষয় সম্বলিত শত শত চিঠি তার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে লিখেছেন এবং বিভিন্ন স্থানে তা প্রচার

করেছেন। নিজের নির্বোধ বঙ্গ-বাঙ্কবদের মনে এ ধারণাটিকেই সত্য বলে বঙ্গমূল করেছেন। তাই আগ্নাহ তাঁ'লা এ অহংকারীর ঔন্দ্রত্যকে পদদলিত এবং এ একগুঁয়ে ব্যক্তির দস্তকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার ইচ্ছা করলেন আর তাকে দেখাতে চাইলেন, তিনি কীভাবে তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেন। সুতরাং তাঁর দেয়া সাহায্য ও সামর্থ্য এবং বিশেষ শিক্ষা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে এ পুস্তকগুলো রচিত হয়েছে। এই মৌলভী এবং সব বিরুদ্ধবাদীর জন্য আমরা 'কিরামাত্সুস সাদেকীন' ও 'নূরুল হক্ক'-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে আবেদন পত্র দাখিলের সময়সীমা নির্ধারণ করেছিলাম ১৮৯৪ সনের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত। এ তারিখ অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন উক্ত দু'টি পুস্তকের পর এই পুস্তিকা 'সিরুল খিলাফাহ' রচনা করা হয়েছে। এটির কলেবর খুবই সংক্ষিপ্ত। কবিতা এতে কমই আছে। একজন আরবী জানা মানুষ এ ধরনের পুস্তিকা সাত দিনে খুব সহজেই রচনা করতে পারেন এবং তা ছাপার জন্য দশ দিনই যথেষ্ট। কিন্তু আমরা শেখ সাহেবের অবস্থাদ্বারে এবং তাঁর বঙ্গদের অযোগ্যতাহেতু একান্ত করণাবশত দশ দিন সময় বর্ধিত করছি। এভাবে প্রদত্ত সময় সাতাশ দিন দাঁড়ালো। সুতরাং প্রতিদিনের বিনিময়ে এক রূপী হিসেবে সাতাশ রূপী পুরস্কার ঘোষণাপূর্বক আমি এ পুস্তক প্রকাশ করছি। শেখ সাহেব ও তাঁর সমমনা তথাকথিত মৌলভীদের সমীপে অনুরোধ রইলো, তাঁরা নিজেদের দুর্ভাগ্যের কারণে সহস্র রূপী পুরস্কার গ্রহণ করা থেকে বাধিত থাকলো, পুনরায় পাঁচ হাজার রূপীর পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। কিন্তু তাঁদের অযোগ্যতার কারণে সে সময়টাও হাতছাড়া হয়ে গেল, আবেদনের তারিখ পেরিয়ে গেল। কিন্তু এখন তাঁরা যেন এ সাতাশ রূপী হাতছাড়া না করেন। আমরা শুনেছি, শেখ সাহেবের বর্তমানে আর্থিকভাবে অনেক কষ্টে আছেন। নামে মাত্র বঙ্গুরা তাঁর সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করে নি।* তাই বর্তমানে তাঁর জন্য এক রূপী এক স্বর্গমুদ্রা সমান মূল্য রাখে। এ সাতাশ রূপী যেন সাতাশটি স্বর্গমুদ্রা। এ দিয়ে অনেক কাজ সম্পাদন করা যেতে পারে। আমরা সত্য সত্যিই অঙ্গীকার করছি, শেখ সাহেবের যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে 'সিরুল খিলাফাহ' পুস্তিকার কোন জবাব লিখে প্রকাশ করেন আর সে পুস্তিকা যদি আমাদের পুস্তিকার সমতুল্য প্রমাণিত হয় তাহলে আমরা তাকে যে কেবল সাতাশ রূপী দেব তা-ই নয় বরং লিখিতভাবে এ মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করবো, শেখ সাহেবে অবশ্যই আরবী ভাষাবিদ এবং 'মৌলভী' আখ্যায়িত হবার যোগ্য। বরং ভবিষ্যতে তাকে 'মৌলভী' বলে ডাকা হবে। এবার শেখ সাহেবের সাহস হারালে চলবে না। এই পুস্তিকা খুবই ছোট। বলতে গেলে কিছুই নয়। দিনে যদি একটি অধ্যয়ণ লেখেন তাহলে চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই এ কাজ সমাপ্ত করতে পারবেন। তাঁর নিজের কোন যোগ্যতা না থাকলে সেই এক-দেড়শ' মৌলভীর সাহায্য নিতে পারেন, যারা যাচাই-বাছাই না করেই মুসলমানদের কাফের ও চিরজাহান্নামী আখ্যায়িত করেছে এবং ঔন্দ্রত্যসহ নিজেদেরকে

* টাকা: শেখ সাহেবের তাঁর পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যায় অঙ্গীকার করেছেন যে, যদি তাঁর বঙ্গ-বাঙ্কবরা এখনও তাঁকে সাহায্য না করেন তাহলে তিনি এই চাকুরী থেকে ইতফা দিবেন।

‘মৌলভী’ হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। তারা প্রত্যেকে যদি একটি করে অধ্যায় লিখে দেয়, তাহলে শেখ সাহেব এই পুস্তিকার জবাবে দেড়শ অধ্যায়ের পুস্তক প্রকাশ করতে পারেন। এসব সত্ত্বেও শেখ সাহেব এরূপ না করলে ভবিষ্যতে ‘মৌলভী’ হবার দাবী করা তার পক্ষে চরম নির্লজ্জের কাজ হবে। বরং ভবিষ্যতে মিথ্যা বলা আর মিথ্যা বলানো থেকে বিরত থাকা তার উচিত হবে। সেক্ষেত্রে পিতৃপুরুষসুত্রে প্রাণ ‘শেখ’ নামটিই আপনার জন্য যথেষ্ট। অথবা ‘মুনশী’ উপাধিই যথোপযুক্ত হবে। অবশ্য আপনি মুনশী নামেরও যোগ্য কিনা সেটিও পরীক্ষা সাপেক্ষ বিষয়। ‘মুনশী’র জন্য ফারসী কাব্যে বিশেষ দক্ষতা থাকা আবশ্যিক। কিন্তু আমার জানা মতে এখন পর্যন্ত আপনার কোন ফারসী কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। যদিও ‘মুনশী’ হবার কোনো যোগ্যতা আপনার মাঝে পাওয়া, যায় না তথাপি যদি কিছুই ছাড় দেই এবং চোখ বন্ধ করে আপনাকে ‘মুনশী’ বলে মেনেও নেই এবং আপনাকে ‘মুনশী’ বলে ধরেও নেই তাতেও কিছুই যায় আসে না। কারণ, মুনশীগিরির সাথে আমাদের ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমরা কোনভাবেই এরূপ নির্বোধদের ‘মৌলভী’ উপাধি দিতে পারি না, যাদেরকে পাঁচ হাজার রূপী পর্যন্ত পুরুষার দেয়ার কথা বললেও তাদের মৃত আজ্ঞায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন শক্তি সঞ্চারিত হয় না! সহস্র অভিসম্পাতের ভয়-ভীতি দেখানো সত্ত্বেও কোন আজ্ঞাভিমান পরিলক্ষিত না হয় এবং গোটা বিশ্বকে সাহায্যকারী নিযুক্ত করার অনুমতি দেয়ার পরে ভুলেও ইতিবাচক সাড়া দেয় না! এমন লোকদেরকে ‘মৌলভী’ উপাধি দেয়া হলে মুসলমানদেরকে কাফের বানানো ছাড়া তাদের আর কি যোগ্যতা সাব্যস্ত হয়? আর কোন যোগ্যতাই নেই। এরা কয়েকটি হাদিস পড়েই ‘শায়খুল কুল’ নাম ধারণ করে। আমরা এযুগের মানুষ ও এদের ছাড়ানো নেরাজ্য থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি। আর অজ্ঞদের অজ্ঞতা থেকেও আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি।

এটিও জানা বিষয়, প্রত্যেক শালীন বিজ্ঞবাদীও এক পর্যায়ে গিয়ে নিজ শক্তিতা থেকে বিরত হয় এবং ভিত্তিহীন মিথ্যা বলতে তারও বাঁধে। কিন্তু পরিতাপ! শেখ সাহেবের মাঝে এই মানবীয় লজ্জা-বোধটিও কার্যকর নয়। ক্ষতি করার যত পছ্টা তার মাথায় এসেছে তা সবই তিনি ব্যবহার করেছেন। ক্ষতিসাধনের কোন সুযোগ হাতছাড়া করেন নি। প্রথমত লোকদেরকে এই বলে উন্নেজিত করেছেন, এ ব্যক্তি কাফের ও দাজ্জাল। তার সাথে মেলামেশা করা থেকে বিরত থাকো। তাকে যত পারো কষ্ট দাও। সব ধরনের অত্যাচার-নির্যাতন কর। এসবই পুণ্যের কাজ। এ চক্রান্তে যখন ব্যর্থ হলেন তখন ইংরেজ সরকারকে উন্নেজিত করার লক্ষ্যে অস্তুত ধরনের মিথ্যার বেসাতি করেছেন তিনি এবং কত যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন! কিন্তু এ সরকার দূরদর্শী এবং মানুষ চেনে। এরা শিখদের মত নয় যে কারো শক্ত এবং স্বার্থাঙ্ক ব্যক্তির মুখের কথা শুনেই উন্নেজিত হয়ে যাবে। বরং খোদা-পদ্মত বুদ্ধিমত্তার আলোকে এরা কাজ করে। সুতরাং বিচক্ষণ সরকার এ ব্যক্তির লেখার প্রতি কোন দৃষ্টিই দেয় নি। আর কেনই বা দৃষ্টি দেবে? তারা জানে, এক স্বার্থাঙ্ক শক্ত প্রবৃত্তির তাড়নায় অহেতুক মিথ্যা ছিদ্রাষ্টেষণ করছে। এ অধমের

পরিবার যে সরকারের শুভাকাঙ্ক্ষী তা সরকারের নিশ্চিতভাবে জানা ছিল। সরকার একথাও খুব ভালভাবে অবহিত ছিল, এ অধম বিগত চৌদ্দ বছর যাবৎ এসব মৌলভীদের রায়ের বিরুদ্ধে বার বার এ বিষয়ে লেখা প্রকাশ করে চলেছে, আমরা যারা ব্রিটিশ সরকারের প্রজা, আমাদের জন্য আল্লাহু এবং রসূলুল্লাহ (সা:) -এর আদেশানুযায়ী এ সরকারের আনুগত্য করা আবশ্যিক এবং বিদ্রোহ করা অন্যায়। যে ব্যক্তি বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করে বা এ লক্ষ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত করে অথবা এ ধরনের সভায় যোগদান করে বা গুণ্ঠরবৃত্তি করে সে আল্লাহু এবং রসূলের অবাধ্যতা করছে। ইংরেজ সরকারের সত্ত্বিকার শুভাকাঙ্ক্ষীস্বরূপ এ অধম নিজ পুষ্টকাদিতে যা-ই বর্ণনা করেছে তা সর্বৈব সত্য। জেহাদ যে শর্তসাপেক্ষ বিষয় নির্বোধ মৌলভী তা জানে না। শিখ রাজাদের লুটতরাজ ও মারামারির নাম জেহাদ নয়। সুরক্ষাকারী সরকারের বিরুদ্ধে কোনভাবেই প্রজাদের জেহাদ করা বৈধ নয়। যে সরকার নিজ প্রজাদের প্রাণ, ধন-সম্পদ আর সম্মান রক্ষা করে এবং তাদের ধর্ম-কর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে, ইবাদত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনরূপ বাঁধা প্রদান করে না, সেখানে প্রজারা সুযোগ পেয়ে যদি সরকারকে হত্যা করতে উদ্যত হয় তাহলে এটি ধর্ম নয় বরং অধর্ম, পুণ্য নয় বরং ঘৃণ্য অপকর্ম। আল্লাহুত্তাল্লা এসব মুসলমানের প্রতি করণা করুন যারা এ বিষয়টি না বুঝে এ সরকারের অধীনে এমন কপটাপূর্ণ জীবন যাপন করছে যার সাথে বিশ্বস্তাতর দূরতম সম্পর্ক নেই। আমরা পুরো কুরআন শরীফে অত্যন্ত গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছি, কিন্তু পুণ্যের বিনিময়ে কোথাও পাপের শিক্ষা দেখতে পাই নি। অবশ্য এ সরকারের নিজ জাতি যে ধর্ম বিষয়ে চরম অন্তিমে নিপত্তিত একথা সঠিক। আলোকিত এ যুগে তারা একজন মানুষকে খোদা বানাচ্ছে এবং এক নিঃস্ব-দুর্বল মানুষকে বিশ্ব-প্রতিপালক উপাধি প্রদান করছে! -এমতাবস্থায় এরা আরো বেশি করুণার পাত্র আর সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শিত হবার অধিক মুখাপেক্ষী। কেননা তারা সঠিক-সরল পথ সম্পূর্ণরূপে ভুলেই গেছে এবং দূরে সরে গেছে। আমাদের উচিত তাদের অনুঘতকে স্মরণ করে, তাদের জন্য খোদার সমীপে এই বলে দোয়া করা, “হে সর্বশক্তিমান মহাপরাক্রমশালী খোদা! তাদেরকে হেদায়াত দাও এবং পবিত্র তৌহীদের জন্য তাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত কর। সত্যের প্রতি তাদের আকৃষ্ট কর যেন তারা তোমার সত্য ও পরিপূর্ণ নবী (সা:) ও তোমার কেতাব (কুরআনকে) শনাক্ত করতে পারে এবং ইসলাম যেন তাদের ধর্ম হয়ে যায়”। অবশ্য পাদ্রীদের ছড়ানো নেরাজ্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং তাদের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ অনেক হঠগোল করছে। কিন্তু তাদের নেরাজ্য তরবারিস্ট নয় বরং কলমস্ট। সুতরাং হে মুসলমানগণ! তোমরাও কলমের মাধ্যমেই তাদের প্রতিহত কর। সীমাত্তিক্রম করো না। কুরআন শরীফে খোদার ইচ্ছা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। তা হলো কলমের বিরুদ্ধে কলম আর তরবারির মোকাবেলায় তরবারি। কিন্তু কোথাও কোন খ্রীস্টান পাদ্রী ধর্মের জন্য তরবারি হাতে নিয়েছে একথা শোনা যায় না। অতএব

তরবারি ধারণের প্রয়াস কুরআন পরিত্যাগের নামান্তর বরং স্পষ্ট ভষ্টতা আর ঐশী শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। যাদের মাঝে আধ্যাত্মিকতা নেই তারাই একুপ কুটিলতার আশ্রয় নেয় এবং ইসলামের নামে নিজেদের কুপ্রবৃত্তির বাসনা চরিতার্থ করতে চায়। খোদা তালা তাদের সুমতি দিন। আফগান স্বভাবের মানুষ যদিও এ শিক্ষাকে অপছন্দ করবে। কিন্তু সত্য প্রকাশ করা আমাদের লক্ষ্য, তাদেরকে খুশি করা নয়। অতীব হানিকর বিশ্বাস যার ফলে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে তা হলো, এসব মৌলিক এমন এক মাহদীর জন্য অপেক্ষমান যে এসে গোটা বিশ্বকে রক্তে রঞ্জিত করবে এবং আবির্ভূত হয়েই হত্যাযজ্ঞ আরম্ভ করবে। একই ধরনের লক্ষণাবলী এরা নিজেদের কল্পিত মসীহুর জন্যও নির্ধারণ করে রেখেছে। অর্থাৎ সে-ও আকাশ থেকে অবর্তীণ হওয়া মাত্রই সব কাফেরকে হত্যা করবে। যে মুসলমান হবে কেবল সে-ই রক্ষা পাবে। একুপ ধ্যান-ধারণা সম্বলিত মানুষ কোন জাতিরই সত্যিকার শুভাকাঙ্গজী হতে পারে না। বরং একা তাদের সাথে কারও সফর করাও ভয়ের কারণ, তারা কাফের মনে করে আবার হত্যা করে না বসে। অথচ নিজেদের অভ্যন্তরীণ কুফরী সম্পর্কে এরা উদাসীন। স্মরণ রাখা উচিত, একুপ বাজে ধারণাকে ইসলামের অংশ আখ্যা দেয়া, নাউয়ুবিল্লাহ্ একে কুরআনের শিক্ষা বলে গণ্য করা, ইসলামের সাথে পরিহাস করা এমন কি বিরুদ্ধবাদীদেরকে উপহাসের সুযোগ করে দেয়ার নামান্তর। সামগ্রিকভাবে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন না করেই আবির্ভূত হবার সাথে সাথে এক ব্যক্তি লোকদেরকে হত্যা করা আরম্ভ করবে বা যে সরকারের ছায়ায় জীবন-যাগন করবে তাকে ধ্বংস করার জন্য ওঁত পেতে থাকবে -কোন বিবেকই এটিকে গ্রহণ করবে না। মনে হচ্ছে, একুপ লোকদের স্বভাব-প্রকৃতি একেবারেই বিকৃত হয়ে গেছে এবং মানবিক সহানুভূতির বৈশিষ্ট্য তাদের মাঝ থেকে একবারেই উঠে গেছে অথবা তাদের মাঝে স্রষ্টা এসব গুন সৃষ্টিই করেন নি। খোদা তালা এসব বিপদ থেকে রক্ষা করুন! জানি না, আমাদের এ কথা শুনে তারা কিভাবে জুলবে এবং কতভাবে মুখ ভেঙ্গিয়ে কাফের বলবে। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে কাফের আধ্যাদানের প্রতি আমরা মোটেও ঝঁকেপ করি না। প্রত্যেক ব্যক্তির হিসাব-নিকাশ খোদা তালার সাথে। পূর্ণসীন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন না করেই বিরুদ্ধবাদীদের হত্যা করা আরম্ভ করা যেতে পারে -আমরা কুরআন শরীফের কোন আয়াতেই এমন শিক্ষা দেখি না। আমাদের সম্মানিত নেতা ও অভিভাবক নবী (সা:) তের বছর পর্যন্ত কাফেরদের অত্যাচার-অনাচার সহ্য করেছেন। অনেক দুঃখ-যাতনা দেয়া হয়েছে কিন্তু তিনি ধৈর্য হারান নি। অনেক সাহাবী এবং প্রিয়জনদের হত্যা করা হয়েছে তবুও কোন পাল্টা-ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। দুঃখ-যাতনায় পিষে ফেলা হয়েছে কিন্তু ধৈর্য ধারণ বৈ কিছুই করেন নি। পরিশেষে কাফেরদের অত্যাচার যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল এবং তারা সবাইকে হত্যা করে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার বড়যত্ন করলো তখন খোদা তাঁর প্রিয় নবীকে সেই হিংস্র পশুদের হাত থেকে উদ্ধার করে নিরাপদে মদীনায় নিয়ে

পৌঁছালেন। প্রকৃতপক্ষে সেদিনই উর্দ্ধোলোকে অত্যাচারীদের শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

تادلِ مُردد انعام بدر و جیچ قومے را خُدا رسوائی کرو

যতক্ষণ খোদাপ্রেমিকের হৃদয় বেদনায় ভরে না যায় ততক্ষণ খোদা কোন জাতিকে লাঞ্ছিত করেন না।

কিন্তু পরিতাপ! কাফেররা এখানেই ক্ষান্ত হয় নি বরং প্রাণ নাশের জন্য পশ্চাদ্বাবন করেছে। বেশ কয়েকবার আগ্রাসী আক্রমণ চালিয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দিয়েছে। পরিশেষে তারা খোদা তাঁলার দৃষ্টিতে তাদের সীমাহীন পাপের কারণে শাস্তিযোগ্য বলে চিহ্নিত হয়। তাদের দুশ্কৃতি যদি এ পর্যায়ে না পৌঁছাতো তাহলে মহানবী (সাঃ) কখনই তরবারি হাতে নিতেন না। কিন্তু যারা তরবারি হাতে নিয়েছে আর খোদার দৃষ্টিতে ধৃষ্ট ও অত্যাচারী সাব্যস্ত হয়েছে তারা তরবারির আঘাতেই নিহত হয়েছে। মোটকথা নবী (সাঃ)-এর জেহাদের এটিই প্রকৃত স্বরূপ। জ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে অনবিহিত নন। এছাড়া কুরআনের নির্দেশ হলো, যারা তোমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে তোমরাও তাদের সাথে সম্বৃদ্ধ কর। যারা তোমাদেরকে আশ্রয় দেয় তাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবক্ষ রেখো। যারা তোমাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দেয় না তোমরাও তাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দিও না। কিন্তু অধুনা যুগের মৌলভীদের জন্য পরিতাপ! এরা পুণ্যের স্থলে পাপ করতে উদ্যত আর আধ্যাত্মিকতাহীন ও মানবীয় দয়ামায়াশূন্য। ‘আল্লাহমা আসলেহ উম্মাতা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আল্লায়ে ওয়া সাল্লাম, (হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতকে শুধুর দাও) আমীন।

“আমাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করার লক্ষ্যে শেখ মোহাম্মদ হুসেইন বাটালভীর হটকারিতা আর আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসের প্রমাণ। এছাড়া জনাব শেখ সাহেব সিররুল্ল খিলাফাহ পুস্তিকার প্রতিষ্ঠিতায় পুস্তিকা প্রকাশ করতে পারলে তার জন্য ২৭ রূপী পুরস্কার-এর ঘোষণা ॥”

খোদা তাঁলা অবহিত আছেন, আমরা তিল পরিমাণও ইসলাম থেকে বিচুত হই নি। বরং আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসের বিষয়টি হচ্ছে, আমরা সেসব কথার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত যা কুরআন ও হাদীসের সুনির্দিষ্ট বাণী দ্বারা প্রমাণিত। বড়ই পরিতাপের বিষয়, শেখ মোহাম্মদ হুসেইন সাহেব এবং অন্যান্য বিরক্তবাদীরা আমাদেরকে কাফের এবং দাজ্জাল আখ্যায়িত করে এবং আমাদের জন্য চির-জাহানামের শাস্তি নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হয় নি বরং কুরআন এবং হাদীসকেও পরিত্যাগ করেছেন। আমরা বার বার

বলেছি, আমরা তাদের কামনা-বাসনা, ভুল-ভাস্তি ও অন্যায়কে কোনভাবেই প্রশংস্য দিতে পারি না। তাদের কাছে কোন সত্য কথা এবং আল্লাহর কিতাব ও হাদীসসম্মত কোন বিশ্বাস যদি থেকে থাকে আর আমরা তার বিরোধিতা করছি বলে ধরেও নিই, সেক্ষেত্রে আমরা তা মানার জন্য সদা প্রস্তুত। আমরা তাদেরকে দেখিয়েছি এবং প্রমাণ করেছি, ঐশ্বী গ্রহের সর্বজনবিদিত বাগধারা, রসূলুল্লাহ (সা:) এর দৈনন্দিন কথা-বার্তা, সাহাবিদের প্রাত্যহিক আল্লাপচারিতা এবং তখন থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি আরবের সব জাতির সাধারণ বাগধারায় ‘তাওয়াফ্ফী’ শব্দ মৃত্যু দেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়, অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হয় না। আমরা আরও সাব্যস্ত করেছি, রসূলুল্লাহ (সা:) কর্তৃক ‘তাওয়াফ্ফী’ শব্দের যে অর্থ প্রমাণিত তা-ও হ্যরত ঈসা (আ:) মৃত্যুবরণ করেছেন বলে ইঙ্গিত করে। বুখারী শরীফ খুলে দেখ! আর পবিত্র হৃদয় নিয়ে এ আয়াত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ, অর্থাৎ “আমি কিয়ামত দিবসে সেভাবেই ‘ফালাম্মা তাওয়াফ্ফাইতানী’ বলবো যেভাবে আল্লাহর এক পুন্যবান বান্দা হ্যরত ঈসা (আ:) বলেছিলেন” এবং চিন্তা কর, মহানবী (সা:) এর উক্তি ‘তাওয়াফ্ফী’ শব্দের কত সূক্ষ্ম একটি তফসীর। মহানবী (সা:) কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই আলোচ্য শব্দটিকে ঠিক সেভাবেই নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন যেভাবে আলোচ্য আয়াতে শব্দটি ঈসা (আ:) এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। ‘ফালাম্মা তাওয়াফ্ফাইতানী’* শব্দটি মহানবী (সা:) এর ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে কার্যকর হয় নি -একথা কি এখন আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব? আমরা কি একথা বলতে পারবো, এই শব্দের প্রকৃত অর্থ কেবল ঈসা (আ:) এর ক্ষেত্রেই বর্তিয়েছে। এই আয়াতে অসন্িহিত মূল ঐশ্বী উদ্দেশ্য আর ‘তাওয়াফ্ফী’ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা’লা যা প্রকৃতপক্ষে বুঝাতে চেয়েছেন আর আদি থেকে এই শব্দটির যে অর্থ আল্লাহর জ্ঞানে স্বীকৃত অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় আকাশে উত্তোলন করা (নাউয়ুবিল্লাহ)

* চীকা: কেন কেন অজ্ঞ ব্যক্তির বক্তব্য হলো, মহানবী (সা:) এর কথায় ‘কামা’ শব্দ রয়েছে যা কিছুটা পার্থক্যের বা ভিন্নতার অর্থ বহন করে। এ জন্যই মহানবী (সা:) এর ‘তাওয়াফ্ফী’ এবং হ্যরত ঈসার ‘তাওয়াফ্ফী’-র মাঝে কিছু পার্থক্য থাকা বাস্তবীয়। কিন্তু নির্বোধরা ভেবে দেখে না, সদ্শ এবং যার সাথে সামৃদ্ধ্য করা হচ্ছে তাদের মধ্যকার ঘটনার ধরন যেমনই হোক না কেন, শব্দের অর্থগত দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মাঝে কোন বৈসাদৃশ্য থাকতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি বলে যায়ে যেভাবে রুটি খেয়েছে আমিও সেভাবে রুটি খেয়েছি। সুতরাং রুটি খাবার পদ্ধতি ভালো বা মন্দ হবার দিক থেকে পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু ‘রুটি’ শব্দটি যা একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এতে কেন তারতম্য সৃষ্টি হবে না। একস্থানে রুটির অর্থ রুটি আর অন্যস্থানে রুটির অর্থ পাথর, এটি হতেই পারে না। অভিধানে কোনক্রমেই অন্যায় হস্তক্ষেপ যুক্তিযুক্ত নয়। মহানবী (সা:) এর এ ধরনেরই আরেকটি উক্তি আছে যা ইবনে তাহিমাহ ‘যাদুল মাইআদে’ উক্ত করেছেন। আর সে বাক্যটি এরপ,

يَا مِعْشَرَ قُرِيشٍ مَا تَرُونَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ قَالُوا خَيْرًا لَخَ كَرِيمٌ وَابْنُ اَخٍ كَرِيمٌ قَالَ
فَلَئِنِ اقْوَلُ لَكُمْ كَمَا قَاتَلَ يُوسُفَ لَا خُوْتَهُ لَا تُثْرِيبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اذْهِبُوا فَلَنْتَمْ

الطلاء

‘কুলা ইয়া মাশারা কুরাইশ মা তারাউনা ইনি ফায়েলুম বিকুম কালু খাইরান, আখুন করীমুন ইবনু আখিন কারিমিন কুলা ফাইলি আরুলু মাকুম কামা কুলা ইউসুফু লি ইখওয়াতিহি লা তাসরিবা আল্লাইবুল ইয়াওমা ইয়হাবু ফাআনতুম্ভতুলোকা’ (প্রাণক, পৃষ্ঠা ৪১৫)। এখন দেখ! ‘তাসরীব’ শব্দ যে অর্থে হ্যরত ইউসুফের উক্তিতে ব্যবহৃত হয়েছে সে অর্থেই মহানবী (সা:) এর উক্তিতে ব্যবহৃত হয়েছে।

-এই অর্থটি মহানবী (সা:)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বরং আলোচ্য আয়াতটিকে নিজের প্রতি আরোপ করে মহানবী (সা:)-এর প্রতি আয়াতের অর্থে বিকৃতি ঘটিয়েছেন, প্রকৃত পক্ষে, আলোচ্য শব্দটিকে মহানবী (সা:)-এর প্রতি আরোপ করলে এর ভিন্ন অর্থ হয় আর হ্যরত ঈসা (আ:)-এর প্রতি আরোপ করলে এর সেই প্রকৃত অর্থটিই প্রযোজ্য হয় যা আদিকাল থেকে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে ধার্যকৃত -এসব কথা কি আমাদের পক্ষে বলা সাজে? একথাই যদি সত্য হয় তাহলে এটি একটি প্রকাশ্য বিপন্নি যা একজন নবীর মর্যাদা-পরিপন্থী, অর্থাৎ তিনি একটি স্বীকৃত অর্থকে অগ্রহ্য করে এর মাঝে এরূপ অন্যায় হস্তক্ষেপ করছেন। সেক্ষেত্রে একে 'অর্থ বিকৃতি' ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না! দ্বিতীয় যে বিপন্নিটি দেখা দেবে তা হলো, মহানবী (সা:) বিষয়ের যে সামঞ্জস্য দেখাতে চেয়েছেন অর্থাৎ, 'ফালাম্মা তাওয়াফ্ফাইতানী'-র যে সামঞ্জস্য দেখাতে চেয়েছিলেন তা-ও আর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। কেননা 'তাওয়াফ্ফী'-র অর্থে মহানবী (সা:) এবং ঈসা (আ:)- উভয়ই যদি অন্তর্ভুক্ত থাকেন কেবল তখনই সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু সেই অংশীদারিত্বের সুযোগ ঘটেছে না। তাহলে সামঞ্জস্য কিভাবে সাব্যস্ত হলো? মহানবী (সা:) কি আর কোন শব্দ পান নি, যে কারণে তাঁকে এমন অসম অংশীদারিত্বের আশ্রয় নিতে হলো যা করার কোনক্ষেত্রেই তাঁর অধিকার ছিল না? মাটিতে কবরস্থ ব্যক্তি আর আকাশে জীবন্ত উপরিত ব্যক্তির জন্য এরূপ একটি শব্দ ব্যবহার হচ্ছে যা হয় মৃত্যুর না হয় জীবনের অর্থ প্রকাশ করবে? কিন্তু শব্দটি একই সাথে এই উভয় অর্থ কিভাবে ধারণ করতে পারে? বিপরীতমুখী বিষয়াদি একস্থানে সমবেত হতে পারে কি? যদি 'ফালাম্মা তাওয়াফ্ফাইতানী' আয়াতে তাওয়াফ্ফীর অর্থ মৃত্যু দেয়া না হতো তাহলে ইমাম বুখারীর কান্ডজ্ঞান কি লোপ পেয়েছিল যে তিনি তাঁর সহীহ বুখারীতে এই অর্থেরই সমর্থনে আরেকটি আয়াত অর্থাৎ, 'ইন্নি মুতাওয়াফ্ফীকা' অন্য স্থান থেকে তুলে এনে এখানে বসিয়েছেন? তিনি এখানেই ক্ষান্ত হন নি বরং ইবনে আববাস (রা:)-এর মুখ নিঃস্ত একটি উকি 'মুতাওয়াফ্ফীকা-মুমীতুকা'ও এখানে সন্নিবেশিত করেছেন অর্থাৎ 'মুতাওয়াফ্ফীকার অর্থ হচ্ছে, আমি তোমাকে মৃত্যু দানকারী'! ইবনে আববাস (রা:)-এর সুস্পষ্ট উকি উল্লেখ করতঃ মহানবী (সা:)-এর রূপক কথাকে বেশি স্পষ্ট করা যদি বুখারীর উদ্দেশ্য না হতো তাহলে এ দুটি আয়াতকে এখানে একত্রিত করা এবং ইবনে আববাস (রা:)-কৃত অর্থ উল্লেখের উদ্দেশ্য কী ছিল? আর 'তাওয়াফ্ফীর অর্থ নিয়ে বিতর্কের অবতারণা করারইবা অবকাশ কোথায়?' প্রকৃতপক্ষে ইমাম বুখারী উপরোক্ত প্রমাণাদির মাধ্যমে 'তাওয়াফ্ফী' শব্দ সমন্বে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাস তুলে ধরেছেন। সুতরাং এখানে আমাদের দাবীর সমর্থনে তিনটি বিষয় পাওয়া গেল: প্রথমত, মহানবী (সা:)-এর পবিত্র বাণী অর্থাৎ যেভাবে পুণ্যবান বান্দা ঈসা 'ফালাম্মা তাওয়াফ্ফাইতানী' বলেছেন সেভাবে আমিও 'ফালাম্মা তাওয়াফ্ফাইতানী' বলবো। দ্বিতীয়ত, ইবনে আববাস (রা:)-কর্তৃক 'তাওয়াফ্ফী' শব্দের অর্থ 'মৃত্যু দেয়া' করা হয়েছে। তৃতীয়ত, ইমাম বুখারীর সাক্ষ্য যা তাঁর প্রত্যক্ষ কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে।

এখন চিন্তা করে দেখ, আমরা হাদীস এবং কুরআনকে পরিত্যাগ করেছি নাকি আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা? আমাদের মত তারা কি ‘তাওয়াফ্ফী’র অর্থ রস্লুল্লাহ্ (সাঃ) এবং কোন সাহাবীর পক্ষ থেকে প্রমাণ করতে পেরেছে? এসত্ত্বেও আমাদের বিপরীত কোন প্রমাণ উপস্থাপন করেছি, এর বিপরীত কোন প্রমাণ উপস্থাপন করে এবং ‘তাওয়াফ্ফী’র অর্থ সম্বন্ধে মহানবী (সাঃ)-এর অন্য কোন হাদীস আমাদেরকে দেখায় এবং একই সাথে কোন সাহাবীর পক্ষ থেকেও ‘তাওয়াফ্ফী’র সেই অর্থের সমর্থনসূচক অর্থ উপস্থাপন করে, অনুরূপভাবে ‘তাওয়াফ্ফী’র এ অর্থ সম্পর্কে বুখারীর ন্যায় কোন হাদীসের ইমামেরও সাক্ষ্য উপস্থাপন করে তাহলে আমরা তা মেনে নেব। কিন্তু এটি কেমন শর্ততা, স্বয়ং নিজেরা কুরআন ও হাদীসকে পরিত্যাগ করছে আর উল্টো আমাদের ওপর অপবাদ আরোপ করছে, এই ফেরকা কুরআন ও হাদীসের গভিবহির্ভূত। হে বিরুদ্ধবাদী মৌলভীরা! খোদা তোমাদের প্রতি করণা করুন। একটু মনযোগ নিবন্ধ কর যেন তোমরা বুঝতে পারো। এ বিষয়টি সুনিশ্চিত অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) এবং সাহাবিদের পক্ষ থেকে আলোচ্য শব্দ ‘তাওয়াফ্ফী’র অর্থ মৃত্যু দেয়া ছাড়া আর কিছুই প্রমাণিত হয় নি। আর যে-ব্যক্তি এ প্রমাণিত অর্থকে পরিত্যাগ করে সে পবিত্র কুরআনের মনগড়া তফসীর করে। কেননা হাদীসের আলোকে বিতর্কিত আয়াতে ‘তাওয়াফ্ফী’র অর্থ কেবল মৃত্যু দেয়া ছাড়া আর কিছুই উল্লেখ করা হয় নি। এ কারণেই শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (মুহাদ্দেস দেহলভী) সাহেব তাঁর তফসীর ‘ফওয়ুল কবীরে’ যা কেবল নবী (সাঃ)-এর উক্তি এবং সাহাবিদের কথার ভিত্তিতে তিনি রচনা করেছেন, মুতাওয়াফ্ফীকার অর্থ কেবল ‘মুমাতুক’ লিখেছেন। তিনি যদি এর বিপরীত কিছু পেতেন তাহলে অবশ্যই ‘অথবা’ শব্দ ব্যবহার করে সে অর্থও উল্লেখ করতেন। এখন আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের লজ্জিত হওয়া উচিত, কেন তারা সুস্পষ্ট আয়াতকে একেবারেই পরিত্যাগ করে বসে আছে। সুতরাং হে ধৃষ্টরা! খোদাকে ভয় কর। একদিন কি মরন হবে না? নুয়ুল (অবতরণ) শব্দ নিয়ে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। মহানবী (সাঃ) এ শব্দ কোন অর্থে ব্যবহার হয় এর কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন নি, কেননা নুয়ুল বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। ভূমগকারী যখন এক দেশ থেকে অন্য দেশে যায় তাকেও ‘নয়ীলই’ বলা হয়ে থাকে। কুরআন করীমে এরূপ নুয়ুলেরও বিবরণ রয়েছে। এটা রূপক। যেভাবে আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন, আমরা লোহা নায়িল করেছি। আমরা চতুর্পদ প্রাণী নায়িল করেছি। এলিয়া অর্থাৎ ইয়াহিয়ার উপাখ্যান যে সম্পর্কে ইহুদী এবং খ্রীস্টানদের ঐকমত্য রয়েছে এবং বাইবেলে যা সংরক্ষিত আছে তা থেকে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, মৃত নবীদের এ পৃথিবীতে নুয়ুল বা অবতরণ আধ্যাত্মিকভাবে হয়ে থাকে, দৈহিক অর্থে নয়। তাঁরা কখনোই আকাশ থেকে অবতরণ করেন না। কিন্তু তাদের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যবলী আল্লাহ্ ইচ্ছায় কোন মসীলের (বা সদৃশ ব্যক্তি) মাঝে প্রতিফলিত হয়ে রূপক অর্থে অবতরণ করে। মসীলের ওপর তাঁর ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের প্রতিফলন ঘটে থাকে। এজন্য এই মসীল (সদৃশ ব্যক্তি)-এর আবির্ভাবকে, যার সাথে গুণাবলীর সামঞ্জস্য থাকে, তার নুয়ুল মনে করা

হয়। কোন কোন আউলিয়ায়ে কেরামও এরূপ নৃযুলের (অবতরণ) উল্লেখ সুফী-মতবাদের পুষ্টকাদিতে করেছেন। বস্তুত এটিও আল্লাহর দৃষ্টিতে এক প্রকারের নৃযুল। এটি যদি নৃযুল না হয় তাহলে খোদা তাঁলার কিতাব ভাস্ত সাব্যস্ত হয়। এলিয়ার ঘটনা যা বাইবেলে সংরক্ষিত আছে তা এমনই একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা যা ইহুদী এবং গ্রীস্টান উভয় ফেরকার কাছেই গ্রহণীয়। আমরা যদি বলি, এ দুটি ফেরকা যোগসাজস করে এই স্থানের আয়াতকে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে, তাহলে এটি হবে চরম বোকামী। কেননা গ্রীস্টানদের জন্য এই কাহিনী একান্তই ক্ষতিকর। আর এস্থলে যদি এলিয়ার অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টিকে বাহ্যিক অর্থে নেয়া হয় তাহলে ইহুদী সঠিক বলে সাব্যস্ত হয় এবং এটি প্রমাণিত হয় যে, হযরত মসীহ (আঃ) সত্য নবী ছিলেন না। কেননা এখন পর্যন্ত হযরত এলিয়া (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করেন নি। অথচ বাইবেলের আলোকে হযরত মসীহের পূর্বে তাঁর আগমন আবশ্যক ছিল। হযরত মসীহ নিজে এ ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অর্থাৎ ইহুদীরা তাঁর নবুওয়তের বিরুদ্ধে এ আপন্তি উত্থাপন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে এ আপন্তি ছিল পাহাড়সদৃশ। সুতরাং এলিয়ার অবতীর্ণ হবার কাহিনী মানুষের বানানো -এ কথা যদি সঠিক হতো তাহলে হযরত ঈসা (আঃ) ইহুদীদের সামনে এ উত্তর প্রদান করে বলতেন, এলিয়ার পুনরায় পৃথিবীতে আবির্ভূত হবার কথা গোড়াতেই মিথ্যা। অথচ হযরত মসীহের আগমনের পূর্বে তাঁর সশরীরে আকাশ থেকে অবতরণ আবশ্যক! কিন্তু তিনি এ উত্তর প্রদান করেন নি। বরং তিনি আয়াতের সত্যতাকে গ্রহণ করে নৃযুলকে রূপক নৃযুল বলে সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর এরূপ ব্যাখ্যার কারণেই ইহুদীরা তাঁকে বিধর্মী আখ্যা দিয়েছে এবং সর্বসমত্বাবে ফতোয়া দিয়েছে, এ ব্যক্তি বেদীন এবং কাফের। কেননা প্রক্ষেপণের সুস্পষ্ট চিহ্ন ছাড়াই তওরাতের আয়াতের আক্ষরিক অর্থকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করছে। এতে কোন সদেহ নেই, হযরত ঈসা (আঃ) প্রক্ষেপণের অজুহাত দেখিয়ে বলতে পারতেন যে, তোমাদের গ্রন্থী কিতাবসমূহের এসব স্থান বিকৃতির শিকার হয়েছে। যদিও এ উত্তর প্রদান করে তিনি ইহুদীদের মুখ বন্ধ করতে পারতেন না। তথাপি তাঁর অলৌকিক নির্দর্শনাবলী ও মো'জেয়া দেখে অনেকেই বিশ্বাস করতো যে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের এই দাবি হয়ত সঠিক। কেননা এ ব্যক্তি গ্রন্থী সমর্থনপূর্ণ, ইলহামপ্রাপ্ত ও নির্দর্শন প্রদর্শনকারী। কিন্তু কোথায়? হযরত মসীহ তো এরূপ করেন নি। বরং এলিয়ার অবতরণ সম্পর্কিত আয়াত যে সঠিক তিনি এর স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। যে কারণে আজ পর্যন্ত গ্রীস্টানরা সমস্যায় নিমজ্জিত এবং ইহুদীদের সামনে মুখ খুলতে পারে না। ইহুদীরা বিদ্রোহ করে বলে, আমরা যদি খোদা তাঁলার সব কিতাবকে মিথ্যা আখ্যা দেই কেবল তবেই ঈসা নবী হতে পারে। এখন পর্যন্ত গ্রীস্টানরা এস্থলে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের দাবী করে এ সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ পায় নি। কেননা উনিশ শ' বছর পরে এখন এরা কিভাবে সেকথার বিরোধিতা করতে পারে যা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে? এ বিষয়টি আমাদের মুসলমান ভাইদের জন্য গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাদের চিন্তা করা উচিত, যেসব বাহ্যিক অর্থের ওপর তারা জোর দিয়ে থাকে, সে অর্থই যদি সঠিক

হয় তাহলে হ্যরত ঈসা কোন ক্রমেই নবী বলে বিবেচিত হতে পারেন না। বরং তিনি আল্লাহর নবী তখনই সাব্যস্ত হতে পারেন যদি হ্যরত এলিয়া নবীর আগমনকে একটি আধ্যাত্মিক নুয়ুল বা অবতরণ বলে মনে নেয়া হয়।

পরিতাপ! ‘আঠারশ’ নববই (১৮৯০) বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও মৌলভী ও ফকীহরা (ধর্মীয় পদ্ধতি) ইহুদীদের সেই আপত্তিই এ অধমের বিরলক্ষে উত্থাপন করেছে। একটি শিশুও বুঝতে পারবে, এ অধম যে রীতি অবলম্বন করেছে সেটি হ্যরত ঈসার পষ্টা। আর বিরুদ্ধবাদী মৌলভীরা যে অবস্থানে অনড় সেটি ইহুদীদের পষ্টা। মৌলভীদের অনুসৃত রীতিনীতির অঙ্গত পরিণিত লক্ষ্য করুন। এটা অবলম্বন করা মাত্রই তারা ইহুদীসদৃশ হয়ে গেল। বুঝার ইচ্ছা থাকলে এখনও বড় ধরণের কোন ক্ষতি হয় নি। এ গবেষণার ফলে বুঝা গেল, সশরীরে অবতরণের ধারণার কোন ভিত্তি নেই। পূর্ববর্তী গ্রন্থাদিতেও এর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। যা পাওয়া গেছে তা হলো, এলিয় নবীর পুনরায় পৃথিবীতে আগমনের যে প্রতিশ্রূতি রয়েছে তা রূপকভাবে পূর্ণ হবে, বাহ্যিকভাবে নয়। সুতরাং এ গবেষণার ফলে প্রমাণিত হলো, যখন থেকে এ পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ হ্যরত আদম থেকে আরম্ভ করে এখন পর্যন্ত যখনই কোন মানুষের জন্য ‘নুয়ুল’ শব্দের আকাশের সাথে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে সেখানে তা সশরীরে নুয়ুলের অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। আর ব্যবহার হয়েছে বলে যে দাবী করে, সে এর প্রমাণ উপস্থাপন করুক। যেখানে আজ পর্যন্ত ‘নুয়ুল’ দৈহিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, সেখানে আল্লাহর সুন্নত ও তাঁর কিভাবে ব্যবহৃত আদি বাগধারার পরিপন্থী অর্থে এখন তা কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে? ওয়া লান তাজিদা লিসন্নাতিল্লাহে তাবদিলা” (অর্থঃ তোমরা আল্লাহর সুন্নতে কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না-অনুবাদক)।

পুনরায় আমরা পরবর্তী আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বলতে চাই, এখনও যদি কোন স্থুলবুদ্ধির মানুষ এরূপ সুস্পষ্ট ও সুবিদিত বর্ণনাকে না বুঝতে পারে তাহলে কমপক্ষে এতক্ষণে সে অবশ্যই বুঝবে, আলোচ্য বিষয়ে ‘তাওয়াফুফী’ হচ্ছে সেই দ্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট শব্দ যার অর্থের মীমাংসা হয়ে গেছে এবং নিশ্চিতভাবে একথা প্রমাণ হয়ে গেছে, মহানবী (সা:) এর অর্থ ‘মৃত্যু দেয়া’-ই করেছেন। হ্যরত ইবনে আববাস (রাঃ)-ও এর অর্থ ‘মৃত্যু দেয়া’-ই লিখেছেন। ইমাম বুখারী (রাঃ)-ও কার্যত মৃত্যু দেয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ‘নুয়ুল’ শব্দ সম্পর্কে বড় ধরণের কোন গোঁড়া মানুষ যদি অন্য কোন ব্যাখ্যাও করে তাহলে ‘এটি দ্যর্থবোধক একটি শব্দ’-এর চেয়ে বেশি কিছুই বলতে পারবে না। কিন্তু মীমাংসিত একটি শব্দ এবং এর সুস্পষ্ট ও দ্যর্থহীন অর্থকে পরিত্যাগ করে দ্যর্থবোধক শব্দের প্রতি ধাবিত হওয়া সেসব লোকের কাজ যাদের হাদয়ে ব্যাধি আছে। দৈমান যদি থাকে তাহলে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ শব্দকে বাদ দিয়ে যে শব্দ সুস্পষ্ট ও দ্যর্থহীন অর্থবোধক তা অবলম্বন কর। আর দ্যর্থবোধক শব্দের ব্যাখ্যার বিষয়টি খোদার কাছে সমর্পন কর যেন মুক্তি পেতে পারো।

আমাদের এবং বিরচন্দবাদীদের মাঝে বড় বিতর্ক এটিই যা আমি বর্ণনা করেছি। সারকথা এটিই সাব্যস্ত হলো, আমরা সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন বিষয়কে ধারণ করেছি, যা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত, হাদীসের আলোকে প্রমাণিত, সাহাবীদের বর্ণনা থেকে সত্যায়িত, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের দ্রষ্টান্তে প্রতিয়মান, আল্লাহর সুন্নত দ্বারা সাব্যস্ত, ইমাম বুখারীর কথা থেকে প্রমাণিত, ইমাম মালেক ও ইবনে কাইয়েম এর কথা থেকে প্রমাণিত, ইবনে তাইমিয়া'র কথা থেকে এবং ইসলামের অন্যান্য ফেরকার বিশ্বাসের আলোকে প্রমাণিত। কিন্তু আমাদের বিরচন্দবাদীরা একধিক অর্থবোধক 'নুয়ুল' শব্দ নিয়েই ব্যস্ত। এটা অভিধান, কুরআন এবং পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থানুসারে বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোথাও এথেকে হ্যরত মসীহ (আঃ)-এর সশরীরে অবতরণ বা এ ধরনের কোন অর্থ করেন নি। কেমনা পূর্ববর্তী একটি উচ্চত নবীদের আধ্যাত্মিক 'নুয়ুল' এর বিষয়ে বিশ্বাসী। ইহুদীরা হ্যরত এলিয়া'র সশরীরে অবতরণের প্রতীক্ষায় ছিল। হ্যরত মসীহের কথার আলোকে তাদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়ে গেল।

কোন যুগে সশরীরে অবতরণের ঘটনা ঘটেছে বলে ঐশী বিধানে কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতএব সুস্পষ্ট অর্থ এটিই সাব্যস্ত হলো, ঈসা (আঃ)-এর নামেল হ্বার অর্থ আধ্যাত্মিকভাবে অবতরণ। নতুবা দৈহিকভাবে অবতরণও যদি আল্লাহর রীতির অন্তর্ভুক্ত হতো তাহলে খোদা তা'লা ইহুদীদেরকে কেন এত বড় পরীক্ষায় ফেললেন? তারা এখন পর্যন্ত এ ধারণায় মঞ্চ, সত্য মসীহ এলিয় নবীর আকাশ থেকে অবতরণের পরই আসবেন। খোদা তা'লা যেখানে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন যে, এলিয় নবী পুনরায় পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন এবং তাঁর পরে মসীহ আসবেন, সেখানে এ প্রতিশ্রূতিকে বাহ্যিকভাবে পূর্ণ করে এলিয় নবীকে সশরীরে আকাশ থেকে পৃথিবীতে তাঁর নামানো উচিত ছিল। এর ফলে দীর্ঘকাল থেকে ইহুদীরা এই ভবিষ্যত্বাণীর যে অর্থ করে আসছিল এবং তাদের ধর্মীয় পভিত, আলেম ও মুহাদেসগণ যে এলিয়'র সশরীরে 'নুয়ুল' এর বিষয়টিকে নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল, তারা এই ভবিষ্যত্বাণীকে নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী পূর্ণ হতে দেখতো। এরপ হলে হ্যরত মসীহের নবুওয়তের বিষয়ে তাদের কোন প্রকার সন্দেহ থাকতো না। কিন্তু এটি একটি অস্তুত সমস্যা, তাদের পুস্তকাদিতে পরিকল্পনা ও সুস্পষ্ট ভাষায় অবহিত করা হয়েছে, এলিয়'ই পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং যিনি এলিয়া'র অবতীর্ণ হ্বার পরে আসবেন তিনিই সত্য মসীহ হবেন কিন্তু এই ভবিষ্যত্বাণী বাহ্যিক অর্থে পূর্ণ হয়নি অথচ হ্যরত মসীহ এসে গেছেন এবং তাঁকে ইহুদীদের পক্ষ থেকে কঠিন সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়েছে। অবশ্যে এমন একটি ব্যাখ্যার উপর জোর দেয়া হয়েছে যার সাথে সত্যের দূরতম সম্পর্কও নেই। যে কারণে ইহুদীদের বলতে হলো, ঈসা সত্য মসীহ নন বরং এমন একজন প্রতারক ও ধর্মদোষী যে আপন স্বার্থসন্দির জন্য একটি সুস্পষ্ট ভবিষ্যত্বাণীর বাহ্যিকরণকে পরিবর্তন করে আধ্যাত্মিক অবতরণে বিশ্বাস রাখে। অতএব এ কারণেই কোটি কোটি মানুষ কুফরী ও অস্থীকারের পথ অবলম্বন করে জাহানামে

প্রবেশ করেছে। হে মুসলমানগণ! এ ছত্রগুলো একটু মনযোগের সাথে পাঠ কর। তোমাদের কথা ইহুদীদের কথার সাথে এত বেশী সাদৃশ্য রাখে যেন দু'টি কথা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। নিশ্চিতরূপে জেনে রেখো! মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হলো, সে অন্যের ভুল দেখে শিক্ষা প্রহণ করে। 'ফা'তাবের ইয়া উলিল আবসার ওয়াস্ত্রালু আহলায় যিকরে ইন কুনতুম লা তা'লামুন'। (অতএব হে চক্ষুমান মানুষ। তোমরা শিক্ষা প্রহণ কর। আর কোন বিষয়ে জানা না' থাকলে তোমরা আহলে কিতাবের কাছ থেকে জেনে নাও-অনুবাদক।)

যদি বল, আমরা কি করে বিশ্বাস করবো যে, এ ঘটনা সঠিক? তবে এর উত্তর হবে, এ বিষয়টি দু'টি জাতির ঘটনা পরম্পরার সাথে সম্পর্কযুক্ত। কেবল সেসব পুস্তকাদি পরিবর্তন-পরিবর্ধনের শিকার হয়েছে বললেই পরম্পরার গুরুত্বকে দুর্বল করা যায় না। অবশ্য খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে এ কথাকে যদি মিথ্যা আখ্য দিতেন তাহলে সম্ভব ছিল। সুতরাং কুরআন এবং হাদীস থেকে যেহেতু এ বিষয়টি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় না তাই আমরা মৌখিক পরম্পরাকে কোন মূল্যেই রদ করতে পারি না।* অধিকন্তু যদি ধরেও নেয়া হয়, সেসব পুস্তকাদি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবর্তীর্ণ হয় নি বরং পুরোটাই মানুষের রচনা তাহলেও আমরা ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে কোন ভাবেই মুছে ফেলতে পারি না। যে বিষয়টি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দু'টি জাতির সর্বসম্মত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত, বর্তমানে তা সন্দেহপূর্ণ ও কাল্পনিক আখ্যায়িত হতে পারে না। যেভাবে আমরা রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বিক্রমজিত ও বৌদ্ধ'র অঙ্গত্বকে অঙ্গীকার করতে পারি না। অথচ আমরা সেসব পুস্তককে খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত মনে করি না। প্রশ্ন হলো, কেন অঙ্গীকার করতে পারি না? ঐতিহাসিক পরম্পরা থেকে সাব্যস্ত হবার কারণে অঙ্গীকার করতে পারি না।

কিছু সংখ্যক কাঠ মোল্লা অন্তুত অঙ্গতার গহ্বরে নিমজ্জিত। তারা 'তাহরীফ' (বা প্রক্ষেপণ নামে যে একটি শব্দ শুনে রেখেছে, তা স্থানে-অস্থানে ব্যবহার করে ঐতিহাসিক পরম্পরাকে বৃক্ষাঙ্কলি প্রদর্শন করেছে। বরং তারা একে নিশ্চিহ্ন করতে প্রয়াসী। এটি অত্যন্ত লজ্জাকর কথা, আমাদের জাতিতে এমন লোকও মৌলভী নামে খ্যাত যারা জাতির পরম্পরায় বা ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সাব্যস্ত বিষয়কেও প্রহণ করে না। অথবা অপ্রাসঙ্গিক ছেট-খাট বিষয়কে তাহরীফ বা প্রক্ষেপণের গভিভূক্ত করে। আর চিন্তা করে না যে, এস্লে ইহুদীরা যদি প্রক্ষেপণের আশ্রয় নিতো তাহলে এই হস্তক্ষেপ শ্রীস্টানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতো আর যদি শ্রীস্টানরা পরিবর্তন করতো তাহলে ইহুদীদের দাবীর পরিপন্থী হতো, অথচ যে শব্দ তওরাতের বিভিন্ন অধ্যায়ে সংরক্ষিত আছে তা শ্রীস্টানদের স্বার্থে একান্তই হানিকর সাব্যস্ত হচ্ছে। কেননা সেগুলোর মাধ্যমে

* টীকা: - মহানবী (সাঃ) কর্তৃক আগমনকারী মসীহকে এই উন্নতের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবে বলে উপ্রেখ বস্তুত আধ্যাত্মিক নৃমূলকে সমর্থন করে। এর ফলে প্রমাণিত হয়, মহানবী (সাঃ)-এর কথার অর্থ আধ্যাত্মিক নৃমূল ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।

হয়রত মসীহর আবির্ভূত হবার পূর্বে এলিয়র সশরীরে অবতরণের ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চিত অর্থে প্রমাণিত। এমতাবস্থায় প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে স্বীষ্টানদের সাথে ইহুদীদের ঐকমত্য নিজ হাতে নিজের নাক কাটার মত বিষয়। কারণ হচ্ছে, এলিয়'র অবতরণের ভবিষ্যদ্বাণীকে বাহ্যিক অর্থেই যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে হয়রত দ্বিসা'র সত্য নবী প্রমাণিত হওয়া অসম্ভব। কেননা এলিয় নবী এখনও সশরীরে আকাশ থেকে নায়েল হন নি। তাঁর পরে যে দ্বিসা নবীর আসা অবধারিত তিনি কীভাবে এসে গেলেন? আর যদি বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ না করেন এবং এলিয়'র অবতরণকে আধ্যাত্মিক অবতরণ আখ্যা দেন তাহলে দ্বিসার অবতরণ সম্পর্কে কেন বাহ্যিকতাকে আঁকড়ে ধরে বসে আছেন। 'নুয়ুল' বাস্তব সত্য একটি বিষয়। এর প্রতি আমরা ইমান রাখি বরং এর প্রকাশও আমরা দেখেছি। কিন্তু যে অর্থে ইহুদীরা বানের এবং শূকর আখ্যায়িত হয়েছে আর এগী গুলো অস্তিত্ব সাব্যস্ত হয়েছে, হেদোয়াত লাভের পর নুয়ুলের এমন বাহ্যিক অর্থ করা তারই সাজে যার বানের এবং শূকর সাব্যস্ত হবার আগ্রহ আছে। খোদা তাঁলা সত্যবাদী মু'মিনদেরকে এরপ অর্থ করা থেকে রক্ষা করুন, এটা সেই অভিশাপের সংবাদ প্রদান করে যা ইতোপূর্বে ইহুদীদের ওপর নিপত্তি হয়েছে। এ বিষয়ে আর কি লিখবো আর কিছীবা বলবো? খোদা তাঁলা যাকে হেদোয়াত না দেন আমরা তাকে কি করে দিতে পারি! সেই মালিক যার চোখ না খুলেন আমরা কি করে জীবিত তা খুলতে পারি? যে মৃতদেরকে তিনি জীবিত না করেন আমরা তাদেরকে কি করে করতে পারি? হে মালিক ও সর্বশক্তিমান খোদা! এখন দয়া ও করুণা কর। এই অনেককে দূরীভূত কর এবং সত্য প্রকাশ কর এবং মিথ্যাকে নিশ্চিহ্ন করে দাও। কেননা সব শক্তি-সামর্থ্য ও দয়া কেবল তোমারই। আমীন, আমীন, সুস্মা আমীন।

এরপর আবার স্পষ্ট করা দরকার, ফিরিশ্তাদের অবতরণকেও কিন্তু আমরা অস্বীকার করি না। কেউ যদি এটি প্রমাণ করতে পারে যে ফিরিশ্তারা আকাশকে নিজেদের অস্তিত্বশূন্য রেখে অবতরণ করে, তাহলে আমরা সাগ্রহে তার সেই প্রমাণকে শুনবো। আর সত্যিকার অর্থেই যদি প্রমাণিত হয় তাহলে আমরা তা মেনেও নিব। আমাদের যতটা জানা আছে তা হলো, ফিরিশ্তাদের অস্তিত্ব বিশ্বাসের অঙ্গ। খোদা তাঁলার নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ এবং ফিরিশ্তাদের অবতরণ এ দু'টি এমন বাস্তব বিষয় যা আমাদের বোধশক্তির বাহিরে। হ্যাঁ, আল্লাহর কিতাব থেকে এতটুকু প্রমাণিত হয়, নতুন সৃষ্টির আকারে ফিরিশ্তারা পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। হয়রত দেহীয়াহু ক্ষালবী'র আকৃতিতে হয়রত জিব্রাইলের বিকাশটি কি ছিল? নতুন সৃষ্টি, নাকি অন্য কিছু? তাহলে বল, নতুন সৃষ্টির প্রতি বিশ্বাস আনার জন্য পূর্ববর্তী সৃষ্টিকে কি মিটাতেই হবে? না মোটেও। বরং প্রথম সৃষ্টিকে আকাশে নিজ স্থানে অধিষ্ঠিত এবং কর্মরত রেখে দ্বিতীয় সৃষ্টি খোদা তাঁলার ব্যাপক শক্তির একটি বহি:প্রকাশ মাত্র। একই সন্তাকে দু'টি পৃথক স্থানে দু'টি পৃথক দেহের আকারে দেখানো কি খোদা তাঁলার পক্ষে অসম্ভব? কক্ষনো না। 'আলাম তাঁলাম আল্লাহহা আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্ষাদীর'। তোমরা কি জানো না, আল্লাহ তাঁলা সমস্ত বিষয়ে সর্বশক্তিমান?

অতঃপর শেখ বাটালভী সাহেব আমাদের পুস্তক ‘তবলীগ’ এর কিছু ভুল বের করেছেন বলে আত্মপ্রসাদ নিচ্ছেন। আমরা আক্ষেপের সাথে লিখছি, অঙ্গ-বিদ্বেষ বা অজ্ঞানতার কারণে সঠিক এবং ব্যাকরণের রীতিসম্মত শব্দ বিন্যাসকেও তিনি ভুল আখ্যা দিয়েছেন। এ কাজের জন্য যদি বিশেষ কোন সভার আয়োজন করা হলে আমরা তাকে বুঝিয়ে দিতে পারি, এরপ তড়িঘড়ির ফলে কি কি লাঞ্ছনা পোহাতে হয়। কিয়ামতের নির্দশনাবলী প্রকাশ পেয়ে গেছে, কিন্তু আপনার তা বুবার সামর্থ্য নেই। এই হলো জ্ঞানের বহর! এতদস্বেও মৌলভী হবার দাবী। ‘ইন্ডিলিঙ্গাহি ওয়া ইন্ডা ইলাইহি রাজিউন’। যেসব ভুল-ক্রটি তিনি বড় কষ্ট করে উদ্ঘাটন করেছেন এ সব জড় করে যদি একত্রে লেখা হয় তাহলে দুই অথবা দেড় লাইনের কাছাকাছি হবে। এর বেশীর ভ.গই ছিল লিপিকারের ভুল-ক্রটি। এবং তিনটি ভুল প্রক্রিয়া রিটিং এর সুযোগ ন. ধাকার কারণে বা দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কারণে রয়ে গিয়েছিল। এছাড়া বাকী শেখ সাহেবের নিজ জ্ঞানের সংকীর্ণতা এবং বোবার ঘাটতি। এতে প্রমাণিত হয়, শেখ সাহেব কখনই আরবী ভাষা শেখার প্রতি মনযোগ দেন নি। তিনি মুখ্য যদি বক্ষ রাখতেন এবং নিজের নগ্নতা প্রকাশ না করতেন তাহলে ভাল হতো। আমাদের সেই মনোবাঞ্ছা অপূর্ণই থেকে গেল, শেখ সাহেব কবে আমাদের পুস্তকাদির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গদ্য ও পদ্য সম্পর্কিত বাণিজ্যাপূর্ণ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করবেন এবং আমাদের কাছ থেকে পুরস্কার নিবেন আর প্রকৃতপক্ষেই তার মৌলভী এবং আরবী ভাষাবিদ হবার স্বীকৃতি আদায় করবেন।

আমি কয়েকবার বলেছি, এসব বই-পুস্তক ঐশ্বী সমর্থনপুষ্ট হয়ে লেখা হয়েছে। আমি এগুলোকে ওই এবং ইলহাম বলি না কিন্তু এটি অবশ্যই বলবো, খোদা তাঁলার বিশেষ ও অলৌকিক সমর্থন এসব পুস্তিকা আমার হস্ত দ্বারা লিখিয়েছে। আমি কয়েকবার মুদ্রিত আকারে বলেছি, উক্ত শেখ সাহেব যার সম্পর্কে আমার বিশ্বাস হলো, তিনি প্রবঞ্চনার শিকার এবং আরবী’র জ্ঞান থেকে কোন দৈব কারণে বর্ধিত তিনি যেন প্রতিযোগিতার মাঠে অবতীর্ণ হন, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এসে আমার এ সব দাবীকে যেন ভাস্ত প্রমাণ করেন। কিন্তু শেখ সাহেব কেন এদিকে মনোযোগ দেন না? কি এমন সমস্যা যা তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখছে? সমস্যা একটিই। তা হচ্ছে, তিনি আরবী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ এবং বর্তমানে তিনি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছেন। তার পক্ষে কোনক্রমেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সহ্য নয়। এটি সেই ইলহামের পূর্ণতা যাতে বলা হয়েছে, ‘ইন্নি মুহাম্মদ মান আরাদা ইহানাতাকা’। এ সেই মুহাম্মদ হসেইন, যে এই অধিম সম্পর্কে যত্নত বলে বেড়াতো, এ ব্যক্তি চরম অজ্ঞ আরবী ভাষা দূরে থাক আরবির একটি পদও সে জানে না। আর যেসব উচ্চ মার্গের আলেম ও জ্ঞানী-ব্যক্তিবর্গ আমার সাথে রয়েছেন, তাদের সম্পর্কে বলতো এরা নিছক মুনশী গোছের লোক। সুতরাং খোদা তাঁলার আত্মভিমান তাকে নগ্ন করার এবং তার অহংকারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তাকে দেখাতে চেয়েছে যে, আত্মস্তুরিতা ও আত্মশাধার পরিগতি কী হয়! সুতরাং এর চেয়ে বড় লাঞ্ছনা আর কি হতে পারে? যে ব্যক্তিকে সে অজ্ঞ মনে করতো এবং মিথরে দাঁড়িয়ে, সভা-সমিতিতে বসে বার বার বলতো, আরবী ভাষা সম্বন্ধে এ ব্যক্তি অনবহিত ও চরম

অজ্ঞ, তাঁরই হাতে খোদা তাঁলা একে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করেছেন। এটি যদি নির্দশন না হয় তাহলে মুহাম্মদ হসেইনের উচিত ছিল তার সব বক্তু-বান্ধবের সহায়তায় ‘নূরুল হক্ক’ এবং ‘কিরামাতুস্স সাদেকীন’ এর উত্তর লেখা। এ ব্যক্তিকে বড়-বড় পুরক্ষারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। সহস্র অভিসম্পাতের ভাস্তার তার সামনে রাখা হয়েছে। কিন্তু সে এর প্রতি মনযোগ দেয় নি। অতএব এসব হচ্ছে সত্যের বিরোধিতার ফল। ‘ফাত্তাকুলাহ্ ইয়া উলিল আবসার’! অর্থাৎ হে ক্ষুম্মান ব্যক্তিরা! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর।

স্মরণ রাখা উচিত, শেখ সাহেবের নিতান্তই প্রতারণামূলক একটি অজুহাত হলো, নূরুল হক্ক পুস্তকে পাদরীরাও সমোধিত তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবে পুস্তিকা লেখা থেকে বিরত থাকা হয়েছে। অর্থাৎ এভাবে এড়িয়ে গিয়ে তিনি প্রাণ রক্ষার পথ খুঁজে বের করেছেন। কিন্তু বুদ্ধিমানরা জানেন, এই অজুহাত একান্তই কাঁচা, বাজে এবং একটি লজ্জাকর ঔষঙ্গত্য। কেননা আমরা পূর্বেই লিখেছি, কেবল পাদরী ও ধর্মহীন মানুষই এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যর্থ হতে পারে, সত্যিকার মুসলমান নয়। সুতরাং শেখ সাহেব যদি এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুস্তিকা প্রকাশ করতেন তাহলে পাদ্রীদের আরো বেশি লাঞ্ছনা দেখতে হতো। আর মানুষ বলতো, মুসলমানরাই এই পুস্তিকা তৈরী করেছিল এবং মুসলমানরাই এর মোকাবিলায় আরেকটি পুস্তিকা লিখেছে। কিন্তু পাদ্রীদের দ্বারা কিছুই হয় নি। এছাড়া তিনি হাজার রূপী পুরক্ষার লাভ করে আম’র ইলহামকে তিনি মিথ্যা প্রমাণ করতে পারতেন এবং জাতির মাঝে সম্মান অর্জন করতে পারতেন। এর মাধ্যমে তার কয়েকজন পুরনো বক্তু যারা বলছেন, মুহাম্মদ হসেইন উর্দু ভাষী, আরবী জানেন না, তাদের এ সন্দেহও দূরীভূত হয়ে যেতো। কিন্তু এখন যেহেতু প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে তিনি নিজেকে প্রত্যাহার করেছেন, তাই চরম লজ্জা বিবর্জিত কাজ হবে যদি তিনি ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর লোকদের নাম মুনশী রাখেন এবং নিজে সেসব কাজ এড়িয়ে চলেন যা ‘মৌলভী’র পদব্যাধি পাবার জন্য আবশ্যিকীয় শর্ত। এমন লোকদের বিশ্বাস আচর্যজনক যারা এখনও এদেরকে আরবী বিশারদ মনে করে এবং ‘মৌলভী’ নামে ডাকে। একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আমি তাকে শেষ বারের মত আমঙ্গল জানাচ্ছি এবং পূর্ববর্তী পুস্তিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে ‘সিরুরুল খিলাফাহ’-র দিকে শেখ সাহেবকে আহবান জানাচ্ছি। আপনার জন্য সাতাশ দিনের সময়কাল এবং নগদ সাতাশ রূপী পুরক্ষার নির্ধারণ করা হয়েছে। আর আমি এ টাকা আপনাকে হস্তান্তর করতে আগ্রহী। আপনার চাওয়া সন্ত্রেও আমরা যদি না পাঠাই তাহলে আমরা মিথ্যাবাদী। আমরা পূর্বেই এ রূপী পাঠাতে পারি কিন্তু আপনি (এই মর্মে) আপনার অঙ্গীকারনামা ছাপিয়ে দিন, ‘আমি সাতাশ দিনের মধ্যে এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুস্তিকা প্রকাশ করবো’। আপনি যদি এ সময়সীমার মধ্যে কোন পুস্তিকা প্রকাশ করেন তাহলে আপনি কেবল সাতাশ রূপীই পুরক্ষার পাবেন না বরং আমরা সাধারণে একথা ছাপিয়ে প্রচার করবোঃ আমরা এতকাল যাবৎ যে আপনাকে মৌলভী মুহাম্মদ হসেইন বলি নি, কেবল ‘শেখ’ ‘শেখ’ বলে

ডেকেছি এটি আমাদের মারাত্মক ভুল ছিল। প্রকৃতপক্ষে আপনি বড় জ্ঞানী এবং সাহিত্যিক এবং আপনি এতই যোগ্য এক পভিত হাদীস সম্বন্ধে যাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সর্বজনবিদিত!!

দেখুন, এতে আপনার কত বড় বিজয় অর্জিত হচ্ছে! এরপর টাকা সংগ্রহ করার জন্য মানুষকে কষ্ট দেয়া বা সেই চাহুরী থেকে পদত্যাগ করার আর কোন প্রয়োজন হবে না। কেননা, আপনি একবার যখন আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দেখিয়ে দিবেন আমার ইলহামকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছেন বলে প্রতীয়মান হবে। এমতাবস্থায় আমার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না বলে প্রমাণিত হবে। অতএব আপনাকে আমি খোদা তা'লার দোহাই দিছি! আপনি যদি আরবীর সামান্যতম জ্ঞানও রাখেন, এক তিল পরিমাণ জ্ঞানও যদি থেকে থাকে তাহলে এবার কোন ক্রমেই আপনি এড়িয়ে যাবেন না। আর এই পুস্তিকার্য যদি কোন ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পুস্তিকার ভুল-ভ্রান্তি থেকে যত বেশি সংখ্যায় (ভুল) পাওয়া যাবে সেই প্রত্যেক বাড়তি ভুলের জন্য আপনাকে এক রূপী করে দেয়া হবে। এই আবেদনের মেয়াদকাল ২৫শে জুলাই, ১৮৯৪ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আপনি ২৫শে জুলাই, ১৮৯৪ পর্যন্ত বিজ্ঞাপন আকারে ছাপিয়ে এই আবেদন যদি প্রেরণ না করেন তাহলে মনে করা হবে, আপনি এক্ষেত্রেও পলায়ন করেছেন।

সেসব নির্বোধ নামসর্বস্ব মৌলভী আর নিজেদের ওয়াজ এবং পুস্তিকাদিকে যারা জীবিকার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে, তাদেরকে ভালোভাবে ধৃত করা মুসলমানদের দায়িত্ব। যেখানেই এ ধরনের কোন মৌলভী ওয়াজ করতে আসে তাকে দ্বন্দ্বভাবে এই প্রশ্ন করা উচিত, আপনি কি প্রকৃতপক্ষেই মৌলভী নাকি স্বার্থসিদ্ধির জন্য মৌলভী নাম ধারণ করেছেন? আপনি কি ‘নূরুল হক্ক’ বা ‘কিরামাতুস সাদেকীন’ এর কোন উত্তর লিখেছেন? অথবা ‘সির্রল খিলাফাহ’ পুস্তিকার মোকাবিলায় কোন পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন কি? নিশ্চিত জেনে রাখুন, এরা মৌলভী নয়। ‘নূরুল হক্ক’ প্রভৃতি পুস্তিকাদি মুসলমানদের নিজেদের কাছে রাখা উচিত আর পান্তি এবং এ শ্রেণীর মৌলভীদেরকে সব সময় এর মাধ্যমে অপরাধী সাব্যস্ত করা এবং এদের স্বরূপ প্রকাশপূর্বক ইসলামকে এদের ফির্তনা থেকে রক্ষা করা উচিত। ভালভাবে জেনে নিন, এরা সেসব লোক যারা প্রতারণামূলকভাবে মৌলভী নাম ধারণ করে শত শত মুসলমানকে কাহের আখ্যাদান করেছে এবং ইসলাম ধর্মে চরম বিশ্রঙ্গন সৃষ্টি করেছে। ওয়াস্সালামু আলা মানিউবায়াল হুন।

গ্রন্থকার

খাকসার

গোলাম আহমদ আফান্নাহু 'আনন্দ

শেখ আব্দুল হোসেন নাগপুরী

কেউ কেউ আমাকে শেখ আব্দুল হোসেন নাগপুরী সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে যে সে প্রতিশ্রূত মাহুদীর নায়ের হবার দাবী করে এবং বলে, সে বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। স্মরণ থাকা উচিত, আমি এ বিষয় নিয়ে চিন্তা করি নি আর চিন্তা করার প্রয়োজন আছে বলে মনেও করি না। আল্লাহতাল্লা এ বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করবেন। বৃক্ষের পরিচয় তার ফলে। এখনও তোমরা কিছুদিনের মধ্যেই প্রত্যেক বৃক্ষকে তার ফলের মাধ্যমে চিনতে পারবে। যে আমাদের রীতি অনুসরণ করবে সে আমাদেরই একজন আর যে তা অনুসরণ করে না তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তাল্লা শীঘ্রই আমাদের এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। যারা সাহাবিদের সম্মানে আঘাত হলে, আর মহানবী (সাও)-এর সাহাবিদের কাফের ও পাপাচারী মনে করে এমন লোকদের সাথে আমাদের বা আমাদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারা খোদার মনোনীত ধর্মকে টুকরো-টুকরো করে ফেলেছে এবং তারা দুষ্কৃতিপরায়ণতুল্য। তারা এমন মানুষ যারা রসুলুল্লাহকে সত্যিকার অর্থে চিনে নি। তারা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে সঠিক অর্থে মূল্যায়ন করে নি। যে কারণে তারা বলে, তাঁর অধিকাংশ সাহাবী অবাধ্য ও কাফের ছিলেন। তাঁরা নাকি অশীলতা বর্জন করেন নি এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সব ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। অধিকন্তু তারা নাকি মুনাফেক ছিলেন। অতএব আল্লাহ এসব লোকের হৃদয়কে সত্যবিমুখ করেছেন। পৃথিবীতে তারা অন্যায় অহংকার করে বেড়ায় এবং বলে, আমরা রসুলের বংশকে ভালবাসি। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তেমনটি নয়।

গালী ও কাটু কথার মাধ্যমে তারা স্বজাতিকে সংক্ষেষণ করতে চায় অথচ মু'মিন হয়ে থাকলে তাদের পক্ষে আল্লাহ তাল্লাকে সন্তুষ্ট করাই শ্রেয়। সাবধান! তারাই মিথ্যার অনুসরণ করছে। শুন! তারাই বিশুর্জলাপরায়ণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত। ডয়াবহ শক্রতা তাদের চিন্তা-শক্তির ওপর প্রলেপ ফেলেছে তাই তাদের অবস্থা অঙ্কের মত।

তাদের মধ্য থেকে কেউ কখনও রহমান খোদার বক্তু হবে না। পরবকালে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং তারা দুর্ভাগদের অন্তর্ভুক্ত। তবে তাদের কথা ভিন্ন যারা তওবা ও আতাসৎশোধন করবে, স্মীয় হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করবে, যারা নিজেদের অন্তরাত্মাকে পবিত্র করবে এবং আরশের অধিপতির কাছে নিষ্ঠার সাথে ফিরে আসবে। আল্লাহ কখনও তাদের প্রতিদানকে নষ্ট হতে দেবেন না এবং তাদেরকে কখনও প্রত্যাখ্যাতদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। তোমরা তাদের ললাটে খোদা প্রেমের জ্যোতি এবং চেহারায় খোদার কৃপার ছাপ দেখতে পাবে এবং তোমরা তাদেরকে আত্মরিক বক্তু হিসেবে দেখতে পাবে। তাদের হৃদয়ে ঈমানকে বন্ধনমূল করে দেয়া হয়েছে। তাদের এবং তাদের কুপ্রবৃত্তির মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে যে কারণে তারা অন্যায়ভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন না। তারা আল্লাহর সামনে আকৃতি মিনতি সহকারে নত হন। তারা নিজ হৃদয়ে প্রেমাঙ্গদের জন্য প্রেমের এক অট্টালিকা গড়েছেন এবং গভীর প্রেমানুরাগ নিয়ে শুধু তাঁকে পাবার উদ্দেশ্যে

বেরিয়েছেন। তাদের প্রভু তাদের প্রতি যা অবর্তীণ করেছেন তারা এর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট অংশের অনুসরণ করেন এবং তারা প্রকৃত অর্থে তাকওয়া অবলম্বন করেন। তুমি তাদেরকে মৃতবৎ দেখতে পাবে। তারা গালি দেয়া ও পরচর্চাকে এড়িয়ে চলেন। অশ্রীলতা থেকে দূরে থাকেন। একই সাথে পাপের জন্য ক্ষমাও চাইতে থাকেন। তারা রসূলের সত্যিকার অর্থে আনুগত্য করেন বরং আনুগত্যের ক্ষেত্রে তুমি তাদেরকে আআবিলীন লোকদের মত দেখতে পাবে। অনুরূপভাবে, তুমি অবাধ্যদেরকেও তাদের লক্ষণাবলী, তাদের শিরুক এবং মিথ্যার দুর্গম্বৰ মাধ্যমে চিনতে পারবে। সুতরাং হে প্রশংসকারীর দল! সিংহ এবং শিয়ালের মাঝে তুলনা কিসের?

তোমাদের স্মরণ থাকা উচিত, ওলীদের সনাত্ত করার জন্য তাকওয়াপূর্ণ দৃষ্টির প্রয়োজন। সুতরাং ধৃষ্টতা দেখাবে না। তড়িঘড়ি করে কাউকে আক্রমণ করবে না। তা না হলে তোমরা অপরাধী বলে গণ্য হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধারণা পরিষ্কার কর আর সৎকর্ম কর, কেননা সৎকর্মশীলদেরকে আল্লাহ তাল্লা ভালবাসেন। কারো প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে পুণ্যবানদের শক্তিয়া প্ররোচিত না করে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি চান অনুগ্রহ করেন। তিনি যা করেন সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হন না। সুতরাং ধৃষ্টদের মত অস্তীকার করো না। ওলীদের গালমন্দ করাকে সামান্য বিষয় মনে করো না। তাঁরা এমন মানুষ যাদের খাতিরে আল্লাহ ত্রোধারিত হন আর তাঁদের শক্তদের তিনি আক্রমণ করেন এবং তাঁরা সাহায্যপ্রাণদের অঙ্গুর্জু। তাঁদের সাথে উভয় প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস কর। তোমরা যদি খোদাভোক হয়ে থাক তাহলে ধৃষ্ট হয়ো না এবং সীমালঞ্চন করো না। যে ব্যক্তি কোন সত্যবাদীর শক্তিতা করে শাস্তির তীক্ষ্ণ বাপটা অবশ্যই তাকে আঘাত করবে। সুতরাং তুরাপরায়ণ লোকদের জন্য পরিতাপ! তোমাদের কেউ যদি কোন নিষ্ঠাবান ব্যক্তির বিরোধিতা করে থাকে তাহলে তাকে আমি সদুপদেশ দেবো, তার মধ্যে খোদাভোক থেকে থাকলে এমন কাজের যেন সে আর পুনরাবৃত্তি না করে।

সত্য এসে পড়ার পর যে তা গ্রহণ করে না বরং বক্রপছ্তা অবলম্বন করে এমন ব্যক্তি আক্ষেপের সাথে কাঁদবে। আল্লাহ যতক্ষণ কোন জাতির সামনে সব যুক্তি-প্রয়াণ পুরুষানুপুর্জনকে উপহাসন না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে ধ্বংস করেন না। এরপরও যদি তারা অস্তীকার করে তাহলে তিনি শক্তিশালী বাদশাহুর ন্যায় তাদেরকে ধৃত করেন। সুতরাং হে উদাসীনগণ! তাঁকে ভয় কর।

ভারতীয় আলেমদের প্রতি চিঠি

এদের মাঝে রয়েছেন গজনীর মৌলভী আব্দুল জব্বার, মৌলভী আবদুর রহমান লক্ষ্মোকোষ্ঠ, মৌলভী গোলাম দস্তগীর কসুরী, মৌলভী মুশতাক আহমদ লুধিয়ানী, মৌলভী মোহাম্মদ ইসহাক বেতালভী, কাজী সোলেমান এবং রশীদ আহমদ গাঁগোহী

ମୌଳଭୀ ମୋହାମ୍ମଦ ବଶୀର ଭୂପାଲୀ, ମୌଳଭୀ ଆବଦୁଲ ହକ ଦେହଲଭୀ, ମୌଳଭୀ ନୟିର ହୋସେନ ଦେହଲଭୀ, ଶେଖ ହୋସେନ ଆରବ ଭୂପାଲୀ, ହାଫେୟ ଆବଦୁଲ ମନ୍ନାନ ଉଜୀରଆବାଦୀ, ମୌଳଭୀ ଶାହ୍ଦୀନ ଲୁଧୀଯାନୀ, ମୌଳଭୀ ଆବଦୁଲ ମଜୀଦ ଦେହଲଭୀ, ମୌଳଭୀ ଆବଦୁଲ ଆଜିଜ ଲୁଧୀଯାନୀ, ମୌଳଭୀ ଆବଦୁଲାହ ତଲୋଦୀ, ମୌଳଭୀ ନୟିର ହୋସେନ ସାହାରନପୂରୀ ।

ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲାର ନାମେ ଯିନି ଅୟାଚିତ୍-ଅସୀମ ଦାନକାରୀ, ବାରବାର ଦୟାକାରୀ । ସବ ପ୍ରଶଂସା ଦେଇ ସନ୍ତାର ଯିନି ତମିଶାଜ୍ଞମ ରାତେର ପର ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିତ କରେନ ଏବଂ ଅନାବୃଷ୍ଟିର ପର ମୁଷଳଧାରେ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷଣ କରେନ । ଯିନି ଶ୍ଵାସରଙ୍ଗକର ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାର ପର ବାୟୁ ପ୍ରେରଣ କରେନ । ଖାଲ୍ଲାସେର କୁମଞ୍ଜଗାର ମୁଖେ ତିନି ବାନ୍ଦାଦେରକେ ହେଦ୍ୟାତ ଦାନ କରେନ । ଅନ୍ଧକାର ସଥିନ ଛେଯେ ଯାଇ ତଥିନ ତିନି ତା'ର ଆଲୋ ନାହେଲ କରେନ । ଆର ଅଞ୍ଜତାର ପ୍ଲାବନ୍ରେ ସମୟେ ହେଦ୍ୟାତ ଅବତିର୍ଣ୍ଣ କରେନ । ରସୁଲଦେର ନେତା, ବିଶ୍ୱେର ସେରା ମାନବେର ପ୍ରତି ଆଶିସ ଓ ଶାନ୍ତି ବର୍ଷିତ ହୋଇ ଏବଂ ତା'ର ସେବର ସାହାବା ଓ ଆଲ୍ଲାହର ପୁଣ୍ୟବାନ ବାନ୍ଦାଦେର ପ୍ରତିଓ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଶାନ୍ତି ବର୍ଷିତ ହୋଇ ଯାରା ପ୍ରଥିବୀକେ ନାନାବିଧ ପାପ ଓ ବିଦା'ତମ୍ଭୁକ୍ତ କରେଛେ ଏବଂ ନିଜ କର୍ମର ମାଧ୍ୟମେ ପରିତ୍ର ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀଦେର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଆଦର୍ଶ ରେଖେ ଗେଛେ ।

ଅତଃପର, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ବାନ୍ଦାଗଣ! ଇସଲାମେର ସୌରଭ୍ୟମ ବାତାସ କିଭାବେ ଥେମେ ଗେଛେ, ଏର ପ୍ରଦୀପ ଯେ କିଭାବେ ନିତେ ଗେଛେ, ବିଶ୍ୱାସିତ ଯେ କତ ବୈଶି ବିଭାବ ଲାଭ କରେଛେ ଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଦା'ତ ଯେ କତ ମାରାତ୍କଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପେଯେଛେ ଆର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରେଛେ ତା ଆପନାରା ଭାଲୁଇ ଜାନେନ! ଶତାବ୍ଦୀର ଶିରୋଭାଗ ଯାର ଜନ୍ୟ ଆପନାରା ଅପେକ୍ଷା କରତେନ ତା-ଓ ଅତିକ୍ରମ ହେଯେ ଗେଛେ । ଏକଟୁ ଭେବେ ଦେଖୁନ! କେନ ସେ ମୁଜାଦ୍ଦେଦ ଏଲେନ ନା ଯାର ଜନ୍ୟ ଆପନାରା ଅପେକ୍ଷା କରାଇଲେନ? ଆପନାରା କି ମନେ କରେନ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରେଛେ, ନା କି ଆପନାରା ନିଜେରାଇ ଉଦାସୀନ? ଶୁଣୁନ! ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲା ଆମାକେ ଏ ଯୁଗେର ସଂଶୋଧନେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରେଛେ ଆର ଆମାକେ ତା'ର ଗ୍ରହଣ କୁରାନେର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରେଛେ । ଆପନାଦେର ବିତରିତ ବିଷୟରେ ମୀମାଂସାର ଜନ୍ୟ ତିନି ଆମାକେ ମୁଜାଦ୍ଦେଦ ମନୋନୀତ କରେଛେ । ଆପନାରା କେନ ଆପନାଦେର ହାକମେର (ନ୍ୟାୟବିଚାରକ) ଆନୁଗତ୍ୟ କରେଛେ ନା, ଆର ଆପନାରା କେନ ଅସୀକାର ଓ ଆକ୍ରମଣ କରତେ ବ୍ୟଥ? ଆମି କାଫେର ନାହିଁ ଏବଂ ମୁରତାଦେ ନାହିଁ । ପରିତାପ! ଆପନାରା ଐଶ୍ଵି ରହ୍ୟକେ ବୁଝାତେ ପାରେନ ନି । ଆପନାରା ହତବୁଦ୍ଧି ହେଯେ ଗେଛେ । ଆପନାଦେର ସନ୍ଦେହ ସୀମା ଛାଡ଼ିଯେ ଗେଛେ ଆର ଆପନାରା ଆମାକେ କାଫେର ଅଖ୍ୟାଯିତ କରେଛେ । ଆମି ଆପନାଦେରକେ ଯା ବଲେଛି ଏର ଏକ ଦଶମାଂଶ୍ୟ ଆପନାରା ଉପଲବ୍ଧି କରତେ ପାରେନ ନାହିଁ । ଆପନାରା ଆସଲେ ଏକଟି ତୁରାପରାୟଣ ଜାତି । ଆଲ୍ଲାହର କସମ! ଆମି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ନବୁଓୟତେର ଦାବୀ କରି ନି ଆର ଉତ୍ସତେର ଗଭିର ବାହିରେ ଯାଇ ନି ବେରଂ ଆମି ଖାତାମାନ୍ ନବୀଟିନେର କଲ୍ୟାଣଧାରା ଥେକେ ସ୍ଵଗ୍ରୀୟ ସୁଧା ପାନ କରେଛି । ଆଲ୍ଲାହ୍, ଫିରିଶ୍ତା, କିଭାବ ଓ ରସୁଲଗଣେର ପ୍ରତି ଆମି ବିଶ୍ୱାସ ରାଖି ଏବଂ ଆମି କ୍ଷିବଲାମୂର୍ଖୀ ହେଯେ ନାମାୟ ପଡ଼ି । ଅତଏବ ଆପନାରା କେନ ଆମାକେ କାଫେର ଆଖ୍ୟାଯିତ କରେଛେ? ଆପନାରା କି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭୁ-ପ୍ରତିପାଳକକେ ଭୟ କରେନ ନା?

হে মানবমঙ্গলী! আমার বিষয়ে তড়িঘড়ি করে কোন পদক্ষেপ নিও না । আমার প্রভু জানেন, আমি মুসলমান। সুতরাং মুসলমানদেরকে কাফের আখ্যা দিও না । ঐশী গ্রন্থ ও সুস্পষ্ট কিতাব আল কুরআন সম্পর্কে চিন্তা কর । না জেনে না শুনে মানুষকে কাফের আখ্যা দেয়া এবং ন্যৰ্তা, সহিষ্ণুতা ও সুধারণার পথ পরিত্যাগ করা আর মু'মিনদেরকে অভিসম্পাত করার জন্য আল্লাহু তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন নি । তোমরা জেনে-শুনে কেন আল্লাহুর কথার বিরোধিতা করছো? তোমরা কি মু'মিনদেরকে কাফের আখ্যা দেয়ার জন্য জন্ম নিয়েছো, বা তোমরা কি আমাদের বক্ষ চিরে সেখানে কপটতা, অবিশ্বাস আর মিথ্যাকে দেখতে পেয়েছো? হে লোক সকল! তওবা কর, অনুশোচনা কর এবং লজ্জিত হও । কুরারণার ক্ষেত্রে সীমাতিক্রম করো না । হঠকারিতা পরিহার কর । আল্লাহকে ভয় কর! ধৃষ্ট হয়ো না । আল্লাহর রহমত সম্পর্কে নিরাশ হয়ো না । তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের উম্মতকে নষ্ট হতে দিবেন না । তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য আর রসূলদের প্রেরণ করেছেন যেন মানুষ তাঁদেরকে চেনে এবং যেন তাঁরা মানুষের বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসা করেন । তিনি ধর্মীয় শিক্ষা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যেন তারা আনুগত্য করে এবং পুরুষ্কৃত হতে পারে । তিনি মুজাদ্দেদ প্রেরণ করেছেন । যেন মানুষ বিস্মৃত বিষয় স্মরণ করতে পারে । তিনি তাঁদের জ্ঞানকে প্রখর করেছেন যেন তারা সম্পূর্ণভাবে খোদার হয়ে যান । আর কারা আনুগত্যশীল ও কারা অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী আল্লাহ এটি স্পষ্ট করে দিতে চান । তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের অনুসারীদের জন্য ব্যাতের রীতি প্রবর্তন করেছেন, যেন তারা কল্যাণের উন্নয়নিকারী হতে পারে এবং উন্নতি করতে পারে । তিনি তাঁদের জন্য সুধারণা পোষণ করা আবশ্যিক করেছেন যেন তারা ধৰ্মসের পথ এড়িয়ে চলতে পারে এবং রক্ষা পায় । তিনি তওবা বা অনুশোচনার দুয়ার খুলেছেন যেন তাঁদের প্রতি দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন করা যায় । আল্লাহ তাঁলা ব্যাপক অনুগ্রহ ও দয়ার অধিকারী, আর তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু । আমার কী হয়েছে? আমি আল্লাহ সম্পর্কে কেন মিথ্যা রঁটনা করবো? আল্লাহ অত্যচারী জাতিকে ধৰ্মস করে দেন ।

খোদার পবিত্র ইলহামে আমাকে ঈসা ইবনে মরিয়ম নাম দেয়া হয়েছে । সর্বজ্ঞানী আল্লাহর প্রত্যাদেশ আমাকে এ মর্যাদায় দাঁড় করিয়েছে । সুতরাং এ থেকে পদত্যাগ করা আমার দ্বারা কীভাবে সম্ভব? আমি এটাকে আল্লাহর কিতাবের আয়াত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের হাদীস-বিরোধী মনে করি না । সত্যকথা হলো, তোমাদের পদস্থলন ঘটেছে । তোমাদের মনে লাঞ্ছিত হবার ভয় নেই । আর তোমরা কুরআনের দিকে ফিরে আসো না এবং হাদীস সম্পর্কেও গভীরভাবে চিন্তা কর না । তোমরা হেদায়াত এবং সোজা পথকে পরিত্যাগ করেছো আর শক্ততা ও বিবাদের পথকে অবলম্বন করেছো । তোমাদের বিবেককে অবাধ্য আত্মার কুপ্রবৃত্তি হয়ে ফেলেছে । তোমরা আয়াতের অর্থকে বুঝো নি আর পক্ষপাদুষ্ট লোকদের মত ধারণা পোষণ করেছো । তোমাদের জন্য পরিতাপ! তোমরা মানুষকে অপমান করার জন্য সদা ব্যগ্র । কিন্তু খালাসের (বা

কুমক্ষণাদাতার) প্রতারণার কারণে নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি তোমাদের চোখে পড়ে না। তোমরা উদাসীনদের ন্যায় দুনিয়া ও এর ধনসম্পদের লোভে পরম্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করছো। আল্লাহর কসম! বস্তুবাদিতা ও ধার্মিকতা কখনো একত্র হতে পারে না! তোমরা ভেবে দেখলে বুঝতে পারতে এটা দুর্জন স্বাধীন নারীকে বিয়ে করা এবং দুই সতীকে নিয়ে সংসার করার চেয়েও কঠিন একটা বিষয়।

স্মরণ রেখো! তাকওয়ার পোষাক কারো কোন কাজে লাগবে না যদি তা সেই তত্ত্বশূন্য হয় যা শুধু খোদার দৃষ্টিতে স্বীকৃত। প্রত্যেক কালো রঙের জিনিষ যেমন খেজুর নয়, তেমনই পানীয় মাছিই মদ নয়। অনেক মিথ্যাবাদী এমন আছে যারা মানবকুলের প্রতিপালক-প্রভুর সাথে তেমন সম্পর্ক রাখে যেমন সম্পর্ক জংগলের এক গিরগিটি গাছের সাথে রাখে। গাছের ফলও এর ভাগ্যে জুটে না এবং তার সুমিষ্টতারও কোন ধারণা নেই এর। মুনাফেকদের হস্তয়েকে আল্লাহ তাঁলা এমনই বানিয়েছেন। তারা নামায পড়ে ঠিকই কিন্তু জানে না নামায কী, তারা সদকাও দেয় কিন্তু জানে না সদকা কী, তারা রোয়া রাখে ঠিকই কিন্তু জানে না রোয়া কী, হজ্জ করে কিন্তু জানে না এহরাম কাকে বলে, তাশাহুদ পড়ে কিন্তু একত্ববাদ কী তা জানে না। তারা ‘ইন্না লিল্লাহ’ পড়ে কিন্তু এক-অধিনায়ী সর্বাধিপতিকে তারা চিনে না। তারা নিছক পশ্চতুল্য বরং নির্কৃষ্টদের চেয়ে নির্কৃষ্ট। এবার রইলো আল্লাহর নিষ্ঠাবান দাস এবং খাঁটি প্রেমিকদের কথা। তাঁরা তত্ত্বকথার মূলকে ও সূক্ষ্ম বিষয়ের সূচ্ছতম দর্শনকে সহজেই অনুধাবন করেন। আল্লাহ তাঁদের হস্তয়ে নিজ মাহাত্ম্য ও প্রতাপের বৃক্ষ রোপণ করেন। তাঁরা তাঁর ভালবাসায় জীবিত থাকেন এবং তাঁর প্রেমেই মৃত্যুবরণ করেন। হাশর দিবসে তাঁর ভালবাসা নিয়েই তাঁদের পুনরুত্থান হবে। তাঁরা খোদা-প্রেমে বিলীন এক জাতি। খোদার খাতিরে তাঁরা প্রেমের বেদনা সহ্য করেন এবং তাঁরা দুনিয়াবিমুখ হয়ে তাঁর প্রতি সম্পূর্ণভাবে অনুরক্ত হন। তিনি নড়ালে তাঁরা নড়েন। খোদা চাইলে তাঁরা বলেন, খোদা দেখালে তাঁরা দেখেন, তাঁর ইঙ্গিতে তাঁরা শক্ততা পোষণ বা বন্ধুত্ব করেন। তাঁদের ঈমানই প্রকৃত ঈমান এবং তাঁদের আত্মবিলুপ্তিই তাঁদের প্রকৃত অবস্থান। খোদার আত্মাভিমানের চাদরে তাঁরা এমনভাবে আবৃত যে পর্দাবৃত দৃষ্টির কেউই তাদেরকে চিনতে পারে না। তাঁদেরকে তাঁদের লক্ষণাবলী, অলৌকিক নির্দর্শন এবং সেই প্রভুর সাহায্যের আয়নায় চেনা যায় যিনি তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব রাখেন এবং যিনি তাঁদের প্রতি বিভিন্ন প্রকার নিয়ামত বর্ণণ করেন। সব সমস্যায় তিনি তাঁদের সহায় হন এবং সব যুদ্ধে তাঁদের জন্য প্রত্যক্ষ সাহায্য নিয়ে আসেন। তাঁরা রহমান খোদার শিষ্য। আল্লাহ তাঁদের জন্য তেমনই অপরিহার্য যেমন শিশুদের জন্য দাই মা আবশ্যক। তাঁদের সব গতিবিধি এক শক্তিধর হাতের ইশারায় নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এমন এক সন্তার মাধ্যমে সাধিত হয় যিনি সৃষ্ট জগতের দৃষ্টি সীমার বাইরে। তাঁদের সব কাজ অলৌকিক। সৌভাগ্যের সব ক্ষেত্রে তাঁরা অন্যদের তুলনায় অনেক এগিয়ে থাকেন। তাঁদের দৈর্ঘ্য ধারণও এক ধরণের নির্দর্শন। তাঁদের আস্তরিকতাও নির্দর্শন। তাঁদের বিশ্বস্ততাও নির্দর্শন। তাঁদের সন্তুষ্টিও নির্দর্শন।

তাঁদের সহনশীলতাও নিদর্শন। তাঁদের জ্ঞানও নিদর্শন। তাঁদের লজ্জাবোধও নিদর্শন। তাঁদের দোয়াও নিদর্শন। তাঁদের কথাও নিদর্শন। তাঁদের ইবাদতও নিদর্শন এবং তাঁদের দৃঢ়চিত্ততাও নিদর্শন। তাঁরা খোদার দৃষ্টিতে এমন এক পদমর্যাদা রাখেন যে সম্পর্কে জগৎ অনবহিত। তাঁরা এমন এক জাতি যাদের সহাবস্থানকারীরাও বিধিত থাকে না এবং তাঁদের বন্ধুরাও প্রত্যাখ্যাত হয় না। তুমি যদি দুর্গঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে না থাকো আর তুমি দুর্ভাগ্য না হয়ে থাকো, তা হলে তাঁদের সভায় তুমি ভালবাসার সৌরভ ও কল্যাণের হিমেল বাতাস অনুভব করবে। তাঁদের দেয়ালে, দৃঘারে ও বন্ধু-স্বজনদের প্রতি বরকত বর্ষিত হয়। তুমি অঙ্গশ্রেণীভুক্ত না হয়ে গিয়ে থাকলে তুমি তা দেখতে পাবে।

হে মানুষ! তোমাদের অজুহাত খড়িত হয়েছে আর তোমাদের মিথ্যাও প্রকাশ পেয়ে গেছে। তোমরা আমার ওপর খুনীর মত আক্রমণ করেছো কিন্তু আমার প্রভু ধৰংসের কবল থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। অতএব আমি সফল ও বিজয়ী হয়েছি। হে লোকসকল! তোমরা চরমভাবে সীমালজ্জন করেছো। সুতরাং সর্বজ্ঞানী ও সম্যক অবহিত খোদাকে ভয় কর। বন্ধুবাদী জগতের স্বার্থে নিজ প্রবৃত্তির বাহনকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে হাঁকিয়ে একে অন্তঃসার শূন্য খোলসে পরিণত করো না এবং পৃথিবীতে সীমালজ্জন করে বেড়িও না।

আমি এমন একজন মানুষ পার্থিব উন্নতি বা অবনতি, জাগতিক সম্মান বা অসম্মান যার কাছে কোন বিষয়ই নয়। বরং এক কৃপণ-ব্যক্তি স্বর্ণ রৌপ্যকে যেভাবে ভালবাসে আমি সেভাবে দারিদ্র ও ধূলি-ধূসুর মলিনতাকে ভালবাসি। আমি বিনয়বন্ত জীবন-যাপনের প্রতি সেভাবে আকৃষ্ট যেভাবে এক রোগী ঔষধের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে অথবা যেভাবে এক ক্ষুধার্ত মানুষ ধনবানদের প্রতি লোভাতুর নয়নে চেয়ে থাকে। আমি সর্বশ্রেষ্ঠ স্তো আল্লাহর ওপরই নির্ভর করি। আমি মানুষের অসৌজন্যমূলক কথাবার্তা এবং প্রতারণামূলক উক্তির ভয় করি না। আমার প্রভু আমার তত্ত্বাবধান করবেন আর আমাকে সব অনিষ্ট ও শক্রুর যাবতীয় বড়ুয়স্ত্র থেকে রক্ষা করবেন।

হে মানবমণ্ডলী! যে শক্রুতা করে, তোমরা তার অনুসরণ করো না। আমি যদি সত্যের ওপর সত্যিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এসত্ত্বেও তোমারা যদি আমাকে অভিশাপ দাও, মিথ্যাবাদী ও কাফের আখ্যায়িত কর এবং কষ্ট দাও, তবে অত্যাচারীদের পরিণাম কেমন হতে পারে তা নির্ভৃতে বসে একটু চিন্তা করে দেখ! আমি স্নেহশীল খোদার নির্দেশেই খিলাফতের কাজ নতুনভাবে আরঞ্জ করেছি। আমি আমার তত্ত্বাবধায়ক প্রভুর হাতে তেমনিভাবে লালিত যেমনটি দাই মা'র কাছে দুধের শিশু নিরাপদ। আমি যুগের অশাস্মি, শ্রীস্টানদের আধিপত্য ও বিভিন্ন প্রকার বিশ্বখ্লার কারণে দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিলাম। আল্লাহ যখন লোকচক্ষুর আড়ালে আমার শোচনীয় অবস্থা ও ব্যাকুলতা প্রত্যক্ষ করলেন, আর দেখলেন, আমার হৃদয় উদ্বিগ্ন এবং অশ্রজল বহমান, প্রাণ ওষ্ঠাগত আর ভয়ে আমি থরথরিয়ে কম্পমান, তখন আমার প্রতি তিনি স্নেহ ও দয়ার দৃষ্টিপাত করলেন। তিনি

আমাকে দয়া ও অনুগ্রহের নির্দশনস্বরূপ মনোনীত করলেন এবং বললেন, আমি
তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করলাম। তিনি বলেন,

اردت ان استخلف فخلقت آدم

(আরাদতু আন আসতাখ্লিফা ফাখালাক্তু আদামা অর্থাৎ আমি খলীফা নিযুক্ত
করতে চাইলাম তাই আমি আদম সৃষ্টি করলাম-অনুবাদক ।) অতএব এসব আমার প্রভুর
কাজ। তাই তোমরা মুস্তকী হয়ে ধাকলে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করো না। তিনি যা ইচ্ছা
তাই করেন এতে তোমাদের আশ্র্য হবার কি আছে? তোমাদের ধারণানুসারে ধরে
নিলাম আমি সবচেয়ে নীচ ও অজ্ঞ। কিন্তু আমি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু খোদার অনুগ্রহকে
কিভাবে প্রত্যাখ্যান করি? আমি নিজের পক্ষ থেকে এ কথা বলি নি বরং আমার স্বপক্ষে
'আসার' ও কিতাবের সাক্ষ্য আছে। তোমরা কি তা মানতে প্রস্তুত? তোমরা কি দেখ না
আল্লাহ তা'লা কত স্পষ্টভাবে দুসা (আঃ)-এর মৃত্যুর বিষয়টি বর্ণনা করেছেন আর
সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এর সত্যায়ন করেছেন? আর তোমরা জানতে পারছো
এর সাথে হ্যরত ইবনে আবুসের ব্যাখ্যার সমর্থনও রয়েছে। হে মানুষ! তারপরও
তোমরা অস্মীকার করছো, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের কথাকে অগ্রহ্য করতে ভয় পাচ্ছো
না। 'ন্যূল' শব্দ নিয়ে বাড়াবাঢ়ি করছো, অথচ পূর্ববর্তী প্রস্তুতের আলোকে তোমরা এর
অর্থও জানতে পারছো। তোমাদের জন্য আল্লাহ যে ঘটনাই বর্ণনা করেছেন এর
প্রত্যেকটির দৃষ্টান্তও পূর্ববর্তীদের গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

ইতোপূর্বে অনুরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও এ ভুষ্টার কারণ বোধগম্য নয়।
তোমরা কি জেনেগুনে সত্যের পথ পরিত্যাগ করছো? আল্লাহ বলেছেন, তিনি
তোমাদেরকে আকাশে রিয়্ক দেন। তিনি তোমাদেরকে লোহা, পোষাক, চতুর্স্পদ জষ্ঠ
তথা তোমাদের যা যা প্রয়োজন সব কিছু সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'ন্যূল' শব্দ ব্যবহার
করেছেন। অথচ তোমরা জানো, এসব বস্তু আকাশ থেকে অবতরণ করে না বরং
পৃথিবীতেই হয়। সত্যিকার অর্থে এতে এমনসব উপকরণ অবতরণের প্রতি ইঙ্গিত
রয়েছে যার প্রভাব সুদূর প্রসারী যেমন, উত্তাপ, আলো, বৃষ্টি এবং বাতাস। অতএব
তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা চিন্তা-ভাবনা না করে কেন তাড়াহুড়া করছো? তোমরা
বাহ্যিক বিষয়াদি ভালভাবে জানো অথচ এগুলোর অত্যন্তিত তত্ত্বকে ভুলে যাচ্ছো।
তোমরা আল্লাহর নির্দশনাবলীকে উদাসীনের মত পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছো। আমার
বক্তব্য সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তাহলে আমার পরিণামের অপেক্ষা
কর আর আমিও তা-ই করছি। আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ বহু জ্ঞান গোপন
রেখেছেন। সুতরাং শোন! রহস্য এখনও পর্দাবৃত আর তোমাদের ভাগে শুধু সন্দেহই
রয়ে গেছে। সুতরাং হে অস্মীকারকারী দল! তোমরা সন্দেহের খাতিরে আমাকে
অস্মীকার করো না। বিরত হও, এতে তোমাদের মঙ্গল নিহিত। তোমরা যে আমাকে
কষ্ট দিচ্ছো, তুচ্ছ-তাচ্ছিল করছো, মিথ্যাবাদী আখ্যা দিচ্ছো আর অস্মীকার করছো -

এতে আমি ব্যক্তিগতভাবে সন্তুষ্ট। আমি কেবল খোদার দরবারে অভিযোগ করি। সত্যকথা হলো, আমি যখন সত্যগ্রহণে তোমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখতে পেলাম আর তোমাদের অবজ্ঞাসূচক আচরণ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল তখন আমি বুঝলাম এটি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে এক পরীক্ষা। অবশ্য তাঁর সন্তুষ্টই আমার সন্তুষ্টি, আর তিনিই সবচেয়ে বড় দয়ালু। তখন আমি মহা পরাক্রমশালী প্রভুকে স্মরণ করলাম এবং উত্তমভাবে ধৈর্য প্রদর্শন করলাম। কিন্তু তোমরা হেদায়াত লাভ কর নি বরং অত্যাচার করেছো এবং সীমা ছাড়িয়ে গেছো। আল্লাহ্ বলেন, ‘পরম্পরকে দোষারোপ করবে না’, কিন্তু তোমরা তা করেছো। তিনি বলেন ‘এক জাতি অন্য জাতিকে তিরক্ষার করবে না’, কিন্তু তোমরা করেছো। তিনি বলেন ‘হে ঈসা আমি তোমাকে মৃত্যু দিব’, কিন্তু তোমরা তা-ও অস্বীকার করেছো। তিনি বলেন ‘অধিক পরিমাণে সন্দেহ প্রবণতা পরিহার কর’, কিন্তু তোমরা সন্দেহ করেছো আর আমাকে কাফের আখ্য দিয়েছো এবং অভিসম্পাত করেছো। তিনি বলেন ‘তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করবে না’ কিন্তু তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করেছো একই সাথে অহংকার করেছো, আবার অবজ্ঞাভরে গাল ফুলিয়েছো আর বিরক্তির প্রকাশ করেছো। তিনি বলেন, ‘তোমাদের কেউ যেন কারও পরচর্চা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে চাইবে?’ তিনি আরও বলেছেন, “যে তোমাদেরকে সালাম দেয় তোমরা তাকে কখনও ‘তুমি মোমেন নও’ বলবে না।” এ সন্দেহ তোমরা পরচর্চা করেছো এবং কাফের আখ্য দিয়েছো আর এখন পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে বিরত হতে দেখছি না। তোমরা কি আল্লাহ্ শাস্তি ও কবরের আযাবের কথা ভুলে গেছো? নাকি তোমাদের দায়মুক্তির বিষয়ে গ্রন্থে কোন নিশ্চয়তা দেয়া আছে বা বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক-প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে না মানার অনুমতি দেয়া হয়েছে? চিন্তা কর আর খুব ভালভাবে চিন্তা করে দেখ।

বল দেখি, তোমাদের হৃদয় এ বিষয়ে কি ফতোয়া দেয়? যে আল্লাহ্, যিনি সব অনিচ্ছয়তার সময় তোমাদের সাহায্য করেন, তিনি কি এহেন যুগে মুজাদ্দেদ প্রেরণের ব্যাপারে দ্বিধা করবেন? অথচ ইতোপূর্বে তোমরা বিজয়ের জন্য দোয়া করতে! আর যখন আল্লাহ্ সাহায্য এলো তোমরা তখন সর্বপ্রথম অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে! তোমরা আমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং দূরে সরে গেলে। তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের স্নেহদৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে আর ভালবাসার পরিবর্তে বিদ্যুষ পোষণ করলে। তোমাদের সুধারণা সব উভে গেল, হৃদয়ত্ব হারিয়ে গেল বরং পলায়ন করল এবং তোমরা সবচেয়ে বড় শক্র হয়ে গেলে। আমি যখন এই প্রতারণামূলক প্রত্যাখ্যান লক্ষ্য করলাম এবং বিষয়টিকে কুফরী ফতোয়ায় পর্যবসিত হতে দেখলাম, তখন বুঝতে পারলাম, এ ভাইদের সম্মোধন করা আমার জন্য অসম্ভাব্য ডেকে আনবে। আমি তখন আরবের সম্মানিত ও জ্ঞানী লোকদের দিকে মনোযোগ দিলাম। আমি মনে করি, তাঁরা আমাকে গ্রহণ করবেন, আমার কাছে আসবেন আর আমাকে মাহাত্ম্য প্রদান করবেন। এদের আশিষপূর্ণ মুখাবয়ব দেখার ভাবনা আমার জন্য আনন্দদায়ক ছিল। শুভ

ফলাফলের আশায় এই নেক পদক্ষেপ নিতে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। তাই এক পর্যায়ে আমি প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় কিছু পুষ্টক-প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা করলাম। এসব ভাইদের উপকারার্থে তত্ত্বজ্ঞানের কিছু রহস্য লিপিবদ্ধ করতে আমি দৃচ্ছসংকল্প করলাম। তদনুযায়ী আমি ‘তোহফা’, ‘হামামাতুল বুশরা’, ‘মূরুল হক’, ‘কেরামাতুস সাদেকীন’, ‘ইতমামুল হুজ্জাহ’ এবং এ পুষ্টিকা ‘সিররুল খিলাফাহ’ রচনা করি। এদের মধ্যে যারা কাফেরদের পর্যায়ভূক্ত তাদের জন্যও এতে প্রভৃত কল্যাণ রয়েছে। যারা আমার কাছে অপরাধ স্থীকার করে আসবে আমি আশা করি আমার প্রভৃত তাদেরকে ক্ষমা করবেন। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছা না, ধর্মের পোষাকের শুধু জরাজীর্ণ নেকড়া এবং এর প্রাসাদের শুধু ধৰ্মসন্তপ অবশিষ্ট আছে আর আমরা চর্বণকারীদের মুখে সুস্থাদু মাংসপিণ্ডের মত কেবল নিষ্পেশিত হচ্ছে? আল্লাহ তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শ করবে আর তোমাদেরকে তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত না করায় তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছে? এ যুগে দাঙ্গালের আগমনের প্রয়োজন আছে ঠিকই কিন্তু সর্বশক্তিমান খোদার পক্ষ থেকে সাহায্য আসার বুঝি প্রয়োজন নেই? তোমাদের হয়েছে কী, তোমরা এ কেমন অপলাপ করছো? তোমাদের বুঝির গভীরতা ও কিতাবের জ্ঞান কোথায় গেল? তোমাদের অঙ্গুষ্ঠি কোথায় হারিয়ে গেল? তোমাদের চোখে কী হয়েছে যার কারণে, তোমরা সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মাঝে তারতম্য করতে পারছো না? আমি তোমাদের মাঝে ইতোপূর্বে এক সুনীর্ঘ জীবন কাটিয়েছি, তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাবে না? এক ব্যক্তি তাঁর সব শক্তি-সামর্থ্য এবং আল্লাহ তাকে যা কিছু দিয়েছেন তাঁর সর্বস্ব তাঁর প্রিয় ধর্মের খাতিরে উজাড় করে চলেছে, যে কারণে তাকে সেই ধর্মের কান্তারী ও খুঁটি সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইসলামের জন্য আমার সহানুভূতি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মহানবী (সাঃ)-এর উম্মতের স্বপক্ষে আমার সংগ্রাম তোমরা দেখেও দেখ না। আমি সব ধরণের নির্দর্শন তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি তবুও তোমরা তা লক্ষ্য কর না!

নিচ্যয়ই আমি তোমাদেরকে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র এবং মারাত্মক ভীতি পদ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে এসেছি, তবুও তোমরা চিন্তা করে দেখ না। তোমরা আমার বিরুদ্ধে নবুওয়তের দাবী করার অপবাদ আরোপ করেছো। এ মিথ্যা বলতে গিয়ে তোমরা খোদাকে ভয় কর নি আর তোমরা তাঁকে ভয় করার পাত্রণ নও। তোমরা আমার কথা বোঝ না আর আমার পরিবেশিত সুস্থাদু পানীয়কে লোনা পানি জ্ঞান কর এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটোও না। যে ব্যক্তি অহঙ্কারে নিমজ্জিত, ঈর্ষার কারণে যে ন্যায়কে জলাঞ্জলি দেয়, অজ্ঞতা নিয়ে যে সন্তুষ্ট আর আজেবাজে কথার প্রতি যে আকর্ষণ রাখে এবং অঙ্গের মত সোজা পথকে যে উপেক্ষা করে তাঁর জন্য ঐশ্বী রহস্যবলী বোঝা কীভাবে সম্ভব?

আমার কথাকে উপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং আমার ভ্রাতি প্রকাশের লক্ষ্যে তোমরা বলে থাকো, নিজ নিজ নির্ধারিত স্থান পরিত্যাগ করে ও আকাশকে ফাঁকা রেখে ফিরিশ্ততারা সশরীরে পৃথিবীতে অবতরণ করে। মানব জাতির প্রতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ধরাপৃষ্ঠে সময় অতিবাহিত হবার কারণে তারা স্থানে ফিরে আসে

না বা তার কাছেও ভিড়ে না। আর প্রায়শই কিছু সময় তাদের এভাবে অতিবাহিত হতেই থাকে। শেখ বাটালভীর ধারণানুসারে তারা সফরের সময় বৃথা নষ্ট করে। তিনি এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কথা বলেছেন। কিন্তু তাতে স্পষ্টভাবে এ বিপদ্ধি থেকেই যাবে, অর্থাৎ কাজ সম্পাদনের জন্য যাকে স্থান পরিবর্তন করতে হয় তার নিষ্ঠয় কাঞ্চিত কাজ করতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সফরে কিছু সময়ও ব্যয় হবে। সুতরাং প্রথম আবশ্যিকতা দ্বিতীয় বিষয়কে আবশ্যিক করে তুলেছে আর এটি ঈমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ। আবার এক কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে দ্বিতীয় কাজের জন্য হয়তো সময়ই অবশিষ্ট থাকবে না যার ফলে তা জীবন্ত গোরন্ত শিশুর মত সূচনাতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। সুতরাং নিষিদ্ধ ও কাল্পনিক বিশ্বাস পোষণ করলে কি ফলাফল প্রকাশ পেতে পারে তা একটু চিন্তা করে দেখ। অতএব তোমরা কেন ঈমানের একটি স্তম্ভকে অবজ্ঞা করে মনগড়া ব্যখ্যার আশ্রয় নিচ্ছে! অথচ তোমরা ভালই জানো, ফিরিশ্তার অস্তিত্ব মৌলিক ঈমানের অঙ্গর্গত। এদের অবতরণ সবদিক দিয়ে আল্লাহর অবতরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফিরিশ্তাদের অবতরণের সময় আকাশ ফাঁকা রয়ে যায় এবং এ ভ্রমণ আরম্ভের পর উর্দ্ধোলোকে আর কিছুই থাকে না, ফিরিশ্তাদের সারিগুলোই যেন নষ্ট হয়ে যায়, আর আকাশের দুয়ারসমূহে যেন তালা লেগে যায় এবং এদের সব কাজকর্ম যেন থমকে দাঁড়ায়, এর সব কর্মকাণ্ড যেন গাল্টে যায় এবং আকাশসমূহে যা-ই আছে সে তা বের করে দিয়ে শূন্য হয়ে যায় -এসব কথা কি কোন ঈমানী চেতনাসম্পন্ন বিবেক প্রহণ করতে পারে? এটি সত্য হয়ে থাকলে কিতাব থেকে দ্যর্থহীন কোন আয়াত উপস্থাপন কর, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো। তোমরা মরে গেলেও এর কোন প্রমাণ দেখাতে পারবে না। অতএব হে সীমালজনকারী দল! অনুশোচনা কর এবং খোদাকে ভয় কর। জেনে রাখো, একটি বিষয়ের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু ও এর বাহ্যিক বর্ণনা পরম্পর সমান্তরাল। এই উভয় দিককে যে সমান দৃষ্টিতে দেখে না সে সর্বনাশা এক গর্তে পতিত হয়ে তত্ত্বজ্ঞানও খোয়াবে আবার ঈমান বলতে যা বুঝায় সেটাও হারিয়ে ক্ষতিপ্রস্তুদের অঙ্গৰ্ভে হবে। আমাদের ধর্মের বিশেষত্ব হলো, এটি কোন বিষয় উপস্থাপনকালে বাহ্যিক বর্ণনা ও অন্তর্নিহিত মর্ম এই দুইয়ের মাঝে সমন্বয় ঘটায় আর শান্তিক বিবরণ ও বিষয়বস্তুর মূলভাবকে একীভূত করে। এ ধর্মের শিক্ষা আমাদেরকে ঘূর্মন্তদের মত উদাসীন হতে দেয় না। আমরা খোদার দরবারে আকৃতি করবো, তিনি যেন আমাদেরকে প্রকৃত ঈমানের ভাগী করেন, তত্ত্বজ্ঞানের রাজত্বে আশ্রয় দেন, হৃদয়ের জ্যোতিতে আমাদেরকে যেন জালাতের দৃশ্যাবলী দেখার সৌভাগ্য দান করেন এবং আমাদেরকে যেন তাঁর আনুগত্যের আওতায় রাখেন, রহমান প্রভুর সন্তুষ্টিই যেন আমাদের আতিথেয়তার মূল উপাদান হয় আর আল্লাহর সান্নিধ্যে অবস্থান লাভ করে আমরা যেন অন্য সব স্থানকে ভুলে যাই। আল্লাহর সন্তুষ্টির অম্বেয়নে সফল হিসেবে আমরা যেন পরিগণিত হই আর যা সবচেয়ে সঠিক ও সর্বোত্তম তাঁর দিকে যেন আমরা

স্বতন্ত্রতার সাথে অগ্রসর হই আর তত্ত্বজ্ঞানের পথ যেন ক্রমশ পাড়ি দিতে পারি।
রহমান খোদার ভালবাসা অর্জনের পথে আমরা যেন পরম্পরের সাথে প্রতিযোগিতা
করতে পারি এবং উমী নবী খাতামান নবীন (সাঃ)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে আমরা
শয়তানের আক্রমণ থেকে সুরক্ষার লক্ষ্যে যেন একটি সুরক্ষিত দুর্গে ও সুদৃশ্য ছানে
আশ্রয় নিতে পারি। হে আল্লাহ! তাঁর প্রতি অনন্তকাল অবধি আশিস ও কল্যাণ বর্ষণ
কর। ওয়া আখের দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রবিল আল্লামীন।

লেখক রচিত কাসিদা

আমার প্রাণ সেই পূর্ণ চন্দ্রের জন্য নিবেদিত যিনি হাশেমের বৎশোভূত আরব
দুলাল।

তাঁর ভালবাসা খোদার সর্বোচ্চ নৈকট্য দান করে।

তিনি সৃষ্টিকে সব মিথ্যা, পাপ, অবাধ্যতা, শিরুক ও ধৰ্মসের হাত থেকে মুক্ত
করেছেন।

যে জাতি দুর্বলতার কারণে বিলুপ্তপ্রায় ছিল তাঁর আগমনে তা ঝলমল করে উঠেছে এবং
শয়তানের বংশধর উক্কারাজির আঘাতে নির্মূল হয়েছে।

বিভিন্ন উম্মতের ওপর যে ধূমজাল ছেয়ে ছিল তা তাঁরা অপসারণ করেছেন।
শুক্র নিজীব কাষ্ঠখন্ডে তাঁরা প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

এমন ঝড়ার যুগে আল্লাহর স্মরণের বৃক্ষকে তাঁরা সতেজতায় ভরে দিয়েছেন,
যে যুগ ঝীড়া-কৌতুকের ছলে মানুষের হৃদয়কে মৃতপ্রায় করে তুলছিল।

তখন কলুষিত হৃদয়-জমিনে সত্যিকারের জ্যোতি ঝলমল করে ওঠে।

আর দুর্মৃতিপরায়ণদেরকে মৃগের দিয়ে পিটিয়ে চৰ্ণ-বিচৰ্ণ করা হয়েছে।

আরব-অন্যান্য কুলের সর্বশেষ মানবের হৃদয়-জ্যোতির কারণে,
অন্যায় ও বিদা'তের কোন ছাপ আর অবশিষ্ট থাকে নি।

জগত্বাসী স্বচ্ছ হৃদয় নিয়ে স্থায়ীভাবে নিজ মহান প্রভুর সভায় বিলীন হয়ে যায়।

তাঁর এমন সব সম্মানিত সাধী ছিলেন যাদের বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল।

তাঁদের গুণবলী সূচনাতেও অসাধারণ ছিল আর সমাপ্তিতেও।

তাঁদের হৃদয় ছিল নিভীক সিংহের ন্যায়।

তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনবিদিত ছিল, ধামা চাপা দেয়া কিছু নয়।

তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ সম্পর্কে তাঁর অনেক বিখ্যাসযোগ্য হাদীস রয়েছে, যার
নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে অন্য কিছু অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই।

তাঁরা ঈমানের বলে সুর্যের ন্যায় আলোকিত ছিলেন।

আমরা যদি তাঁদেরকে নিয়ে গর্ব করি, তাহলে সেই গর্ব মোটেও অযথা নয়।

ধৰ্মস সে জাতির জন্য যারা তাঁদের সুমহান মর্যাদাকে অস্মীকার করে।

তারা কোন প্রস্তু বা কিতাবের ভিত্তিতে কথা বলে না ।

তাদের জন্য অজ্ঞতার গহ্বর থেকে বের হওয়া সম্ভব নয় ।

দুর্ভেদ্য পর্দা ছেদ করে কখনও তারা বের হতে পারবে না ।

আজ একটি জাতির প্রিয়জনদেরকে তুমি তিরস্কার করছো, কিন্তু যেদিন সত্যিকারের
বিচ্ছিন্নতার সময় আসবে তুমি ব্যাকুল হয়ে কাঁদবে ।

যে পাপকে প্রাধান্য দেয় আর প্রভুকে ভয় করে না, সে মানুষ নয় বরং লেজকাটা এক
ঝাড়সম ।

আমাদের জ্ঞান আর এর সুস্ক্ষতাকে দেখ! তোমার দৃষ্টিতে যদি আমি শিষ্টাচার বহির্ভূত
কিছু বলে থাকি তাহলে দয়া করে ক্ষমা করে দিও ।

আমার প্রভু একটি জাতির সংস্কারের জন্য আমাকে সাহায্য করেছেন,
তিনি সাহায্য না করলে কে ধৰ্ম থেকে রেহাই পেতে পারে?

আমি এই লেখা উপস্থিতভাবে সাজিয়ে লিখেছি,

আর আমার কলম থেকে একাধারে সেভাবে শব্দ উৎসরিত হচ্ছে যেভাবে মেঘমালা
থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হয় ।

আমাদের জন্য মহা সম্মানিত এবং কৃপাশীল স্বষ্টা একাই যথেষ্ট,
সুতরাং সৃষ্টির কাছে আমাদের চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই ।

এ নথম সব প্রাঞ্জলি ভাব ও বাছাইকৃত কথা নিজের মাঝে সমবেত করেছে,
আমাদের নেতা ও তাঁর নক্ষত্রতুল্য সম্বান্ধ সাহার্বীদের কল্যাণে তা হয়েছে ।

আমি এমন একটি দেশে আছি যাতে অশাস্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে,
আর অশাস্তি এখানে সেভাবে বিরাজ করছে যেভাবে মাটিতে সুরঙ্গের জাল বিছানো
থাকে ।

যে আমার প্রতি অত্যাচার করে সে এর পরিণামকে ভয় করে না বরং এটাকে স্বষ্টার
নেকট্য লাভের সবচেয়ে উত্তম উপায় মনে করে ।

দৃঢ়খ-কষ্ট আর বেদনার কারণে আমার দু'নয়ন থেকে অশ্রু ধারা বহমান ।

নিছক অন্যায়ভাবে আমাকে পায়ে হেঁটে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে! অথচ আমার
প্রেমাঙ্গদের দেশ অনেক দূরে!

হায়! আমার যদি বাহন থাকতো এবং আমি পালানে আরোহিত হতাম ।